আমার কাল আমার চিন্তা

শাহ আবদুল হান্নান

আমার কাল আমার চিন্তা

শাহ আবদুল হান্নান

অনুলিখন ও সম্পাদনা
ওমর বিশ্বাস

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৮

আমার কাল আমার চিন্তা : শাহ আবদুল হান্নান, প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। স্বত্ব: লেখক, প্রচ্ছদ: ফরিদী নুমান, মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য: একশত বিশ টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০১৭১৭০৩৫৬২২
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৩৫৬২৪৪৩৪
৪২৩ এ্যালিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৫৫২৩৮৮৪২৩

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শাহ আবদুল হান্নান আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট ও বরেণ্য ব্যক্তি। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পদত্যাগের মাধ্যমে তাঁর সরকারি চাকরির সমাপ্তি ঘটে। নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমকালীন বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর দ্বিধাহীন, সংকীর্ণতামুক্ত ও সুচিন্তিত মতামত, মূল্যায়ন ও সক্রিয় ভূমিকা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে অপপ্রচার ও আক্রমণ চলছে, তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সময়োচিত জবাব প্রদানে যেসব ব্যক্তিত্ব অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন, জনাব শাহ আবদুল হান্নান তাদের অন্যতম।

ব্যক্তিগত জীবনে সময়ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় একজন ব্যক্তি জনাব শাহ আবদুল হান্নান। শতব্যস্ততার মাঝেও দেশ ও জাতীর কল্যাণে যেকোনো উদ্যোগে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় শাহ আবদুল হান্নান সাহেবকে অনেকটা জানি। তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে যে কারো ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহী। আমি তাঁর কাছ থেকে যে ধরণের পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও অভিভাবকত্ব পেয়েছি তা আমার জীবনের বড় অর্জন হিসেবেই আমি বিবেচনা করি।

আমরা জনাব শাহ আবদুল হান্নানের মতো একজন নির্ভীক আদর্শ মানুষের 'আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ' প্রকাশ করতে পেরে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। ইতঃপূর্বে আমাদের প্রকাশনা থেকে 'দেশ সমাজ রাজনীতি' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন বের হয়েছিল, যা পাঠক ও সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছিল। 'আমার কাল আমার চিন্তা' শীর্ষক এ বইখানি পাঠকমহলে শিক্ষণীয় ও সমধিক সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বন্ধুবর কবি ওমর বিশ্বাস যে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতৎপর না হলে হয়তো এ বই প্রকাশ অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হতো।

সর্বোপরি, আমরা আল্লাহর দীনের এই খাদেম-এর সুস্বাস্থ্যসহ কর্মমুখর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। একই সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে মোনাজাত করি, তাঁর জীবনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা যেন নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার আত্মজীবনীমূলক বই হিসেবে যেটা প্রকাশ হতে চলেছে শুরুতে তা লেখার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। এ ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি মনে করলাম যে, আমার জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা জানানো দরকার এবং যেটা জাতির কাজে লাগতে পারে, এমনকি ইসলামী মুভমেন্টের বিশেষভাবে কাজে লাগতে পারে। এমন কিছু অসাধারণ বিষয় আছে, যা আমার জীবনে আমাকে করতে হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'ভ্যাট' তথা মূল্য সংযোজন কর। বলতে গেলে নিজের উপর সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজ করতে হয়েছে। অবশ্যই আমার সাথে আমার কিছু সহকর্মী ছিলেন। অবশ্যই আমার উপরে আমার মন্ত্রী, সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দায়িত্বটা আমার উপরই ছিল। সেটা একটা অসাধারণ কঠিন দায়িত্ব ছিল। এটা ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় এর আগে হয়নি। সেরকম একটা কাজ আমি করি। সে অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল সরকারের সংসদীয় দলের সাথে মুখোমুখি হওয়া, কেবিনেট মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে সেখানে বলা, বোঝানো এবং যুগপৎ সারা দেশে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের বোঝানো–এ কঠিন কাজ আমাকে করতে হয়েছে। এ কাজে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। এটা একটা বিষয় যেটা প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে আমি সারা দেশে যে ব্যাংকিং সংস্কার করি তা আগে হয়নি। সে জন্য একটি প্রজেক্ট শুরু হয় ১৯৯২ সালে এবং শেষ হয় '৯৫ সালে, চার বছর সেখানে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। তখনই ব্যাংকিং সিস্টেমের মূল পরিবর্তনগুলো আনা হয় যেটা এখনো চলছে। সেসব কাজ বলতে গেলে আমাকে সিরিয়াসভাবে করতে হয়েছে, দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আমাকে আমার গভর্নরকে বোঝাতে হয়েছে, ইন্টার ব্যাংকিং কমিটিগুলোকে বোঝাতে হয়েছে। অনেক বাধা-প্রতিরোধ ছিল। তারা বুঝতে চাচ্ছিল না। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতর অনেকে বিষয়টি বুঝতে চাচ্ছিল না। তাদের বোঝানো, তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে এটাকে কার্যকর করা কঠিন কাজ ছিল। আল্লাহর মেহেরবানী, আমি সেটাও করেছিলাম।

ছাত্রজীবন থেকে আমি বিভিন্ন সময় যেসব দেশ সফর করি তাতে আমার সামনে মূলত একটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন দেশের ইসলামী মুভমেন্টকে স্টাডি করি। তাদের ভালোমন্দ দেখি। অনেক কিছু শিখি। অনেক কিছু তাদেরকে বলি। সেসব বিষয় ইসলামী মুভমেন্টের লোকদের জানা উচিত বলে আমি মনে করি। যে বিষয়গুলো আমি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে পেয়েছি, তারা যেন সে

www.pathagar.com

বিষয়গুলো পায়। আবার উইটনেস-পাইওনিয়ার নামে আমার যে সংগঠনের ডেভেলপমেন্ট তার ব্যাকগ্রাউন্ড নানা কারণে জানা দরকার ছিল মানুষের যে, কী প্রেক্ষিতে আমি উইটনেস ও পাইওনিয়ার করলাম। এ সংগঠন দুটো করেছিলাম মূলত একটি শূন্যতা, ইন্টেলেকচুয়াল শূন্যতা পূরণের জন্যে। কারো ত্রুটি বের করার জন্য নয়, কারো নিন্দা করার জন্যে নয়। একটা শূন্যতা আছে সে শূন্যতা পূরণের জন্যে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এর ফল ভালোই হয়েছে বলে আমার কাছে দেখা যাচ্ছে। আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমার অনেক স্টুডেন্ট ইসলামী মুভমেন্টের উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করছে। এমনকি অনেক স্টুডেন্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সার্বিক বিবেচনায় আমি মনে করলাম যে, আমি যা দেখেছি তা বলি। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই লেখাটুকু। আমি আশা করি যে, এটা যারা পড়বেন তারা সবাই কিছু আনন্দ পাবেন। আর ইসলামী মুভমেন্টের লোকেরা এখান থেকে কিছুটা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা পাবেন।

এই বই লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছে আমার স্নেহভাজন ওমর বিশ্বাস, সে কথা বলতেই হয়। ওমর বিশ্বাস কবি, কর্মঠ ব্যক্তি, পরিশ্রমী। যথেষ্ট পরিশ্রম দিয়ে সে এ কাজটি করেছে। সে সব গুছিয়েছে, সব কিছু করেছে বলতে পারা যায়। এ বইয়ের অন্য আরেকটি অংশ রয়েছে সেটা একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যেটা পূর্বে 'প্রয়াস' নামে একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাকে ঈষৎ সংশোধন করে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে আমি বলছিলাম তারা নোট করে নিচ্ছিল, সে কঠিন কাজটিতেও কবি ওমর বিশ্বাসের ভূমিকাই ছিল প্রধান। তার সাথে পরিশ্রম করেছিল আহমদ হোসেন মানিক। তার ভূমিকাও স্বীকার করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

এই বইয়ের যিনি প্রকাশক, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন তাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাতে হয়। সে আমার আরো বই করেছে। আমার ব্যাপারে তার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যা-ই বলি না কেন আছে। আমি আশা করি, সার্বিক বিবেচনায় বইটি কল্যাণকর হবে, উপযোগী হবে। এর মাধ্যমে যদি কিছু উপকার হয়, সেটা আমি আল্লাহ তাআলার কাছে চাই, যেন এর মাধ্যমে আমার নাজাতের একটা রাস্তা হয়।

শাহ আবদুল হান্নান
আগস্ট ২০০৮

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ছাত্র জীবন ১১

স্কুল পরবর্তী সময়/১৭, ঢাকা মেডিকেলের পরিবর্তে জগন্নাথ কলেজ/২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/২৬

চাকরি জীবন ৩৭

ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমী/৩৮, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/৪১, দুর্নীতি দমন কমিশনের সময়কাল/৪৩, ডেপুটি গভর্নর : বাংলাদেশ ব্যাংক/৪৮, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)/৫২, সরকারের সচিব থেকে পদত্যাগ/৫৯

বিদেশ সফর ৬৭

প্রথম বিদেশ সফর/৬৭, তুরস্ক ও ইরান সফর/৬৯, জাপান সফর/৭৩, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার/৭৫, দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে/৭৯, আবার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন/৮৪, কাজাকিস্তান সফর/৮৯, বৃটেন সফর/৯৫, হজ্জ পালন/১০৫

উইটনেস-পাইওনিয়ার ১১৫

বিশিষ্ট ব্যক্তি ১২১

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ/১২১, আমার শিক্ষক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন/১২২, মাওলানা আবদুর রহীম : বাংলাদেশের এক বিশাল ইসলামী ব্যক্তিত্ব/১২৪, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : আমি যেভাবে পেয়েছি/১২৮, গাজী শামসুর রহমান/১৩০, একজন চিন্তাবিদ শাহেদ আলী/১৩৪, কথাশিল্পী ও মানবতাবাদী শাহেদ আলী/১৩৭, মুক্ত মনের সাধক আবদুল মান্নান তালিব/১৩৯, মোহাম্মদ ইউনুছ ছিলেন ইসলামের এক সম্পদ/১৪২, অধ্যাপক ইউসুফ আলী : একজন আল্লাহতে সমর্পিত ব্যক্তি/১৪৫, একজন তৌহিদবাদী মানুষ আ. ফ. ম. ইয়াহিয়া/১৪৭, আমার দেখা শহীদ আবুল কাশেম/১৫১

পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার ১৫৩

বাংলাদেশ/১৫৩, বিশ্ব পরিস্থিতি/১৭৪, গণতন্ত্র ও ইসলাম/১৮৮, শিক্ষা/২০৩, মিডিয়া/২১০, ইসলামী আন্দোলন/২১২, মুসলিম বিশ্ব/২১৫, সংস্কৃতি/২২১, অর্থনীতি/২২৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছাত্র জীবন

কখন থেকে আমি ক খ গ পড়া শুরু করলাম এবং তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল তা আমার মনে নেই। তবে স্মৃতিকে ঘাটলে যতটুকু মনে পড়ে তা হলো একবারে ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেখানে আমি ভর্তি হই। কিছুদিন ক্লাস করি। এর বেশি স্মৃতি আর মনে নেই। সেখানে কি পড়লাম, আর কি পড়িনি তা মনে নেই। এই বিস্মৃতি সত্যিকার অর্থেই।

কর্মসূত্রে আমার আব্বার চাকরিস্থল ছিল তখন নেত্রকোনা জেলায়। সেখানে আমি ক্লাস টু'তে পড়া শুরু করি। সেই স্কুলের নাম ছিল দত্ত হাই স্কুল। এটা নেত্রকোনা শহরে যে দুটি বড় স্কুল ছিল তার মধ্যে একটি। সেই স্কুলে তখন আমার এক মামাও পড়তেন ক্লাস নাইনে, যিনি পরবর্তীতে এমপিও হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছেন। একই ক্লাসে মামার সাথে আমার দুই ফুফাতো ভাইও পড়তেন। এই দুই ভাইয়ের একজন এখনো জীবিত আছেন।

আমাদের স্কুল ঘর ছিল টিনের। আমি বাসা থেকে হেটে যেতাম। আমাদেরকে যেতে হতো থানার সামনে দিয়ে। প্রায় আধা মাইলের দূরত্ব। একাই হেঁটে যেতাম, হেঁটে আসতাম। সে সময় সাধারণত বাচ্চাদের কেউ নিয়ে যেত না। সেই সময়কার খুব বেশি স্মৃতি আমার জানা নেই। আবার তেমন কিছু মনেও নেই। তবে একটা স্মৃতির কথা আমি মনে করতে পারি যদিও তা আমার স্কুলের সাথে জড়িত নয়। ছোটবেলায় আমি কেমন ছাত্র ছিলাম, লেখাপড়া ভালো করে করতাম কি না সেসব বিস্মৃত প্রায়। কিছুই মনে নেই। তবে এতটুকু মনে আছে যে আমি থানার সামনে দিয়ে স্কুলে যেতাম। থানাটা একটা বড় বিল্ডিংয়ে ছিল। খুব সম্ভব এটা শুধু থানাই ছিল না অন্য সরকারি অফিসও এর সাথে ছিল। তবে থানার স্মৃতিটাই আমার কাছে রয়ে গেছে। অন্য অফিসগুলোর কথাও স্মরণে নেই।

এটা ১৯৪৭ এর আগের কথা। ভারতবর্ষ তখনো বৃটিশ কলোনি। পুলিশ হাফপ্যান্ট পরতো। মাথায় লম্বা পাগরির মতো পরতো। তাতে লম্বা লাল রঙের চিকন মতো একটা ফিতা ঝুলে থাকতো। কেন জানি আমার সেই থানার উপর দিয়ে যাবার সময় ভয় লাগতো। থানার পুলিশ দেখে ভয় লাগতো। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে

www.pathagar.com

আমার জীবনে ভয়টা কেমন করে যেন আমাকে পেয়ে বসে। আমার সব সময় ভয় লাগত এর একটি কারণ হতে পারে অল্প বয়সে আমরা নানা রকম গল্প শুনি। এসব গল্প ছোটবেলায় মনে গেঁথে যায়। একে স্মৃতিকর গল্প বলে। যা বাচ্চাদের মানসিকতাকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। হয়তো তার মধ্যে ভয়ের গল্পও ছিল। কিন্তু এটাই স্মৃতিতে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

এই জিনিসটাই আমি যখন পরবর্তীতে অনেক বইপত্র, সাহিত্য পড়ি তাতে পাই। 'গানস অব নাভারন' বলে আমি একটা বই পড়ি। সেখানে একটি চরিত্র ছিল এড্রি স্টিভেনসের চরিত্র। এই এড্রি স্টিভেনসের চরিত্রেও আমি দেখেছি তার ভিতর সব সময় একটা ভীতি কাজ করত। অনেক বড় বড় কাজ সে নিজে করতো এবং অন্যকে দিয়ে করালেও ভয়কে কিন্তু মন থেকে তাড়াতে পারত না। তার মনে সব সময় এই ভীতি ছিল যে সেই কাজ সে করতে পারবে না। ঠিক এরকমই একটা উপলব্ধি আমারও অনুভূত হতো। জীবনভর এই জিনিসটাই আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তা মোটামুটি বলা যায়।

যাই হোক, আমাকে সেই থানার সামনে দিয়েই স্কুলে যেতে হতো। স্কুল থেকে আসতে হতো এবং পুলিশ দেখলেই সব সময় আমাকে একটা ভীতি তাড়া করে বেড়াত। আর এখনো আমার সেই পুলিশ ভীতি যায়নি। আমি বড় হয়েছি, বয়স হয়েছে, সরকারের সেক্রেটারি হয়েছি। জীবনে অনেক কাজই করেছি। কিন্তু আমার মন থেকে পুলিশ ভীতি যায়নি। অনেকের অনেক রকম ভীতি থাকে। কারো মনে ডাক্তার ভীতি কাজ করে, কারো মনে শিক্ষক ভীতি বা অন্য কোনো ভীতি কাজ করে। আমার সেরকম কোনো ভীতি নেই। কিন্তু এই পুলিশ ভীতি আমার হচ্ছে কেন? এর একটা কারণ আমাদের দেশে পুলিশের যে ইমেজ রয়েছে এবং যেটা আমার সাইকে (phyche) প্রবেশ করেছে সেটা হলো পুলিশ সাধারণত জুলুম করে বা পুলিশ সুবিচার করে না।

আমার ছোটবেলার আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি কিছুদিন স্কুলে যেতাম না। ক্লাস করতাম না। পালিয়ে বেড়াতাম। বেশ কিছু দিন এমন হলেও বাড়িতে কেউ জানতে পারেনি যে আমি ক্লাস করতাম না। তবে এভাবে বেশি দিন আর চালাতে পারিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাই। কেমনে যেন আব্বা আমাকে ধরে ফেলেন। তিনি জানতে পারেন আমি ক্লাস করছি না। তিনি আমাকে খুব পিটান এবং ক্লাসে দিয়ে আসেন। এরপর থেকে আমার জীবনে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

এটা হলো আমার ছাত্র অবস্থার একেবারে প্রাথমিক সময়ে কথা। এরপর আমার আব্বা বদলি হয়ে নারায়ণগঞ্জ যান। আমিও সেই হিসেবে নারায়ণগঞ্জ আসি।

www.pathagar.com

নারায়ণগঞ্জের পাশে একটা ছোট্ট শহর মীর কাদিম বলে নাম - সেখানে একটা স্কুলে ভর্তি হই। সেটা ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা, মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অংশ। সেই স্কুলে আমি চতুর্থ শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। আমরা সেখানে এক হিন্দু জমিদারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। সেই বাড়ির লোকজন তখন ইন্ডিয়া চলে যায়। তাদের পক্ষ থেকে কেউ এই বাড়ি আমার আব্বার কাছে ভাড়া দেন। সেটা একটা বিরাট দালান বাড়ি ছিল। এতবড় দালান সেই ছোট্ট শহরে মীর কাদিম রিকাবি বাজারে ছিল না। আমাদের বাড়ির আশে পাশে অনেক বানর ছিল। বড় বড় হনুমানও ছিল। আমি তখন হনুমানের ভয়েই ঘর থেকে বের হতাম না। বানরের ভয়েও না। আমাকে যে ভীতি পেয়ে বসত এটা তার আরেকটা উদাহরণ।

সেই স্কুলেরও তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কিছু আমার স্মৃতিতে নেই। বলা যায় লেখাপড়া মোটামুটি করেছি। তার কিছুদিন পর আমি চলে আসি নারায়ণগঞ্জ শহরে। নারায়ণগঞ্জের দুইটি বড় স্কুলের মধ্যে একটিতে আমি পড়াশুনা করি। হয়তো আরো অনেক ভালো স্কুল ছিল আমার জানা নেই। ছেলেদের একটা স্কুল হলো নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল আর একটা হলো বার একাডেমী। আমি বার একাডেমীতে ভর্তি হয়ে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশুনা করি। ওই সময়টাতে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাসাতে ছিলাম। এই স্কুলের সময়টাও যে আমার খুব ইভেন্টফুল ছিল তা আমি বলব না। সাধারণভাবেই আমি পড়াশুনা করে গেছি।

তবে, সেখানকার দুই তিনটা ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যা এখনো আমার মনে পড়ে। আমি যদিও খুব ছোট ছাত্র ছিলাম কিন্তু সেই সময় আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাথে আমার একটা ঘটনা ঘটে। তা আমার পুরোপুরি মনে না পড়লেও ঘটনাটা দাগ কাটার মতোই ছিল। একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাথে সেভেন-এইটের একজন ছাত্রের কোনোরকম বিতর্কের কথা ভাবাই যায় না। তাও আবার সেই আমাদের আমলে। সেই সময় পাকিস্তান হয়ে গেছে। মুসলিম সেন্টিমেন্ট আছে। যার সাথে ঘটনা তিনি ছিলেন অমুসলিম, হিন্দু এবং সহকারী হেডমাস্টার। ভালো শিক্ষক ছিলেন, ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি একদিন বললেন, কেবল হিন্দুদেরই বহু ঈশ্বরবাদ - এই ধারণাটা ঠিক নয়। আমরা যেমন বলি তাদের বহু ঈশ্বরের ধারণা আছে আর ইসলামে এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সেই শিক্ষক বললেন, মুসলমানদের মধ্যেও বহু ঈশ্বরের ধারণা আছে। ইসলামেও বহু ঈশ্বর আছে। রাহমান, রহীম, খালেক - তিনি এভাবে মুসলমানদের বহু ঈশ্বরের কথা বললেন। তিনি বললেন, হিন্দুদের ধর্মে যেমন বহু ঈশ্বরের ধারণা দেখা যায় তেমনি ইসলামের মধ্যে সেটা রয়েছে। এরকমই একটি কথা তিনি বলেছিলেন।

www.pathagar.com

তখনো আমি ইসলামের কিছুই জানি না। ইসলামের প্রতি একটা আবেগ ছাড়া আর কিছুই আমার ভিতরে নেই, সেটা ইসলামের টানেই ছিল। কিন্তু আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্যারকে বললাম, স্যার আপনি ঠিক বলেননি। আপনি যেসব নাম বললেন - রাহমান, রহীম, খালেক এগুলো সব গুণবাচক নাম। এগুলো আল্লাহর বিভিন্ন গুণ। আল্লাহ একজনই। তখন সেই শিক্ষক আমার কথার উত্তরে বললেন, তুমি ঠিক বলনি। ইউ আর রং, তিনি ভদ্রভাবেই আমাকে একথা বললেন। তাতে আমি চুপ করে গেলাম। তার উপর এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, তার সাথে আমি কি তর্ক করব। কিন্তু পরের দিন তিনি আবার ক্লাসে এসেই বললেন- না, না, হান্নান ঠিকই বলেছে। আমিই ভুল। আমি ঠিক করে দেখেছি যে সেই সঠিক কথা বলেছে। এই কথাটা আমার মনে দাগ কাটে। আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে, আমি তো খুব অল্প বয়সেই এরকম একটা বিষয় পয়েন্ট আউট (Point out) করতে পেরেছিলাম। তারচেয়েও বড় কথা হলো তিনি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পরদিন এসে আমার কথাকেই স্বীকার করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। এটা ছিল উনারও একটা মানসিক উদারতা এবং মহত্ত্বের লক্ষণ।

আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। জীবনের ঘটনাবহুল স্মৃতিগুলোই সাধারণত মনে থাকে। প্রত্যেকের জীবনেই তো কত ঘটনাই ঘটে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোই স্মৃতিতে থেকে যায়। এতো বড় জীবনের মধ্যে সেগুলোই স্থান পায়। আমাদের একজন নতুন হেড মাস্টার আসলেন। তিনি মুসলিম ছিলেন। তিনি আমাদের একটা ক্লাস নিতেন। তারই কোনো এক ক্লাসে একবার পর্দার কথা আসে। তিনি সে সময় একটা কথা বলেছিলেন যা আমার মনে গভীর দাগ কাটে। আমি এখনো অবাক হই, আমরা না জেনে কিভাবে এপলোজেটিক হয়ে যাই। বিষয়টা ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। তিনি একবার বললেন, আমরা যে বলি ইউরোপের মেয়েরা পর্দা করে না তা সত্য নয়। তারা পর্দা করে। কিভাবে করে এর উত্তরে তিনি বললেন, তারা স্কার্ট পড়ে ঠিকই কিন্তু নিচে একটা লম্বা মোজা পড়ে। মাথায় একটা ছোট হেট পড়ে বা কভার দেয়। আর হাতে ঝালরের মতো গ্লাভস জাতীয় কিছু পড়ে। যদিও শরীর দেখা যায়। তার এ কথা শুনে আমরা তখন খুশিই হলাম এই ভেবে যে ইসলাম রক্ষিত হচ্ছে এবং তারাও এরকম। ইউরোপের মেয়েরাও কোনো না কোনোভাবে পর্দা করে। হিজাব করে বা কভার দেয় কিংবা এরকম কিছু একটা করে। কিন্তু যখন আমার বয়স হলো তখন বুঝলাম কতবড় একটা বিভ্রান্তিমূলক কথা ছিল সেটি। তিনি তার সেই কথার মধ্যে এটি জাস্টিফাই করতে চাচ্ছিলেন যে এরকম করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই এবং তিনি এর জন্য এরকম একটা খোঁড়া যুক্তি খাড়া করেছিলেন। এটা কোনোভাবেই সত্যিকার অর্থে

www.pathagar.com

শরীর ঢাকা বা কভার ছিল না। এই ঘটনা থেকে আরেকটি জিনিস প্রমাণ করে যে, আমরা সেই সময় কত ডিফেন্সিভে ছিলাম। ইসলামও সঠিক এবং তারা যা করছে তাও সঠিক - এরকম ধারণা অনেকের মধ্যে সেই সময় কমবেশি কাজ করতো। এই এটিচিউড বা এপোলজি তখন দেখেছি।

এরকম অকারণ ডিফেন্সের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা আসলো কোত্থেকে? আসলে তখন তাদের যে লেখাপড়া তাতে এই এপোলজিটিকেল মাইন্ড (Apologitical mind) তৈরি হয়। ঐ সময় ইসলামী সাহিত্য হয়তো এতটা সহজলভ্য ছিল না। কিংবা বিজ্ঞানের উত্থানের সাথে সাথে একটা ভীতি সৃষ্টি হচ্ছিল, বিজ্ঞান না আবার ধর্মকে উৎখাত করে দেয় এবং তার জন্য কোনো না কোনো ভাবে ইসলামকে জাস্টিফাই করা প্রয়োজন। কাজেই এগুলো ছিল এপোলোজেটিক মাইন্ডের কথা।

যাই হোক, আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিল একজন হিন্দু ছেলে। সে ছিল চ্যাটার্জি। তার সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সে খুব শক্ত এবং বিশ্বাসী হিন্দু ছিল। একাত্তরের আগে বা অল্প পরে সে ইন্ডিয়া চলে যায়। এরপর আবার ফিরে আসে। এর মধ্যে তাদের বাড়ি-ঘর, জমিজমা তারা হারায়। একাত্তরের ঘটনায় তাদের উপর প্রভাব পড়ে। আমি যখন এনবিআর (National Board of Revenue) এর ফার্স্ট সেক্রেটারি তখন নানা কারণে সে আমার কাছে আসত। আমি আমার সাধ্যমতো তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতাম। তার এক ছোট ভাই নাবিক হয়। কিন্তু সমুদ্রে এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। তার বাবা-মার মধ্যে অমিল ছিল। সে আরেকটি ফিৎনা। সে তার মাকে ভালোবাসত আবার বাপকেও ফেলতে পারত না। এরকম অনেক সমস্যা নিয়ে সে আমার কাছে আসত। কথাবার্তা বলত এবং I used to help him whatever I could. আমার কাছে অবাক লাগত আমি সিভিল সার্ভিস পাস করে এখানকার অফিসার আর আমারই ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে কি না লেখাপড়া করতে পারেনি। আর্থিক দুর্দশা আর পরিস্থিতির কারণে He become a beggar - এটা আমার মনে খুব ব্যথা দিত।

নারায়ণগঞ্জের বার একাডেমীর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। হিন্দু মুসলিমের যে একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যাকে আমরা ডিভাইড (devide) বলি, তাতে যে মানসিক দূরত্ব সেটাও তখনকার সময়ে আমি লক্ষ্য করি। সেসব বিষয় আমি সবখানেই লক্ষ্য করেছি। আমার এটাও মনে পড়ে আমি যখন বিক্রমপুরের মীর কাদিমে ছিলাম সেখানকার পুরো এলাকাটা হিন্দু ছিল। আমি দেখেছি আমরা যদি কলে পানি আনতে যেতাম বা কল পাড়ে দাঁড়াতাম তখন সেখানে জগ বা কলসি থাকলে তারা তার পানি ফেলে দিত। ভরা কলসি হলেও আবার নতুন করে তারা

www.pathagar.com

ভরে নিত। অর্থাৎ আমাদেরকে মোটামুটি অপবিত্রই মনে করা হত। মুসলিমদের স্পর্শে সব বুঝি অপবিত্র হয়। আমি নারায়ণগঞ্জ থাকতেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তি তা লক্ষ্য করি, যদিও তা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি কোথাও। তবে মুসলমানরা যেন শূদ্রদের অংশ বলে আমার কাছে মনে হতো।

এর মধ্যে আব্বা আবার বদলি হয়ে গেলেন। তখন আমি আব্বার এক বন্ধুর বাসায় কিছুদিন একা থাকলাম। তিনি আব্বার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তার নাম ছিল আবুল হোসেন। সেখানে থেকেই আমি ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা দেই এবং পাস করে ক্লাস টেনে গিয়ে ভর্তি হই যশোর জিলা স্কুলে। সেই স্কুল থেকেই আমি আমার মেট্রিকুলেশন করি।

যশোর জিলা স্কুলের তিন চারজন ছাত্রের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তবে ফার্স্ট বয় ছিলাম না। সেখানে আমি বাহির থেকে এসে ভর্তি হয়েছি। তাও টেনের মতো ক্লাস, একজনই শুধু বাহির থেকে ভর্তি হলাম। প্রথম দিনই আমাদের ইংরেজির স্যার আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আমাকে একটা বইয়ের নাম বলে সেটা আমি পড়েছি কি না জানতে চাইলেন। আমি উত্তরে হ্যাঁ বলি। দি ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড (The Vicar of Wakefield) বইটির নাম। আমি ভাইকার জাতীয় কিছু একটা শব্দ বলেছিলাম। তাতে সারা ক্লাস হো হো করে হেসে ওঠে। আমার সেটাই ছিল প্রথম ক্লাস। আসলে সেই শব্দের উচ্চারণ ছিল ভিকার, ভাইকার নয়। তাদের হাসার হয়তো কারণ ছিল কিন্তু আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি কি ভুল করলাম তা তো আমি বুঝতেই পারিনি। যে কোনো জায়গায় নতুন লোকের বেলায় যা হয় আমার বেলায়ও তাই হলো। এরকম নতুনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ওয়েলকাম না করে একটু মজা করি, খোঁচা দেই। এটা যদিও অস্বাভাবিক কিছু নয়, স্বাভাবিকই। সেই প্রথম ক্লাসে আমার এ ঘটনা ঘটেছিল।

আমি ইতিহাস, ভূগোল খুব ভালো জানতাম বলে অল্প দিনেই সেখানে আমি সবার খুব প্রিয় হতে পেরেছিলাম। ক্লাসে আরবি না নিয়ে উর্দু নিলাম। আব্বা আমাকে উর্দু নিতে বললেন। বোধহয়, এটাই ভাবলেন, উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। সেই মনে করে হয়তো তিনি আমাকে উর্দু নিতে বললেন। এটা এক দিক দিয়ে আমার জন্যে ভালোই হলো যা পরবর্তীতে আমার জীবনে অনেক কাজে আসে। ইসলামের উপর আমার পড়াশুনাতেও বিশেষ কাজে লাগে। এতে সাব-কন্টিনেন্টের প্রধান দুটি ভাষা, বাংলা ও উর্দু আমার শেখা হয়ে যায়। আর হিন্দি তো শুধু স্ক্রিপ্ট বাদ দিলে উর্দুরই অন্য রূপ। সেটাও আমার জানা হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিজের উদ্যোগেই আরবি শিখে নেই।

www.pathagar.com

স্কুল জীবনের আরো দু'একটি ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তার মধ্যে একটি হলো তখন স্কুলে এসেম্বলি হতো। সেখানে এক টিচার ঘটনাক্রমে আমার আব্বার বন্ধু ছিলেন। একবার আমাকে তিনি টেনে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন। আমাকেই করতে হবে। আমি একদম নতুন ছাত্র। আমার সাহসও নেই যে পাঁচশ ছাত্রের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করব। তবু আমি তা করলাম। সম্ভবত সূরা ফীল পড়েছিলাম। আমরা স্বাভাবিকভাবেই মোটামুটি দশটা সূরা মুখস্ত করে থাকি। সেদিন পড়ার পর নিয়মিত আমাকেই কুরআন তেলাওয়াত এবং তার অর্থ পড়তে হতো। এতে লাভ হয়েছিল - সমাবেশ এবং মঞ্চ ফেস করার যে ট্রেনিং সেটা আমার হয়ে যায়।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। স্কুলে একবার বেশ বড়সড় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তখন সেখানে আমাকে একটি মূকাভিনয় করতে হয়েছিল 'রেডিও পাকিস্তান যশোর জিলা স্কুল'- এই নামে। সেখানে যে খেলাধুলা হবে তার রানিং কমেন্ট্রি আমাকে করতে হবে। আমি সেটা করেছিলাম এবং ভালোভাবেই করেছিলাম বলে মনে পড়ে। তারপর এক প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে অনেক কিছু দেখাতে হয়। আমার উপর তার একটা দায়িত্ব পড়েছিল। তাতে তিন চারজনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা Exibition ছিল। বিষয়টা এখন আর খেয়াল নেই। তবে তা প্রামাণ্য ধরণের ছিল। আমি মনে হয় সে দায়িত্বও সুন্দরভাবে পালন করি।

এসবের মধ্যেই সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেই। আমার স্কুল জীবন শেষ হয়।

স্কুল পরবর্তী সময়

তখন মেট্রিক বা এসএসসিকে মেট্রিকুলেশন বলা হতো। সেই বছর এপ্রিল-মে'র দিকে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা যশোর থেকে শেষ করে পরবর্তীতে জুন-জুলাই দিকে সেই একই বছরে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। আমার মায়ের এক চাচাতো ভাই ছিলেন এ কে এম আমিনুল ইসলাম সাহেব। তিনি তৎকালীন সময়ে ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। পরবর্তীতে তিনি বিকিক (বাংলাদেশ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে সরাসরি প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে যান এবং সেখানেই আমার ভর্তি চূড়ান্ত করেন। আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে যাই।

আমি স্বাভাবিকভাবেই তখন শহরের কায়দা-কানুন ভালো জানতাম না। আর ঢাকা শহরেও এর আগে থাকিনি। দু'একবার বেড়াতে এসেছি মাত্র। মামার সঙ্গে যখন প্রিন্সিপালের রুমে যাই তখন প্রিন্সিপালের সামনেই আমি আমার প্যান্টের পকেটে

www.pathagar.com

হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তা দেখে প্রিন্সিপাল আমাকে বললেন, তুমি প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে নাও। আমি সাথে সাথেই হাত বের করে নিলাম। পরে যখন রুম থেকে বের হলাম, রুম থেকে বের হতেই মামা আমাকে বকা দিলেন। বললেন, তুমি এটাও জানো না? কিন্তু সত্যিই আমি এটা জানতাম না যে, কোনটা সঠিক আচরণ আর কোনটা সঠিক নয়। সেই ঘটনাটা আমার এখনো মনে পড়ে কিভাবে ভর্তি হতে যেয়ে প্রথম দিনই এমন ঘটনা ঘটে গেল।

ঢাকা কলেজের তখন অবস্থান ছিল ফুলবাড়িয়াতে। অর্থাৎ পুরানো ঢাকার রেল স্টেশনের অপর পাড়ে। সেখানে পুরানো দু'তিনটি বিল্ডিং এর মধ্যে একটা ছিল কলেজের। তবে সেখানে মাত্র দু'তিনটা ক্লাস আমরা করতে পেরেছিলাম। এরপর আমাদের সময়েই বর্তমান স্থান ধানমন্ডিতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। সেখানে আমরা ১৯৫৫-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করি। তখন ঢাকা কলেজের মাত্র নতুন বিল্ডিং হয়েছে। আমরাই তার প্রথম ছাত্র। ঢাকা কলেজের ডান পাশে নিউমার্কেট। কলেজ এবং নিউমার্কেটের মাঝখানে ছিল ধানক্ষেত। সেই সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা ধানক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে হেঁটে নিউমার্কেটে গিয়ে চা খেতাম। কলেজের চারপাশের পরিবেশ ছিল খুব নীরব। লোকজন ছিল খুব কম। তখনও ধানমন্ডি পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। সেই অংশও অনেকটা ধানক্ষেত ছিল। সবে মাত্র ধানমন্ডি এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে। তবে যতটুকু মনে পড়ে, ঢাকা কলেজের সেটাই ছিল শেষ বিল্ডিং।

সেই দুই বছরের সময়টাও ছিল স্মৃতিময়। সব কথা বলে শেষ করা যাবে না। সব কথা প্রাসঙ্গিকও হবে না। কলেজে আমার রোল নম্বর ছিল একশ। তাই ছাত্ররা কেউ কেউ আমাকে ওয়ান হানড্রেড আর কেউ কেউ সেঞ্চুরি বলে ডাকত। আমি চঞ্চল টাইপের ছিলাম। সবকিছুতেও একটিভ ছিলাম। যার ফলে সবাই আমাকে কম বেশি চিনত। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র ঘোষিত হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সরকার কেন্দ্রে। যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ তাতে আছে। এরা মিলেই কেন্দ্রের সরকার। এ শাসনতন্ত্র সকল ইসলামী দল গ্রহণ করে, সমর্থন করে। সেই সাথে অন্যান্য সকল দলও এটা গ্রহণ করে, একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া। ১৯৫৪ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে তিনশ দশটি আসনের মধ্যে অমুসলিম আসনগুলো বাদে সবটাই যুক্তফ্রন্ট পায়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র দশটি আসন। সে সময় আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় কম্পোনেন্ট (শরিক) পার্টি ছিল। সে দিক থেকে ৫৪তে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর আওয়ামীলীগই ছিল মেজর পার্টি। সেই আওয়ামী সমর্থিত ছাত্ররাও তার ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধীতা করে এবং কলেজে ধর্মঘটের আয়োজন করতে চেষ্টা করে। আমিও তাদের ভিতর একজন ছিলাম যারা

www.pathagar.com

একদম না বুঝে বিরোধীতা করে। যদিও শুধুমাত্র যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সঙ্গে থাকা ছাড়া আমার অন্য কিছু করার ছিল না। এর একটা কারণ ছিল, সে সময়ের বয়সটাই এমন যে তখন রাজনীতি কি তা যে কেউ ভালো বোঝে তাও নয়। কিন্তু তারপরেও মানুষ রাজনীতি করে। বিভিন্ন ইস্যুতে জড়িয়ে যায়। আমার পক্ষে একটা যুক্তি ছিল যে আমার বড় মামা নিজে একজন আওয়ামী লীগের খুব সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার মায়ের আপন ভাই এ কে এম শামসুল হক। আর প্রথমে যার কথা উল্লেখ করেছি তিনি ছিলেন এ কে এম আমিনুল ইসলাম, আমার মায়ের সবচেয়ে বড় চাচাতো ভাই। মায়ের একমাত্র চাচার বড় ছেলে।

আমার মামা খুব চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তার একটা প্রভাব আমার উপর ছিল। সেই কারণে হলেও ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের রাজনীতির একটা প্রভাব আমার উপর ক্রিয়াশীল ছিল। যার ফলেই আমি বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে একদল ছাত্র এর বিরোধীতা করেনি, করতে রাজি হয়নি। যদিও সেদিন কোনো ক্লাস হয়নি। একদল ছাত্র বেশ সাহসের সঙ্গে এ বিরোধীতাকে গ্রহণও করেনি। মীর্জা আজিজুল ইসলাম সাহেবের কথা মনে আছে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট কি সেকেন্ড হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ফজলুল হক হলের ভিপি হয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগ দিয়ে সিভিল সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দেন। তিনিও এর বিরোধীতা করেননি এবং করতে রাজিও হননি।

সে সময় কলেজে একটা কালচার চালু ছিল। তখন জাতীয় রাজনীতি তো ছিলই, তবু প্রায় জায়গাতেই রাজনীতিমুক্ত হয়ে লোকাল সংগঠন গড়ে উঠতো। এরকম সংগঠন ঢাকা কলেজেও ছিল। আমাদের সময় ডেমোক্রেটিক পার্টি ও পাইওনিয়ার পার্টি নামে দু'টি দল ছিল। এসব সংগঠনগুলো হতো কলেজ ভিত্তিক। সেখানে দেখা যেত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও কলেজে ডেমোক্রেটিক হিসেবে সবাই এক। আবার অন্য দিকে পাইওনিয়ার হিসেবে তারাও এক। দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তি যে কোনো একটি পার্টিতে একত্রে আছে। যার ফলে সেখানে ছাত্র রাজনীতি আরেকটা রূপ গ্রহণ করত।

আমি কোনোভাবে তখন ডেমোক্রেটিক পার্টিতে জড়িয়ে পড়ি। সেখানে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ডেমোক্রেট হিসেবে ছিলেন বর্তমান বিএনপির সাবেক এমপি আমার ক্লাসমেট মুসফেকুর রহমান। বর্তমান বিএনপির শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তখন ছিলেন ডেমোক্রেটিকের অন্যতম প্রধান নেতা। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেবও ডেমোক্রেটিকের নেতা ছিলেন। আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে তিনি তখন সেকেন্ড

www.pathagar.com

ইয়ারে অথবা থার্ড ইয়ারে বিএ পড়তেন। আমাদের ব্যাচের সময়ে আমি এবং মুসফেকুর রহমান ডেমোক্রেট নেতা (আহ্বায়ক) হলাম। সে অর্থে আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও হয়ে গেলাম। দু'টি দলের একটিতে জয়েন্ট কনভেনর ছিলাম আমি এবং আমার সেই বন্ধু। মুসফিকুর রহমান পরবর্তীতে সেক্রেটারি হয়েছিলেন। আবার বর্তমান হাওয়া ভবনে বিগত অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচন পরিচালনার জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। এরাই সেই সময় নেতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সেই সময় ছাত্রলীগ, ছাত্রশক্তির ছেলেরা কলেজ রাজনীতিতে একই দলের সদস্য হয়ে কাজ করতেন।

কলেজে থাকাবস্থায় সেই সময় আমি প্রথমবারের মতো ডেমোক্রেটিকের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ি। সাংবাদিকতাও ঠিক বলা যায় না। আমরা একটা বুলেটিন বের করতাম। আমি তার অন্যতম সম্পাদক ছিলাম। একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে আমরা একটা ভুল করে ফেলি। মানুষের স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে তখনও আমি বুঝতে পারিনি। আমারও সে সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা ছিল না। অধিকাংশ লোকেরই শুরুতে তা থাকে না। আবার অনেকের সারা জীবনেও হয় না। আমরা সেই সম্পাদকীয়তে একটা কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলাম 'নোয়াখালীর সব লোক যেমন খারাপ না...'। এ কথাটাকে টেনেই বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলাম, পয়েন্ট আউট করতে চেয়েছিলাম। এর মূল কথা ছিল কোনো স্থানের বা দলের সবাই খারাপ হয় না এবং কোনো এলাকাকে নির্দিষ্ট করে দায়ী করা ঠিক নয়। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে বিষয়টি নিয়ে অপনেন্ট পাইওনিয়াররা তখন আমাদের ধরে বসল। আমরা বিপদেই পড়ে গেলাম। তারা আমাদের পেপার ছিড়ে ফেলল। আমাদের উপর হামলা করার চেষ্টা করা হলো। আমি আগে থেকেই খুব দুর্বল স্টাকচারের ছিলাম। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে সেই সময় Protect করার চেষ্টা করে। সেই উত্তেজনা আট দশ দিন পর্যন্ত ছিল। যদিও ঘটনাটা দুর্ভাগ্যের এবং তা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল। আমি বুঝলাম মানুষের স্পর্শকাতরতাকে বুঝতে হয়। সব সত্য কথাই বলা যায় না। সব সত্য কাজই সবখানে করা যায় না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, সুযোগ ও পরিস্থিতি আছে, তা বুঝেই কাজ করতে হয়।

আমাদের সময় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। আমাদের অংক পড়াতেন মঞ্জুরুল হক স্যার। তিনি ছিলেন এই দেশের প্রথম দিকের ইন্টারমিডিয়েট লেবেলের অংক বইয়ের একজন লেখক। ইংরেজিতেই বই লেখা হতো। পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। খুবই লম্বা মানুষ ছিলেন। সুন্দর ছিলেন। খুবই ভদ্র ছিলেন। খুব সহনশীল ছিলেন। তিনি ভালো

www.pathagar.com

মানুষগুলোর অন্যতম একজন ছিলেন। তার এক ছেলে পরবর্তীতে বড় সার্জন হন এবং আমাদের ফ্যামিলির বন্ধু হয়ে যান। ইবনে সিনা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হলে আমি তাকে সেখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেই। তখন থেকে তিনি ইবনে সিনার মেডিকেল প্রোগ্রামগুলোতে জড়িত হয়ে যান। পরবর্তী এই ডাক্তার জিয়াউল হক আমাদের পারিবারিকভাবে ঘনিষ্ট হন। আমাদের অপারেশনও করেন।

মনসুর উদ্দিন সাহেব ছিলেন আমাদের শিক্ষক। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন দিকপাল। তিনি নিজের ক্ষেত্র অর্থাৎ সাহিত্যের বিরাট ব্যক্তি ছিলেন। তবে ক্লাস পরিচালনায় ছেলেদের মন যোগাতে পারেননি। ক্লাসে তিনি হাসি ঠাট্টা করতেন। ছাত্রদের বাদড় বলে কিংবা অন্য ধরনের বিশেষণ দিতেন। মনে আঘাত পাওয়ার মতো টাইটেল দিতেন। পড়ানোর দুর্বলতার জন্যে তিনি ছেলেদের আকৃষ্ট করতে পারেননি। ফলে এই শিক্ষককে আমরা ছাত্ররা খুব ভালো করে বুঝতে পারতাম না। তখন তাকে পাগল টিচার হিসেবেই ভাবতাম। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম যে এটা ছিল তার একটি ব্যক্তিগত আচরণ। আমরা যখন ধীরে ধীরে আরো বড় হচ্ছি, প্রত্যেকেই যার যার লেবেলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি তখন তার সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিরাট অবদান রেখেছেন। তার অর্জন ব্যাপক। তিনি গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিঠিয়ে থাকা লোকগীতি হারামনি ৩ খণ্ডে সংগ্রহ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তার জ্ঞান, চর্চা, অর্জন অত্যন্ত বড়। এই শিক্ষকের সাথে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস পরবর্তীতে আরো নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা একই পাড়ায় থাকতাম। মনসুর উদ্দিন সাহেব আমাকে তার মেয়েদের পড়াতে বললেন। কিন্তু নানা কারণে আমি পড়াতে পারিনি। মাত্র পাঁচ সাত দিন পড়িয়েছিলাম। তার এক মেয়ে প্রফেসর হয়েছে। এক মেয়ের সাথে আমাদের কাস্টমসের এক অফিসারের বিয়ে হয়। তখন থেকে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হই। সবচেয়ে বড় কথা মনসুর উদ্দিন সাহেবের বাসা আমার বাসা থেকে আধা মাইল দূরে ছিল। আমি থাকতাম বিজয়নগরের কোণায় অর্থাৎ কাকরাইল থেকে বিজয়নগর যেতে ডান দিকে আর তিনি থাকতেন শান্তিনগরে। কাজেই জীবনের শেষের দিনগুলোতে তিনি আমার বাসায় প্রায়ই আসতেন। তিনি আমার খুব কাছের হয়ে যান। আমার ছেলেমেয়েকে আদর করতেন। তার জীবনের শেষের দিকে ইসলাম নিয়ে আমার সঙ্গে তার মতবিরোধ হতো। আমি তার পিছনে সিরিয়াসলি চেষ্টা করি তাকে ইসলামের দিকে আনতে। তিনি নাস্তিকও ছিলেন না, ইসলাম বিরোধীও ছিলেন না। কিন্তু জীবনকে তিনি হালকাভাবে নিতেন। অথবা বলা যায়, আমরা যারা ইসলামের সিরিয়াস কর্মী, সব কিছু বাদ দিয়ে যারা ইসলামের জন্য কমিটেড হই, তিনি ঠিক সেরকম হননি বা এটার ঠিক প্রয়োজন আছে বলে বুঝতেও পারেননি।

www.pathagar.com

এর গুরুত্বও তিনি বুঝতে পারেননি। এর একটা কারণ হতে পারে, হয়তো তাদের ছাত্রজীবনে এর তেমন একটা গুরুত্ব উপলব্ধি ছিল না। তবে তার সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার মনে ইসলামের প্রতি কোনো প্রকার অনীহা ছিল বলে আমার কখনো মনে হয়নি। তার মৃত্যুর পরে তার সম্বন্ধে ছোট্ট একটি লেখাও আমি লিখেছি। ওনার সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ তাতে আছে। যা হোক এই শিক্ষকের সাথে আমি বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে জড়িয়ে পড়ি এবং আমরা ঘনিষ্ট হই।

ঢাকা মেডিকেলের পরিবর্তে জগন্নাথ কলেজ

এরকমভাবে ঢাকা কলেজে আমাদের সময় যারা শিক্ষিত হয়েছিলেন, তারা প্রায় সবাই সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি আইএসসি পাস করলাম। নানা কারণে রেজাল্ট ভালো হলো না। তখন সবাই আমাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে বলল। আমি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হবার জন্য ফরম জমা দেই। ভর্তিও হয়ে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ করে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি আইএসসি পরীক্ষার পর বাংলাদেশের ইসলামী মুভমেন্টের সবচেয়ে বড় দল জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে আসি। সে সময় ২০৫ নং নবাবপুর রোডে তাদের অফিস ছিল। একবার আমি সেখানে যাই। তারা আমাকে একটি দুইটি করে মাওলানা মওদূদীর বই দেয়। সেই বইগুলো আমি পড়ি। আমাকে প্রথম যে বইটি দেয়া হয় তা ছিল মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি'। বইটি ছোট। মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠার হলেও এই একটি বই পড়ার পরই আমার মনে পরিবর্তন আসে। আমি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাই। আমার মনে নতুন করে রেভ্যুলেশন আসে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে একেবারে অল্প বয়স থেকে ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন ছিলাম এবং এ ব্যাপারে আমাকে যে খুব বেশি একটা কেউ প্রভাবিত করেছিল তাও না। স্বভাবসুলভ ভাবেই আমি গ্রামের মসজিদে আজান দিতাম। মসজিদে ইমামতি করতাম। নামাযে আমি নিয়মিত ছিলাম। অল্প বয়স থেকেই রোজা শুরু করি এবং জীবনে তা কখনো ভঙ্গ করিনি। ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে কারো কোনো প্রভাব ছাড়া নামাজে একদম নিয়মিত হয়ে যাই। এমনকি বাপ-মার কোনো উদ্যোগ ছাড়াই। সেটা পরবর্তীতে সব সময় অব্যাহত ছিল।

আমি এখন বুঝি, মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামের দাওয়াত ও কর্মনীতি' বইটি পড়ার আগে আমি যে ইসলাম করতাম বা বুঝতাম সেটা ছিল একদম একটা অতি সাধারণ মানের ইসলাম সম্পর্কে বোঝা। এর বাইরে আর কোনো বোঝাপড়া আমার ছিল না। এটা সাধারণ মানুষের ব্যাপারেও একই রকম। নামাজ রোযা এসবই ইসলাম, এর বাইরে যে ইসলামের একটা ব্যাপকতা আছে তা জানতাম না। এই বিশ্ব সভ্যতায় এটা যে একটা বড় অংশীদার, জীবনের বিধান, এটা যে সারা জীবনকে গাইড করতে

www.pathagar.com

চায়, তাকে সংযত করতে চায়, নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, একটা সৎ দিকে (honest direction) প্রভাবিত করতে চায় এবং তার যে একটা কালচার রয়েছে অথবা তার এমন সব নীতিমালা রয়েছে যা কালচারকে প্রভাবিত করে - এসব জিনিস আমি সে বই পড়ার আগের মুহূর্ত আগ পর্যন্ত একেবারেই বুঝতে পারিনি। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর এই বইটি প্রথম পড়েই বুঝে যাই, তিনি খুব শক্তিশালী একজন লেখক ও চিন্তাবিদ। এই লেখক খুব সুন্দরভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারেন। আর সেই সাথে আমি এটাও বুঝতে পারি যে, ইসলামের দাওয়াত একটা মহৎ দাওয়াত। তিনি যে কর্মপদ্ধতি দিয়েছেন সেটা একটা ফলপ্রসূ কর্মপদ্ধতি। এতে আমি কনভিন্সড হয়ে যাই। এটা এও প্রমাণ করে যে, তিনি, মাওলানা মওদূদী কত শক্তিশালী লেখক ছিলেন। একজন মানুষ তার একটি মাত্র বই পড়ে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে - এটা তার চিন্তার গভীরতাও প্রমাণ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সময়ই মাওলানা মওদূদীর বেশ কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ হয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ইসলামী আন্দোলনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচি, ইসলামী বিপ্লবের পথ, শান্তির পথ, ভাঙাগড়া'র মতো বই যেগুলোতে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলোর অনুবাদ হয়ে যায়। কথাগুলো প্রাসঙ্গিকতার জন্যেই এসে গেছে। যাই হোক, আমি সেই থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংস্পর্শে আসি। তারা আমাকে এর প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘে কাজ করতে বলে। তাদের সাথে যোগাযোগ হলো এবং আমি কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করলাম।

আমার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সময় হয়ে আসল। তখন ছাত্র সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ব্যারিস্টার কোরবান আলী সাহেব। তিনি তখন আরবি শেষ বর্ষের ছাত্র। পরবর্তীতের তিনি ব্যারিস্টার হন এবং এর আগেই এম এ পাস করেন। তিনি তখন থেকেই বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সাথে সক্রিয় ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীতে ছিলেন। যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ইসলামিক মিশন স্থাপন করেন। লন্ডনে থেকে তিনি ইসলামের জন্য বড় ধরণের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ইসলামী মুভমেন্টের ভিতর প্রথম ব্যারিস্টার। তিনিই আমাকে একেবারে টেনে ধরে, জোর করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে জগন্নাথে ভর্তি হতে হবে বলে তিনি আমাকে বিএ-তে ভর্তি করিয়েছিলেন। আমার মেডিকেলে আর ভর্তি হওয়া হলো না। 'দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রেডিকাল টার্ন ইন মাই লাইফ'। আমার হবার কথা একজন ডাক্তার। আজকে আমি হয়ত বা একজন প্রখ্যাত কিংবা অখ্যাত ডাক্তার হতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে আমার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। 'মাই লাইফ চেঞ্জড টোটালি অন দ্যাট ডে এন্ড আই গট এডমিটেড ইনটু জগন্নাথ কলেজ।'

www.pathagar.com

আমি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার পরিবার তাতে খুব একটা সন্তুষ্ট হয়নি। বিশেষ করে আব্বা এটাকে ভালো চোখে দেখেননি। এটা স্বাভাবিক ছিল। সঠিক ও সঙ্গত চিন্তাই তাদের ছিল যে, মেডিকেল কলেজ বাদ দিয়ে সাধারণ ডিগ্রির জন্য কলেজে ভর্তি হওয়াকে মেনে নেবে না। যাই হোক, তারা এ ব্যাপারে আমাকে খুব চাপ দেননি। তারা বলেননি যে, তুমি জগন্নাথ কলেজ ছেড়ে দাও, আবার মেডিকেল কলেজে ফিরে আসো। সেটাকে আমি তাদের মহত্ত্বই বলব।

জগন্নাথ কলেজ তখন বর্তমানের স্থানেই ছিল। এখন সেখানে অনেক নতুন দালানকোঠা হয়েছে। গত দশ পনেরো বছর আমি সেখানে যাইনি। ফলে কলেজের কি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়েছে জানি না। শুনেছি আমাদের সামনের ভবনের পিছনে বিরাট একটা কয়েকতলা নতুন ভবন হয়েছে। পাশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা বিল্ডিং ছিল সেটাও নাকি তারা পেয়ে গেছে। বর্তমানে ছাত্রও বহুগুণে বেড়ে গেছে। কিছু দিন আগ পর্যন্ত সেখানে দিবা ও নৈশ ক্লাস হতো। আমাদের সময় রাত্রের ক্লাস ছিল না। তখন অনার্স ছিল না, এখন অনার্স হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হয়েছে। সবশেষে জগন্নাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। কাজেই জগন্নাথের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

জগন্নাথ কলেজ অনেক স্মৃতিময় ছিল। কোনো কোনো স্মৃতি বড় করে মনে পড়ে। একবার জগন্নাথ কলেজে একটা ডিবেট হয়। ডিবেটের বিষয় ছিল 'পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়'। আমি বিতর্কে অংশ নেই এবং আমি পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়-এর পক্ষে ছিলাম। সেই ডিবেটে জাজ হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ডিবেটে আমি প্রথম হই এবং টপ ডিবেটর হিসেবে গণ্য হই। সেখানে আমাদের যুক্তিগুলো অত্যন্ত শক্ত ও ভালো ছিল। আমার মনে আছে, আমি খুবই ভালো বলেছিলাম এবং আমার শিক্ষকরা সেটার খুব প্রশংসা করেছিলেন।

আমার সময়ই প্রথম জগন্নাথ কলেজে ইসলামী ছাত্র সংঘের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দায়িত্ব আমার উপরই আসে। সে সময় প্রায় বিশ ত্রিশজন ছাত্রকে আমি ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী বানাই। সে সময়ে আমার সঙ্গে যারা পড়তেন তাদের একজন ছিলেন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সাহেব। তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য হন এবং এর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাও ছিলেন। এছাড়াও যারা ছিলেন তারা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দিলাম। সারা বছর নানা কাজেই ব্যস্ত থাকতাম। ফলে পড়াশুনাও তেমন করতে পারিনি। শুধু পরীক্ষার আগের তিন মাস প্রস্তুতি নেই। এমনিতে নানা সামাজিক কাজ ও ইসলামী আন্দোলন ছিল, এর মধ্যে আরো ছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে মার্শাল ল'। আমাদের পরীক্ষা ১৯৫৯ সালের খুব সম্ভব জুনের দিকে হয়। আটান্নর মার্শাল ল' হওয়ার কারণে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়টাকে আমি আমার পড়াশুনার জন্যে পুরোপুরি কাজে লাগাই। নিজে নিজেই প্রস্তুতি নিয়েছি খুব ভালো করে, কোনো শিক্ষকের কাছে নয়। পাঠ্য বইগুলো খুব ভালো করে পড়েছি। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আমি পাঠ্য বইগুলো বেশি ব্যবহার করেছি একেবারে সরাসরি বইয়ের ভাষায়। ফলাফলের জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম। সে সময় ডিগ্রিতে বিশেষ করে বিএ পরীক্ষায় কখনো কোনো ফার্স্ট ক্লাস পেত না কেউ। এ রকম ফলাফল হতো আমাদের মার্কিং সিস্টেমের জন্য। সেটা এমন ছিল যে খুব ভালো লিখলেও কেউ ফার্স্ট ক্লাস পেত না। এরকম একটা অত্যন্ত বাজে ট্রাডিশন আমাদের দেশে ছিল। এর কোনো যুক্তি আমি খুঁজি পাই না। আমি মনে করলাম, আমি সেকেন্ড ডিভিশনও পাবো না। ফলে যখন রেজাল্ট বের হলো রেজাল্ট শিটের থার্ড ডিভিশন আগে দেখা শুরু করলাম। আমি দেখলাম সেখানে আমার রেজাল্ট নেই। স্বভাবতই আমি খুবই আতঙ্কিত বোধ করলাম– কি হলো না হলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আমি সেকেন্ড ডিভিশনে আমার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম।

তখনও আমি বুঝিনি যে সারাদেশে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। আমার মনে আছে সেদিনের ঘটনা। আমি সেদিন ফজলুল হক হলে গেলাম। সেখানে আমার কয়েক জন বন্ধু থাকত তাদের কাছে গেলাম। তারা তিন তলায় থাকতো। আমাকে দেখেই তারা হইচই করে উঠল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম কেন তারা এত হইচই করেছে। তখন তাদের কাছেই প্রথম শুনলাম- রেডিওতে তারা শুনেছে আমি নাকি সারা দেশে সেকেন্ড হয়েছি। আমি একদম আকাশ থেকে পড়লাম এবং অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম। আমি টেনস (tense) হলাম। আমার মনে টেনশন সৃষ্টি হলো। আমার স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হলো। আমি এটা ভাবিনি যে, আমি সারা দেশের মধ্যে সেকেন্ড হয়ে যাব। অর্থাৎ পরিস্থিতিতে আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লাম। আমার মনে আছে, আমি বাসায় ফিরলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি হাঁটতে পারছিলাম না ভালো করে। আমি অন্য এক অনুভূতিতে আক্রান্ত ছিলাম। ফজলুল হক হল থেকে শান্তিনগরের আমাদের বাসা পর্যন্ত কিভাবে যে এসেছি! আনন্দেই বলি বা আবেগে কিংবা অনেকটা অবাক হয়ে বলি, এই অবস্থা আমার হয়েছিল।

পরদিন কলেজে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করলাম। সব শিক্ষকরা মিলে আমাকে কনগ্রাচুলেট করল। বিএ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল কুমিল্লা থেকে।

www.pathagar.com

তারা বললেন, তুমি সেকেণ্ড হয়েছ। কিন্তু ফার্স্টের থেকে মাত্র কয়েকটা মার্কসের পার্থক্য ছিল। আমরা তোমাকে ফার্স্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। এই কথাটা শোনায় আমি তা খুব ভালো বলে মনে করিনি। কারণ যে ফার্স্ট হবে তার স্থান কেন আমি নিতে যাব বা আমি কেন তাকে তার গৌরব থেকে বঞ্চিত করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। জগন্নাথ কলেজের অনেক ঘটনাবহুল সময়কে পিছনে রেখে মাস্টার্স ১ম পর্বে, পলিটিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি হলাম। ফজলুল হক হলে সিট নিলাম। রুম নাম্বার ডব্লিউ-৩। চার সিটের রুম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকের অংশক এবং কার্জন হলকে বোঝাত। এখনকার লোকেরা সেটা বুঝতেই পারে না। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের পূর্ব পাশের ছোট অংশটাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে সেখানে একটা তিনতলা বিল্ডিং করা হয়। কার্জন হলে সায়েন্সের ক্লাসগুলো হতো। বর্তমান কলাভবনের মূল বিল্ডিং তখন ছিল না। তখন ছাত্র সংখ্যাও কম ছিল, চার পাঁচ হাজারের মতো সব মিলিয়ে। পরিবেশ ভালো ছিল। সব জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাও ছিল না, যে সমস্ত মেলামেশা আজকাল আমরা দেখি। মেয়েরা আলাদাই চলত। বলা যায়, তখন এমন কিছু হতে দেখিনি যা আমাদের ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতার বিরোধী ছিল। তবে এ কথা ঠিক যে হিজাবের প্রচলন তেমন ছিল না। যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশে, তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানে কেন জানি হিজাব কমে গিয়েছিল। কেন এমন ঘটেছিল জানি না। পূর্ব পাকিস্তান তখনও রক্ষণশীল অঞ্চল ছিল। ঢাকার তখন পুরানো ঢাকাই ছিল প্রধান। সেখানেও রক্ষণশীল পরিবারই ছিল বেশি। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার এলিট মহলের একটা বড় অংশ সেকুলার হয়ে গিয়েছিল। সময়টা বায়ান্নর পর থেকে বলা যায়। ভাষা আন্দোলনকে কিছুটা আড়াল করে পরিকল্পিতভাবে তৎকালীন লেফট সেকুলার এলিমেন্ট যাদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো ভালো ধারণা ছিল না, তারাই এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল।

আমার সময়ই আমি এটা লক্ষ্য করি। তখন ছাত্র রাজনীতি ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ছাত্র শক্তি প্রভৃতি দলের ছাত্র রাজনীতি ছিল। ইসলামী ছাত্র সংঘ ছিল নতুন। কিন্তু আস্তে আস্তে সংঘের প্রসার হতে থাকে। তৎকালীন সময় আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে যাই। সে সময় এখানে জাতীয়তাবাদের জোয়ার দেখা দেয়। কোনো সন্দেহ নাই যে, নানা কারণে তখন পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে থাকে। নানা কারণে এটা ঘটে। এর মধ্যে

www.pathagar.com

একটা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। পলিটিক্যাল নেতারা জনমত, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেননি। মিলিটারিদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এটাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব নানাবিধ কারণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে থাকে এবং স্থানীয়ভাবে একটা শক্ত জাতীয়তাবাদের দেখা দেয় যাকে আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলি। এ তার ফলাফলও তো আমরা সবাই জানি। এটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

আমি এটাও লক্ষ্য করি যে, ইসলাম সম্পর্কে তখনই মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ব্যাপক ছিল। এখনও আছে। বর্তমানে অনেক বিষয় অনেক সুস্পষ্টতা এসেছে যা তখন এতটা ছিল না। যেমন, ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে সে সময় ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি ছিল। যেমন তখন ধারণা ছিল ইসলামের ভিত্তিতে কোনো অর্থনীতি গড়া সম্ভবই নয়। যে সুদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা ক্ষতিকর বিষয়, অত্যাচার ও নির্যাতনের একটা হাতিয়ার, সুদের কারণে অসংখ্য ব্যবসা ফেল করে, যে সুদকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন, সেই সুদকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যেটা ইসলামের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হওয়া উচিত সেটাকে একটা মাইনাস পয়েন্ট করা হয়। বলা হয়, ইসলাম সুদ হারাম করেছে, কিন্তু সুদ ছাড়া কি করে ব্যাংক করা সম্ভব আর ব্যাংক ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি তো সম্ভব নয়। ব্যাংক ছাড়া অর্থনীতি হবে না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি অসম্ভব। এরকম যুক্তিমালা দাঁড় করানো হতো যা আজকের দিনে ইসলামী ব্যাংকের আবির্ভাব ও অগ্রগতির প্রেক্ষিতে আর দাঁড় করানো সম্ভব নয়।

এছাড়াও নানা ধরণের ভুল বোঝাবুঝি তখন ছিল। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্ভব নয় এই ধারণাও মানুষের মধ্যে ছিল। সেটা অবশ্য পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরপরই চলে যায়। তখন আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। বাম রাজনীতির থেকে জামায়াত ইসলামী সম্পর্কে সে সময় প্রচণ্ড প্রোপাগান্ডা চালানো হতো। বলা হতো এরা আমেরিকার এজেন্ট। যদিও জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার এজেন্ট কখনই ছিল না। কিন্তু এটা বলা হতো যেহেতু জামায়াত সোসালিস্টদের খুব বড় ধরণের বিরোধীতা করত। এর দুটি কারণও ছিল। একটি হলো সোসালিস্ট ডিক্টেটরশিপের কারণ। আরেকটি হলো সোসালিজমের ভিতরে নাস্তিকতার প্রাধান্য। এছাড়াও তাদের অভিমত হলো সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা এবং ব্যক্তিকে দুর্বল করা, সমাজকে দুর্বল করা। এসব কারণে জামায়াত ইসলামী শক্তভাবে ইসলামের ভিত্তিতে বা ইসলামকে উল্লেখ করে সমাজতন্ত্রের বিরোধীতা করত। এদিকে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করলেই তারা ধরে

www.pathagar.com

নিত সেটা ক্যাপিটালিজমের পক্ষে চলে গেছে। আর ক্যাপিটালিজমের পক্ষে চলা মানেই আমেরিকার পক্ষে যাওয়া। এই ছিল তাদের যুক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সোসালিজম বা ক্যাপিটালিজম কোনোটারই পক্ষে নয় তা বুঝতে বিভ্রান্তি হয়েছিল বা ইচ্ছা করেই এই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল। এই দুইটি মতবাদেরই জন্ম পশ্চিমে। ইসলামের বিচারে সোসালিজম অনেক বেশি দূরের। ক্যাপিটালিজমও দূরের। কিন্তু সোসালিজম আরো বেশি। তুলনামূলকভাবে ক্যাপিটলিস্ট সোসাইটি বা ওয়েস্টার্ন আমেরিকান সোসাইটির গণতন্ত্র জিনিসটা ইসলামের কাছের। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ও ইসলামের নিকটবর্তী। প্রপার্টি কিছু না কিছু ব্যক্তি রাখতে পারে এটাও ইসলামের কাছাকছি। এসব দিক থেকে বিচার করতে গেলে সোসালিজম ইসলাম থেকে অনেক দূরে। ক্যাপিটালিজম সেই তুলনায় দূরে কিন্তু অত দূরে নয়। এই বিষয়গুলি তারা বলেননি। তারা শুধু জনগণকে বিভ্রান্ত করত এভাবে যে, সোসালিজমের এরা বিরোধিতা করছে নিশ্চয় এটা আমেরিকার দালাল। কিন্তু এটা খুব সাধারণ মতামত। এটা একটা জটিল বিষয়কে সাধারণ করে দেখা।

মূলত ইসলাম না ক্যাপিটালিজম না সোসালিজম। ইসলাম একটা স্বতন্ত্র বিষয়। এর একটা বিশ্বাস রয়েছে। স্ট্রাটেজি, কালচার, মেথড রয়েছে। এটা একটা জীবন পদ্ধতি (Way of life)। তার মধ্যে অবজেক্টিভ দৃষ্টিতে সোসালিজমের বা ক্যাপিটপলিজমের সাথে কিছু কিছু মিল আছে এবং অনেক অমিল আছে। স্ট্রাটেজিতেও কিছু মিল আছে কিছু অমিল আছে। এভাবেই বিষয়টিকে বিচার করতে হবে। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসব বিষয় তেমন বিচার করা হয়নি। আর আমাদের আচরণেও কিছু না কিছু ভুল থাকতে পারে। মনে হতে পারে কোথাও আমরা এমন কাজ করেছি যে আমাদের পলিসি প্রো-আমেরিকান। এটা তাদের মনে হয়ত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা সত্য ছিল বলে আমি মনে করি না।

তখন সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে দেশের মানুষ কনজারভেটিভই ছিল বলা যায়। চুয়ান্নতে যে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট দেয় সে আওয়ামী লীগ তখন আওয়ামী-মুসলিম লীগ ছিল। যখন তারা মুসলিম লীগ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করল তখনও তারা কিন্তু তাদের গঠনতন্ত্রে বলল যে, তারা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো কিছু করবে না। তারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের অধীনেই প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করল। এর আওতাতেই তারা দেড় বছর কেন্দ্রীয় সরকার চালালেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দিয়ে। এমনকি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের যে মেনিফেস্টো ছিল তাতেও একথা সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে, কুরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কিছু করা হবে না। আর

www.pathagar.com

বর্তমানে বাংলাদেশে তারা যে সর্বশেষ নির্বাচনে অংশ নিল ১ অক্টোবর ২০০১ সালে তার জন্য যে মেনিফেস্টো তারা ইস্যু করেছিল তাতে তারা নতুন করে একথাই পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু করবে না। তবে এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগের ভিতরে সেক্যুলারিজমের একটা প্রভাব ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই যে মুসলিম চেতনার বাইরে একথা আমি বলব না। তখন তো ছিলই না। তারা বাঙালী বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ দেখেনি। তারা সংঘর্ষ আছে বলেও মনে করেনি। আরবের অনেক লোক আছে যারা আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘাত দেখে না। তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে নানা মত হতে পারে। একবাক্যে এই কথাটা শেষ করে দেয়া যায় না। এটা জটিল একটা বিষয় যেখানে বিভিন্ন মত হতে পারে এবং তা তাৎপর্য পূর্ণ হতে পারে।

এসব দিক বিবেচনা করলে আমি বলব, সামগ্রিক বিচারে আমাদের দেশের জনগণ ইসলামিক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও বেশির ভাগ ছাত্রই ইসলামিক ছিল। খুব অল্প সংখ্যকই ইসলাম বিরোধী ছিল। তবে যারা ভোকাল বা যারা কথা বলে তাদের একটা বড় অংশ ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন। তখন এমনিতেই কমিউনিজম, সোস্যালিজমের জোয়ার। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা অনেকে নাস্তিক ছিল, অনেকে নাস্তিকের কাছাকাছি। তারা ধর্মীয় লোক ছিল তা বলা যাবে না। যদিও এসব লোকই পরবর্তীকালে, আমি নিজে দেখেছি, সংখ্যায় প্রায় নব্বই ভাগ সোসালিজম ছেড়ে দিয়েছে কিংবা সোসালিজমকে সঠিক বলে আর মনে করেনি। তাদের অনেকেই নামাজী হয়ে গেছে, তাদের অনেকেই হজ্জ করেছে। এমনকি তাদের অনেকেই বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে যোগ দিয়েছে। সেই সাথে সোসালিজমের পতনের পরে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে।

আমার বিভিন্ন লেখায় এবং বক্তৃতায় আমি বলেছি - এখানে সেকুলারিজম মানে ঠিক রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে মুক্ত করে ফেলা নয়। কিতাবী সেকুলারিজম আর আওয়ামী লীগের সেকুলারিজম বা বিভিন্ন পার্টির সেকুলারিজম এক করে দেখা ঠিক হবে না। সেকুলারিজম শব্দ ডিকশনারিতে যাই থাকুক বা টেকনিক্যালি যাই হোক এখানে বাস্তবে 'কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না' এবং সেই সাথে সেকুলারিস্টরা 'আমি সেকুলার' এই কথার মধ্যে কোনো সংঘাত দেখা যায় না। অর্থাৎ তারা সেকুলারিজমকে মনে করে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এখানে ধর্ম অসহিষ্ণু হবে না।

www.pathagar.com

১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। এমএ-তে আমার একটি পেপার ছিল সোসালোজি বা সমাজ বিজ্ঞান। সোসালোজি আমাদের সময় থেকেই শুরু হয়। নতুন সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের দু'এক ব্যাচ আগেও এই বিষয়টি পড়ানো শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাবজেক্ট খোলা হয়। আমরা প্রথম কয়েক ব্যাচের মধ্যে ছিলাম। এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা পেপারও ছিল। সে হিসাবেই আমি এটা পড়ি।

সোসালজি পড়তে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম এর মাধ্যমে এখানে নাস্তিকতা ছড়ানোর একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। সোসালজিতে সমাজ স্টাডি করা হয় এবং সমাজের অংশ হিসেবে ধর্মকে পড়ানো হয়। এখানে ধর্মকে সরাসরি সোসালজিতে পড়ানো হয় (ধর্মীয় সাবজেক্ট বাদ দিলে)। অর্থাৎ ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি, সংস্কৃত বা ফারসি বাদ দিলে কোনো আধুনিক সাবজেক্টের মধ্যে ধর্ম পড়ানো হয় কেবল সোসিওলজিতেই এবং এটাকে সমাজের একটা ফেনমেনন মনে করা হয়। ধরে নেয়া হয় সমাজে যা কিছু ঘটছে তা মানুষই করছে। সমাজ স্টাডির অংশ হিসেবে ধর্মকে স্টাডি করা হয় এবং এটা ধরেই নেয়া হয় যে ধর্ম মানুষ তৈরি করেছে। সেই ভিত্তিতেই ধর্মকে পড়ানো হয়।

স্বাভাবিকভাবে যদি ধর্মকে ধরে নেয়া হয় যে সেটা মানুষ সৃষ্টি করেছে তাহলে বলাই যায় সে ধর্ম নাস্তিকতার জন্ম দেবেই। সেখানে ধর্মকে এভাবে পড়ানো হয় না যে ধর্ম সম্পর্কে ধর্মের বক্তব্য কি? সেখানে বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্য আলাদা করেও পড়ানো হয় না। তবে সেখানে দু'টি মতামতের ভিত্তিতে পড়ানো যেতে পারে। প্রথমত ধর্মের বক্তব্য কি আর দ্বিতীয়ত যারা ধর্মকে মানেন না তাদের বক্তব্য কি? তাও পড়ানো হয় না। সোসালজিতে এটা সমাজের একটা ফেনমেনন মনে করা হয় এবং ধরেই নেয়া হয় সমাজে সকল ফেনমেননের জন্মদাতা হচ্ছে মানুষ।

ফলে সোসালোজি ডিপার্টমেন্টের টিচারদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক ছিলেন। সেখান থেকে নাস্তিকতা ছাড়াবারও চেষ্টা করা হতো। এতে ছেলেমেয়েরা মনে আঘাত পেতো। এরকম পরিস্থিতিতে আঘাতই পেয়ে থাকে। অথচ এটা খুব যুক্তিযুক্ত নয় যে ধর্মকে মানুষের সৃষ্টি বলে ধরে নিতে হবে। তারা ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ায় না। তারা তুলনামূলক এ আলোচনা করে না যে, যারা বলে ধর্ম আল্লাহর সৃষ্টি তাদের বক্তব্য কি আর যারা বলেন মানুষের সৃষ্টি তাদের বক্তব্য কি? তাহলেও বোঝা যেত, কিন্তু তা করা হতো না।

এতে আমিও অন্যান্য সকল ছাত্রের মতোই কষ্ট পেতাম। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করে যেতাম। হজম করে যেতাম। তবু এ নিয়ে শিক্ষকদের সাথে কিছু কিছু বিতর্কও

www.pathagar.com

হতো। যদিও তাদের সাথে খুব বেশি বিতর্ক করা সম্ভব হতো না, আবার সেটা আমরা করতামও না। এর প্রভাবে যে আমাদের সব ছেলেমেয়েরা নাস্তিক হয়ে গেছে তাও নয়। কারণ যাদের আলাদা করে ধর্ম বা ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা আছে তারা সোসালোজির এই প্রচারণা দ্বারা প্ররোচিত হতো না। আমার মনে পড়ে আমাদের এক টিচার ছিলেন, নূর মোহাম্মদ নামে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব এগ্রেসিভ ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে খুব কঠোর কথা বলতেন। কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছা নূর মোহাম্মদ মিয়া সাহেব পরবর্তীতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যান এবং আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণে তিনি একটি কবিতার বই লেখেন। সেটা হয়েছিল বাংলাদেশ হবার পরে। আমার সাথেও পরে তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি বিভিন্ন সময় আমাকে টেলিফোন করেন, চিঠি দেন। আমাদের বিভিন্ন সময় দেখাও হয়েছিল। আমি তখন সিনিয়র অফিসার হয়েছি। আমিও তাকে যথাসাধ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও সাহায্য করেছি এবং করার চেষ্টা করেছি। আমি অবাক হয়েছি, নাস্তিকতার প্রচার যে সাবজেক্টের মাধ্যমে করা হতো সেই সাবজেক্টেরই একজন সিনিয়র টিচার কীভাবে এমন হয়ে গেলেন।

সোসালোজি ডিপার্টমেন্টের এ বিষয়টি আমাকে বিভিন্ন সময় নাড়া দেয়। আমার মনে হয় সোসালোজি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ইসলামিস্টদের অনেক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান তার The Crisis of the Muslim Mind বইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুসলমানদের জন্য দুঃখজনক যে, নানা ঐতিহাসিক কারণে সোসাল সায়েন্সের (Social Science) বিষয়গুলো মুসলমানদের হাতে পুরোপুরি ডেভেলপ করেনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তারও বিভিন্ন কারণ তিনি তার সে বইতে ব্যাখ্যা করেছেন। যেসব বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া দরকার তার মধ্যে প্রথমেই তিনি বলেছেন আচরণ বিজ্ঞানের (Behavioural Science) কথা যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। এসব সোসাল সায়েন্সে বিষয়গুলোতে আগে নজর দেবার কথা তিনি বলছেন। এর মধ্যে Psychology, Sociology, Political Science, Anthropology-র কথা তিনি বলছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম বলছে যে, এ সকল বিহেভিয়ারের ভিত্তি হওয়া উচিত 'আল ফিতরা' - যেটা ইসলামে রয়েছে, ইসলাম যে জিনিসটা ভিত্তি করেছে। আল ফিতরা হলো মানুষের বেসিক স্বভাব। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, কুল্লু মওলুদিন আলাল ফিতরা - অর্থাৎ সকল জন্ম হয় বেসিক নেচারের (Nature) উপর। পিতামাতাই সন্তানদেরকে পরিবর্তন করে খৃস্টান বা ইহুদী বানায়। ড. সুলেমান আরো বলছেন, বেসিক নেচারই মূলত ইসলাম। অর্থাৎ বলা যায়, ইসলামই ফিতরা, ফিতরাই ইসলাম। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় মানুষের মৌলিক স্বভাবটাই ইসলাম।

www.pathagar.com

তিনি বলছেন, সোসাল সায়েন্সগুলো বিশেষ করে বিহেভিয়েরাল সায়েন্সগুলোকে এই ফিতরাতের উপর স্থাপন করতে হবে। কারণ ফিতরাত বা মৌলিক বেশিষ্ট্য হলো তার যে মানসিক গঠন সেটাই ফিতরাত, সেটাই আচরণ। কাজেই সকল বিহেভিয়েরাল সায়েন্সের ভিত্তি হতে হবে ফিতরায়। আমিও তার সাথে এক মত। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি কথা বলেছেন যে Sociology, Psychology, Anthropology প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ভিত্তি করতে হবে, আমাদের বানোয়াট চিন্তাধারার উপর নয় মূলত আমাদের বেসিক ফিতরাতের উপর। আমাদের বের করতে হবে যে মানুষের বেসিক ফিতরাতটি কী? মানুষের মৌলিক কাঠামোটি কী? সেটি বের করাই আমাদের কাজ এবং তার উপরই আমাদের এসব সোসাল সায়েন্সগুলোকে দাঁড় করাতে হবে।

মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব পলিটিক্যাল সায়েন্সের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পাওয়ারফুল টিচার ছিলেন। তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন। তিনি সেকুলার ছিলেন। তার পড়াশুনাও স্যেকুলার ধরনের ছিল। একবার ক্লাসে তার সঙ্গে আমার বিতর্ক হয়। একদিন তিনি ক্লাসে বললেন, ইসলামকে কি করে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তি করব যেখানে মুসলমানরা মুসলমানের সংজ্ঞা (Definition) নিয়ে একমত না। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাবে যে দাঙ্গা হয়েছিল এর উপর মুনীর কমিশনের একটি রিপোর্ট তৈরি করে। তিনি সেই রিপোর্ট পড়েছিলেন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন জাস্টিস মুনীর যিনি পাকিস্তানের চিপ জাস্টিস হয়েছিলেন। মুনীর সাহেবও সেক্যুলার ছিলেন। তিনি তার রিপোর্টে এমন এক কথা বলেছিলেন যে, ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া খুবই কঠিন, অসম্ভব, যেখানে মুসলিম-এর ডেফিনেশনেই তারা একমত নয়। মুসলিম কাকে বলে এর কোনো ডেফিনেশন নেই। একথাটাকেই আমাদের ক্লাসে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব খুব বড় করে বললেন। এই বক্তব্যটা ঈমানদার ছেলেদের জন্য একটা ধাক্কা ছিল যে, তাহলে ইসলাম কি করে হবে যদি তারা মুসলমানের ডেফিনেশনে একমত হতে না পারে?

কিন্তু আমি বললাম, স্যার আপনি যেটা বলছেন সেটা সঠিক বলেননি। আমি শুধু মুনীর কমিশনের রিপোর্ট পড়িনি-এর উপর যে এনালাইসিস হয়েছে সেটাও পড়েছি। একদল স্কলার An Analysis of Munir Commission Report-হেডিংয়ে এই রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন এবং তারা দেখিয়েছেন এটা আসল কোনো বিষয় নয়। যেমন, আপনি এখন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, আপনি যদি সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে মানুষের সংজ্ঞা কি? তাহলে দেখা যাবে আমাদের উত্তরের ভাষা সবার এক হবে না। সংজ্ঞায়িত করতে গেলে মানুষকে আমরা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করব। কিন্তু আর

www.pathagar.com

মানে এই নয় যে মানুষ নাই কিংবা মানুষ পঞ্চাশ রকম বা মানুষ কাকে বলে তা আমরা বুঝি না। এটা আপনার একটা সুযোগ গ্রহণ করা যে একশ জন আলেমকে আপনি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন মুসলমান কাকে বলে বলতে। তারা একশ ভাষায় বলল। আসলে তারা একই কথা বলেছে। কিন্তু এতে কেউ একটু বিস্তৃত করল, কেউ একটু সংক্ষিপ্ত করল। কেউ ভিন্ন ভাষায় বলল। আর আপনি এই পার্থক্যকে দেখিয়ে বলছেন যে তারা মুসলমান কী - তা বোঝে না।

আসলে মানুষ নিয়েও একই কথা হবে। মুসলমানের চেয়েও মৌলিক হচ্ছে মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে আপনি যদি কোনো গেদারিংয়ে সংজ্ঞায়িত করতে বলেন তাহলে সেখানেও বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলবে। তার মানে এই নয় যে, তারা মানুষের মৌলিকত্ব বা মৌলিক সত্ত্বা সম্পর্কে কিংবা মানুষ কাকে বলে সে সম্পর্কে বোঝে না। সুতরাং মুনীর কমিশন রিপোর্টে বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা হয়েছে একটা একাডেমিক আনফেয়ারনেস বা অসততা। এখানে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উপর জ্ঞানগত অবিচার করা হয়েছে। আমার এ কথা শোনার পরও তিনি আমার কথা মানলেন না। অবশ্যই তিনি অনেক সম্মানীয় ব্যক্তি, আমার টিচার। তিনি আমার যুক্তি না মানলেও ক্লাসের পরে ছাত্ররা আমাকে বলল, তুমিই জিতেছ। এই কথাটা এখনও আমার মনে পড়ে। সেটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়ও। এর ভিতর তত্ত্বগত একটা বিষয় আছে।

আমাদের একজন স্বনামধন্য টিচার ছিলেন ড. নিউম্যান। তিনি হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। তিনি ইহুদী ছিলেন। বড় মাপের টিচার ছিলেন। বড় ফিগার ছিলেন। তাকে বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল। তিনি আমাদের পলিটিক্যাল থট পড়াতেন। প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস পড়াতেন। আমার মনে আছে তিনি আমাদের প্লেটোর বই 'রিপাবলিক' পড়িয়েছেন। রিপাবলিক বইতে এডামেন্টাস সহ অনেক চরিত্রই আছে। তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন চরিত্রে ভাগ করে করে পড়াতেন। ক্লাসের এক প্রান্ত থেকে শুরু করতেন। প্রথম জন এডামেন্টাস হলে অন্যান্য চরিত্রগুলোর দায়িত্ব ছাত্রদের পরপর পালন করতে হতো। এভাবেই তিনি পড়াতেন। তিনি ভীষণভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। তখন এদেশে সোস্যালিস্টদের যে উত্থান হচ্ছিল তাকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে থামাবার চেষ্টা করতেন। সেটা রাইট কি রং ছিল আমি সেদিকে যাচ্ছি না। বিদেশী হিসেবে এতে তার জড়িত হওয়া উচিত হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নেও আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তিনি সিরিয়াসলি মনে করতেন যে সোসালিজম যদি এই দেশে আসে তাহলে এখান থেকে গণতন্ত্রের বিদায় হবে। মানুষদের অধিকার নষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীনতা থাকবে না। এতে একটি

www.pathagar.com

ইন্টেলেকচুয়াল পতন হবে। আধ্যাত্মিক পতন হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট হবে। এতে সকল ধরনের স্বাধীনতা নষ্ট হবে।

আমি তাকে বছর খানেক টিচার হিসাবে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি চলে যান। এরপর ১৯৬১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে আমাদের পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা দিয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সেই ব্যাচে আমি ফার্স্ট হলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছুদিন ল' পড়েছিলাম। সেই সাথে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যও তৈরি হচ্ছিলাম। যদিও ল' পরীক্ষা দেয়া হয়নি কিন্তু কোর্স প্রায় কমপ্লিট করেছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আমার ছাত্রজীবনের স্মৃতিগুলোর যতটুকু মনে পড়ে তা ছিল এই রকমই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। আমি তখন ল' পড়ছি। ছাত্রনেতাও আছি। এ সময় কিছু ঘটনা ঘটে। তখন একদিকে কঙ্গোতে সামরিক ক্যু হয়। আর্মি ক্ষমতা দখল করে এবং পেট্রিস লুবুম্বা, যিনি কঙ্গোর বিপ্লবী নেতা ছিলেন, মার্কিসিস্ট ছিলেন, তাকে আর্মি হত্যা করে এবং জেনারেল মোবুতু ক্ষমতা দখল করেন। এটি বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টদের নাড়া দেয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট পায়। যিনি কোনো অন্যায় করেননি, অত্যাচার করেননি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, উপনিবেশিক শক্তিকে যেতে বাধ্য করেন আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে - তাকে আর্মি হত্যা করল। এতে আমার কাছে যেটা মনে হয় তাহলো পশ্চিমা সরকারগুলো তাদের ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এরকম ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটায়। তারা কখনো এগুলো প্রকাশ্যে বলবে না। কিন্তু সিআইএ'র বাজেট দেখলেই বোঝা যায় এ টাকাগুলো তারা কিভাবে ব্যয় করে, কিসে ব্যয় করে? প্রত্যেক দেশে তারা এজেন্ট তৈরি করে। তারা সিভিল সার্ভিসে, সংবাদপত্রে, আর্মির মধ্যে এজেন্ট তৈরি করে তাদের দিয়ে পারপাস সার্ভ করে। যদিও তারা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়। অন্যরা এরকম কিছু করলে নিন্দা করে কিন্তু নিজেরা সিআইএ'র মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে এ কাজই করে বেড়ায়। রাশিয়া, বৃটেনও এরকম করেছে তবে সবচেয়ে সক্রিয় হলো আমেরিকা। এজেন্টের মাধ্যমেই তারা এরকম অন্যায় কু-কর্ম করে থাকে। তারা খুব ভালো কাজ যে করে সেটা মনে হয় না।

যাই হোক, পেট্রিস লুবুম্বাকে হত্যা করা হলো। এদিকে প্রায় কাছাকাছি সময় ইন্ডিয়াতে রায়ট হয়। যতদূর মনে পড়ে জামশেদপুর, বোরকোলোসহ বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিভন্ন এলাকায় রায়ট হয় এবং হাজার হাজার লোক মারা যায়। অনেকটা আজকের (২০০২ সালের) গুজরাটের ভয়াবহ নৃশংসতার মতো। তখন ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলো পেট্রিস লুমুম্বার হত্যার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করে। কিন্তু ইন্ডিয়ার রায়টের ব্যাপারে একদম চুপ থাকে। অথচ তখন সেখানে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে। ফলে ঐ সময় যারা ডানপন্থী বলে পরিচিত ছিল সিদ্ধান্ত নিল তারা একটা মিটিং করবে। আমি কখনোই এগ্রেসিভ ছিলাম না। সেই সময় দেশে মার্শাল ল' চলছিল। মিটিং সহজে করা যেত না। ফলে নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে ঠিক করলেন যে আমাকে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করা হবে। এদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার হাসনাত সাহেব, তিনি এনএসএফ এর নেতা ছিলেন। কিছুদিন আগে মারা গেলেন ব্যারিস্টার এআর ইউসুফ, তিনিসহ অন্যান্য ডানপন্থী নেতারা আমাকে সভাপতি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং প্রথম বক্তব্য দিতে বললেন। বিক্ষোভ শুরু হওয়ার আগেই ছাত্ররা বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে তৎকালীন আমতলায় একত্র হয়ে গেল। যেহেতু আমি ভালো বক্তা ছিলাম এবং খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখতে পারতাম আমাকে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করানোর সেটাও একটা কারণ হতে পারে। ইসলামী ছাত্র সংঘ তখন খুব একটা শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছিল না তা সত্ত্বেও আমি ছাত্র সংঘের একজন নেতা ছিলাম বলে এরকম করা হলো। আমি দাঁড়ালাম এবং মোটামুটি খুব জোড়ালো একটা বক্তৃতা দিলাম। বাস্তব কথাই বললাম। বাম ছাত্ররা প্রেট্রিস লুমুম্বাকে নিয়ে বলছে অথচ পাশের দেশের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার কথা বলছে না। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে দুই ঘটনারই কথা বলা, প্রতিবাদ করা। তা না করে তারা একটার ব্যাপারে বলছে আরেকটা ব্যাপারে বলছে না।'এটা হচ্ছে তাদের ভারতের দালালী, ভারতের তোষণ নীতি। তারা ভারতের পক্ষে কাজ করছে। এতে তারা গোটা ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না। এই ধরনের বক্তব্যই আমি দিয়েছিলাম। সে সময় হয়ত হতে পারে আমরা পেট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের নিন্দা হয়ত করিনি বা করতে পারিনি। হতে পারে আমাদের পলিটিক্যাল প্রাকটিস সঠিক না হওয়ার কারণে এরকম হয় আমাদের সমাজে। কিন্তু আমি অন্য সাইড তুলে ধরলাম।

এরই মধ্যে ঘটনা একটা ঘটে গেল। নিশ্চয়ই অন্য নেতারা তৈরিই ছিলেন যেটা আমাকে বলেননি। তারা ঐ সভা থেকে আমার দশ মিনিটের বক্তৃতার পরই ছোট্ট একটা মিছিল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে একশ' গজ দূরত্বে অবস্থিত ডাকসু অফিসে গিয়ে হামলা করল। অফিস তালা মারা ছিল। তালা ভেঙে ফেলল। ভিতরের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলল। এরকম একটা ঘটনা মুহূর্তে ঘটে গেল যেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কেননা এগুলো আমি কখনোই পছন্দই করিনি। নিজেও এর মধ্যে জড়াইনি। যারা আমার চেয়েও আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র নেতা ছিলেন, যারা

www.pathagar.com

অন্যান্য সংগঠনের সিনিয়র নেতা তারা এই কাণ্ডগুলো করলেন। তখন আমি থামাতেও চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কথা কে শোনে। আমি এমনিতেই শুকনো দুর্বল ও পাতলা মানুষ। আমি কিছুই করতে পারলাম না।

পরদিন পত্রিকায় কি কি আসল তা ঠিক মনে নেই। এ ঘটনায় তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট খুব সাবধান হয়ে গেল যাতে এখানে কোনো রায়ট না হতে পারে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ ছিল। এখানকার তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি আজফার সাহেব এ ঘটনার পর আমাদেরকে ডেকে পাঠান। জনাব এ আর ইউসুফ, জনাব হাসনাত এবং আমি সহ আমরা সাত আট জন যাই। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আর এগুলো করো না। আমরা এখানে শান্তি চাই। এখানে অশান্তি করলে দেশের সম্মান নষ্ট হবে। ইন্ডিয়াতে আরো প্রতিক্রিয়া হবে। এগুলো করা ঠিক হবে না। তিনি জানালেন, ইতিমধ্যেই বগুড়া সহ কয়েকটা জায়গায় ছোটখাট ঘটনা ঘটে গেছে। সেগুলো সামলাতেই আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তবে তোমাদের সেন্টিমেন্ট আমরা বুঝি। এই সেন্টিমেন্ট আমরা আমাদের গভমেন্টকে জানাবো। ইন্ডিয়ান গভমেন্টকেও জানাবো।

এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি এর থেকে এটাও ফিল করি যে, ছাত্র রাজনীতি কেমন একপেশে হয়ে যায় এটা তার একটা উদাহরণ। হঠাৎ করে কেউ ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে তারও উদাহরণ। আর আমাদের পড়াশুনা ভালো না থাকলে, সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকলে, অভিজ্ঞতা না হলে আমরা আনফেয়ার হয়ে যেতে পারি এটা তাই প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

চাকরি জীবন

আমার সিভিল সার্ভিস জীবন শুরু হয় ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে। আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেই ১৯৬২ সালে। ৬৩ সালের শুরুতে রেজাল্ট হয়। আমার সিভিল সার্ভিসে যোগদানের বিষয়টি ছিল খুবই কাকতালীয়। আমি নিজে কেন জানি এই পরীক্ষা দেয়ার জন্য খুব একটা সিরিয়াস ছিলাম না। আমার মনে আছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার যে বিজ্ঞপ্তি তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সেটা আমি ভালো করে দেখিওনি। আমার আব্বা বিজ্ঞপ্তির কাটিং কেটে সেটা দেখান এবং আমাকে অনেকটা বাধ্য করেন পরীক্ষা দিতে।

আমি পরীক্ষা দিলাম। শুধু একটি বিষয় ছাড়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো করেছিলাম। সেটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ল'। তা না হলে সারাদেশের প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই আমি থাকতাম যদি আমার সেই পরীক্ষাটি খারাপ না হতো। ইন্টারন্যাশনাল ল' আমি নিয়েছিলাম কারণ আমি এ বিষয়ে খুব ভালো ছিলাম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে আমি এ বিষয়ে পড়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম এ বিষয়টিতে খুব ভালো করব এবং সেটাই হবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ বছর এ পেপারের যে প্রশ্নপত্র হয়েছিল সেটা একেবারেই সিলেবাস বহির্ভূত ছিল। একেবারেই নতুন ধরনের হয়েছিল। যার ফলে ঐ বছর যারাই ইন্টারন্যাশনাল ল' নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই ফেল করে যায়। কিন্তু আমি আমার সার্বিক পড়াশুনার কারণে এবং আন্তর্জাতিক ল' খুব ভালো জানা থাকার কারণে কোনোরকমে পার হয়ে যাই। মনে পড়ে, ৪৩ পেয়েছিলাম যেখানে ৮০ পাওয়া উচিত ছিল। আমার দুর্ভাগ্য, যদি আমি কাঙ্ক্ষিত নম্বর পেতাম তাহলে সারাদেশের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া আমার জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেটা হয়নি, আমি সারাদেশে ৫২তম স্থান পাই। পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে বিশতম স্থান পাই।

এর ফলে আমি পাকিস্তান ফাইন্যান্স সার্ভিস বা পাকিস্তান কাস্টমস সার্ভিস পাই। ফাইন্যান্স সার্ভিস কয়েকটি সার্ভিস নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে একটি হলো পাকিস্তান কাস্টমস সার্ভিস। খুব মন খারাপ করেই আমি ১৯৬৩ সনের ১৯শে নভেম্বর ঢাকা থেকে লাহোরে পৌছাই এবং ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমীতে যোগদান করি।

www.pathagar.com

আমি যেহেতু ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিলাম এবং ইসলামের যে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভিতর আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে তার ভিত্তি ছিল মাওলানা মওদূদীর লিটারেচার, সে কারণে মনে করলাম লাহোরে ট্রেনিং একাডেমীতে যোগদান করার পূর্বে আমি মাওলানা মওদূদীর বাসস্থানে যাব এবং উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তারপর একাডেমীতে যোগদান করব। আবার একই শহরে উনার বাসস্থান ও আমার ট্রেনিং একাডেমী হওয়াতে আমি এই সিদ্ধান্ত নেই। আমি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স (পিআইএ) বিমানের একটি ফ্লাইটে লাহোরে পৌছালাম। বিমান বন্দরটি ছোট্ট ছিল। একটাই বিল্ডিং। পরবর্তীতে ২০০০ সালে আমি যখন লাহোর যাই দেখি সেই বিমান বন্দর এখন আর সেরকম নাই, তার থেকে অনেক বড় হয়েছে। আমি সেখানে নেমে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। তখন লাহোরে ট্যাক্সি ছিল। ট্যাক্সি নিয়ে মওলানা মওদূদীর বাসস্থান ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে রাতে পৌছালাম। স্থানটি লাহোরের একটি মহল্লা ইছারাতে অবস্থিত। সেখানে মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতে ইসলামীর কিছু নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। উনাকে আমি আমার আসার কারণ জানালাম। পরে ইয়াকুব তাহের নামে একজন সিনিয়র নেতা আমাকে একাডেমীতে পৌছে দেন।

ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমী

একাডেমীতে আমি নভেম্বর টু নভেম্বর, প্রায় এক বছর ছিলাম। সে সময় আমি একটা পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। সেটা পাসিং আউট পরীক্ষা ছিল। লাহোর একাডেমী খুবই ছিমছাম একটা একাডেমী। অত্যন্ত সুন্দর। প্রায় পঞ্চাশ একর জমির উপর অবস্থিত হবে। তার কেন্দ্রস্থলে আমাদের বিল্ডিং ছিল। সেখানে অবারিত মাঠ ছিল। টেনিস খেলার ব্যবস্থা ছিল। সুইমিং পুল ছিল। আরো অন্যান্য ব্যবস্থাও ছিল।

আমি টেনিস খেলা ভালো করে সেখানেই শিখি। ভালো টেনিস খেলতে পারতাম। একবার প্রতিযোগিতায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে প্রায় ত্রিশজনের মধ্যে তৃতীয় হই। তখনকার সময় পূর্ব পাকিস্তানের ছেলেরা টেনিস খেলা তেমন জানত না। একাডেমীতে যে সমস্ত শিক্ষক ছিলেন তারা সবাই যোগ্য শিক্ষকই ছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন এম এ হানিফ। তিনি আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। এর দু'বছর পরই তিনি বরিশাল বিএম কলেজে চলে আসেন এবং পরে সেখানকার প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। কিন্তু একাডেমীর ছাত্রদের কাছে কেন যেন মনে হতো তিনি ভালো পড়াতে পারতেন না। ফলে তিনিও ভালো সহযোগিতা পেতেন না। তবে তার সাথে কেউ কখনো খারাপ আচরণ কিংবা বেয়াদবী করেনি। তবে ছাত্ররা সবখানে টিচারদের

www.pathagar.com

যেভাবে লেগ পুলিং করে থাকে সেটা অবশ্য তার সাথেও করেছে। আর সেখানে তো সবাই সিনিয়র ছাত্র। একেকজন একেক জায়গা থেকে ফার্স্ট হয়ে এসেছে। ফলে তারা সাধারণ ছাত্রও নয়, প্রত্যেকে নিজের জায়গায় অলরেডি স্কলার। কাজেই লেগ পুলিং যে কিছু করা হতো না তা নয়। তাকেও করা হতো। অন্যদেরও করা হতো। আবার উচ্চারণগত দিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটু ভিন্নতাও লেগ পুলিংয়ের একটা কারণ ছিল।

আমাদের পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন যিনি পড়াতেন তিনি খুবই ভদ্র লোক ছিলেন। উনার নাম ভুলে গেছি। সিন্ধুর লোক ছিলেন। মধ্য বয়সী। পরবর্তীতে শুনেছি তিনি সিন্ধু ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমাদের অর্থনীতির সিনিয়র টিচার ছিলেন জনাব বি. এ. আজহার। খুবই সিনিয়র অর্থনীতিবীদ। তিনি আমেরিকা থেকে পিএইচডি করা এবং একাডেমীর ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি অর্থনীতি খুব ভালো পড়াতেন। ইসলামেরও ভক্ত ছিলেন। আমাদের কিছুটা ইসলামের কথা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন। যদিও তখনো ইসলামী অর্থনীতির থিওরিটিক্যালি লিটারেচারের তেমন কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি যেটা পরবর্তীকালে হয়েছে। তবে তিনি যতটা বুঝতেন ইসলামী অর্থনীতির উপরও আমাদের ততটা বলার চেষ্টা করতেন। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমি এসব কথা আরো বেশি করে আলোচনা করতে অনুরোধ করতাম। তিনি হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানিয়ে বলতেন চেষ্টা করব আরেকটু ভালো করে বলার।

একাডেমীতে ফাইন্যান্স সার্ভিসের ক্যাডারদের মাস্টার্স লেভেলে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ইকোনোমিকস পড়তে হতো। একাউন্টিং পড়তে হতো গ্রাজুয়েশন লেবেলে। জনাব হাশমী বলে এক শিক্ষক লাহোর গভর্মেন্ট কলেজে পড়াতেন। তিনি একাডেমীর স্টাফ ছিলেন না তবে আমাদের একাউন্টিং পড়াতেন। তিনি একজন খুব যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। মি. বাটলিবয় বলে এক লেখকের একটি একাউন্টিং বই তিনি পড়াতেন। ফলে আমাদের কেউ কেউ উনার নাম দিলেন বাটলিবয়। আমরাও তাকে মি. বাটলিবয় বলতাম।

লাহোর একাডেমীর লাইফ আমাদের জন্য রোমাঞ্চকর ছিল। শুধু একটাই ইরিটেশন তখন ছিল, সেটা ছিল পূর্ব পশ্চিমের সম্পর্কের ব্যাপারে। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথা ব্যাপকভাবে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি হতো। রাজনীতিতে আলোচিত হতো। পার্লামেন্টেও আলোচিত হতো। সেই হিসেবে সেটা আমাদের সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করত। যদিও সবাই জানত

www.pathagar.com

একাডেমীতে যারা পড়াশুনা করছে তাদের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নাই কিন্তু তারপরও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একটু হলেও প্রভাব ফেলত। তবে সততার সাথে বলতেই হবে এক দুইজন ছাড়া সবাই সবার বন্ধু ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের দু'একজন ছিল যারা খুবই নাক উঁচু স্বভাবের। আবার পূর্ব পাকিস্তানেরও দু'একজন ছিল যারা খুবই আইসোলেশনিস্ট। তারা বিচ্ছিন্ন থাকা পছন্দ করত। এরকম কয়েকজনকে বাদ দিলে সবাই সবার বন্ধু ছিল। আবার দু'একজন ছিল যারা সব সময় উস্কাতে চেষ্টা করত - একদিকে দেখলে সেটা তো হয়েই থাকে। এছাড়া কারো কারো স্বভাবই এরকম।

ট্রেনিংয়ে থাকা অবস্থায় এর অংশ হিসেবে আমাদের একটা ট্রেন ভ্রমণ করতে হয়। যেটা লাহোর থেকে শুরু হতো। গোটা একাডেমীর স্টাফ, ছাত্র, পরিচালকগণ সবাই মিলে সে উদ্দেশ্যে একটা ট্রেন আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ভাড়া করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণ করতে হয়। এ ভ্রমণে আমরা লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি গেলাম। সেখানে দুই-তিন দিন থাকলাম। একনাগাড়ে প্রায় দশ দিন আমাদের ট্রেনে কাটাতে হলো। রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া সবই ট্রেনের ভিতর। এটাকে প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের একটা অংশ করা হয়েছে। সেটা ছিল দশ দিনের একটা পিকনিকের মতো। এই ভ্রমণের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন অফিস, ইন্ডাস্ট্রিজ, দর্শনীয় স্থানসমূহ সফর করি।

এই এক বছরের আমি লাহোর সম্পূর্ণটা দেখে নেই। বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে বিভিন্ন সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে আমরা পরিচয় হয়। মিশাক বলে একটা পত্রিকা ছিল। একটা ছিল মাশারেক। সেখানে আমি যাই। সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করি। ইসলামিক পাবলিকেশন্স বলে একটা পাবলিকেশন্স আছে সেটা পাকিস্তানের তৎকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিশিং হাউস ছিল। তাদের অফিসে আমি কখনো কখনো গিয়েছি বই কিনতে আবার আলাপ করতে। সালামার বাগ, বাদশাহী মসজিদ, জাহাঙ্গীরের মাকবেরা (কবরস্থান), আল্লামা ইকবালের দাফনের স্থানসহ যত দর্শনীয় স্থান ছিল সব সে সময় দেখি। বাদশাহী মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ি। দু'টি ঈদের নামাজ পেয়েছিলাম। মসজিদটি খুবই বিরাট।

একাডেমীতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করেই আমি একবার সিরিয়াস ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। এতে পরীক্ষা দিতে প্রায় অসমর্থ হলাম। এর জন্য আমি পরবর্তী দুই তিন বছর খুবই কষ্ট পেয়েছি। পরীক্ষার মধ্যে এমন এক সময় ম্যালেরিয়া হলো মনে হলো আমি আর পরীক্ষাই দিতে পারব না। কিন্তু আমার মনে পড়ে সেখানে

www.pathagar.com

আমাদের এক ডাইরেক্টর আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিষয়টি দেরিতে জেনেছিলেন। তিনি বিশেষ যত্ন নিয়ে হাসপাতালে পাঠান এবং পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন যাতে আমি পরীক্ষা দিতে পারি। আমি সেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল। ম্যালেরিয়ার কারণে আমার খারাপ ভাগ্য পেয়ে বসে। পরীক্ষা ভালো হয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ট্রেনিং শেষ করার পর আমি চট্টগ্রামে এসে এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর অব কাস্টমস হিসাবে যোগদান করলাম। সেখানে কয়েক বছর ছিলাম। এর মধ্যে ঢাকায় কিছুদিন কাজ করলাম। ১৯৭২ সালে এসে আমি ঢাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেকেন্ড সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করলাম। পাকিস্তান আমলে এর নাম ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ। স্বাধীনতার পর এর নাম হলো ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (এনবিআর)। এর নামকরণ করেছিলেন নুরুল ইসলাম সাহেব। তিনি তৎকালীন আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন। তিনি সেক্রেটারি অব কমার্স ছিলেন, টিসিবির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং দুই তিন মাস এনবিআর-এর দায়িত্বে ছিলেন।

এনবিআর হবার পর প্রথম যে দু'জন অফিসার যোগ দেয় তার মধ্যে আমি একজন। অন্যজন জনাব আহমদ আলী। তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি কালেক্টর হয়ে রিটায়ার্ড করেছিলেন। আর আমি হলাম ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউর প্রথম সেকেন্ড সেক্রেটারি। অর্থাৎ বলা যায় এনবিআর-এর সব প্রাথমিক কাজগুলো হয় আমার হাত দিয়ে। আমার পরে জয়েন করেন আমার এক বন্ধু মি. এস. এ. আকরাম, যিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের টিকিটে নারায়ণগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তিনি আমার ক্লাসমেটও ছিলেন।

আমর চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ছিলাম। প্রথমত, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত এর দ্বিতীয় সচিব হিসেবে ছিলাম। পরবর্তীতে প্রথম সচিব হলাম। এই সময়টাই ছিল বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনর্গঠনের সময়। সেই পুনর্গঠনের কাজে আমাকে অনেক দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সে সময় এনবিআর-এ খুব অভিজ্ঞ লোক ছিল না - যারা পাকিস্তান বোর্ড অব রেভিনিউ এ কাজ করেছে। কাজেই আমরা যখন নতুন করে এনবিআর-এর কাজ শুরু করি সে সময় যিনি প্রথমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন জনাব আবুল হোসেন, যিনি পরবর্তীতে এমপি হন এবং ২০০১ এর অক্টোবরের নির্বাচনের পর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি

www.pathagar.com

একটা সময় এনবিআর এর প্রথম সচিব ছিলেন। তারপর তিনি কাস্টমস হাউজ কালেক্টর হয়ে এনবিআর থেকে চলে গেলে আমি প্রথম সচিব হিসাবে এর দায়িত্ব গ্রহণ করি। দ্বিতীয় সচিব হিসেবে জনাব এস এম আকরাম ছিলেন যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি।

এই সময় আমাদের সম্পূর্ণ নতুন করে কাজ শুরু করতে হয়। পাকিস্তান আমল থেকে পাওয়া পুরানো ব্যবস্থাকে আমরা রিভিউ করি এবং নতুন করে সাজাই। তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। বিদেশ থেকে জাতিসংঘ টিমসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এনজিও এখানে কাজ করতে আসে। সব মিলিয়ে সে সময়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি আমাদের সামনে এসে যায়। যেমন রিলিফের মালামালের উপর আমরা কী রকম সুবিধা দেব? এর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে সেগুলো তাড়াতাড়ি ছাড়ানো যায়? আবার কোনটাকে আমরা রিলিফ হিসেবে গণ্য করব আর কোনটাকে রিলিফ হিসেবে গণ্য করব না? এরকম নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে আসে। এসব প্রশ্ন, জটিলতার সমাধান আমাদের করতে হয়। আমরা একটি এসআরও ইস্যু করি। এসআরও অর্থ আইনভিত্তিক রুলস এন্ড অর্ডার (Statutory Rules and Orders)। এর মাধ্যমে এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়।

সে সময় থেকে কূটনীতিকরা ব্যাপকভাবে এদেশে আসা শুরু করে। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস খোলা হয়। যদিও জাতিসংঘের ডকুমেন্টে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা কেমন হবে সে সম্পর্কে বলা আছে এবং সেই সাথে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল চুক্তিতে কূটনীতিকরা কি কি সুবিধা পাবে তাও বলা আছে। কিন্তু তাতে অনেক অস্পষ্টতা ছিল। কূটনীতিকদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তি আছে। কনভেনশন আছে। সেগুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না বলে সেগুলো সংগ্রহ করা, বোঝা, কার্যকর করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় এসআরও বা নোটিফিকেশন ইস্যু সে সময় করা হয়েছিল। সেসব কাজ যথেষ্ট জটিল ছিল।

তখন রিলিফের অনেক কাজ হতো আমাদের বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও অবকাঠামোকে গড়ে তোলার জন্য। রাস্তাঘাট, পোর্ট ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য। সে সময় হাজার হাজার রিলিফ কর্মী এদেশে আসে। তারা কূটনীতিক নয়। কিন্তু তারা কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবে? শুল্ক মুক্তভাবে কি পাবে? এই প্রশ্নগুলো আমাদের নির্ধারণ করতে হয়। আমরা এর জন্য অনেকগুলো এসআরও ইস্যু করি। নতুন একটি দেশের এনবিআরকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে আমদের এ সমস্ত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপার তো ছিলই। আমরা কি ট্যাক্স করব আর কি ট্যাক্স করব না? কত পরিমাণে ট্যাক্স করব? আমাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল। এসব কাজ

www.pathagar.com

প্রথমে দ্বিতীয় সচিব ও পরে প্রথম সচিব হিসাবে আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের করতে হয়েছিল। উর্ধতন পর্যায়ে বা উপরের দিকে সাধারণত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়। সে হিসেবে তারা আমাদের কাজের উপর সিদ্ধান্ত দিতেন।

আগেই বলেছি আমি আমার চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় এনবিআরে কাটাই। মাঝখানে কিছু গ্যাপ দিয়ে আবার এনবিআরে ফিরে আসি। এর মধ্যে বাহিরে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং ছিল। ১৯৮৫ সাল এনবিআরে ফিরলেও কয়েক মাস থাকার পর একই বছর আবার চলে যাই ডিজি এন্ট্রি করাপশন হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে। আবার ১৯৮৭ সালে এনবিআরে আসার পর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছিলাম। ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে ও পুনরায় ১৯৮৭ সালে যখন এনবিআরে ফিরে আসি তখন এতে সদস্য হিসেবে যোগ দেই। ১৯৯২ সালে এনবিআর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগ দেই। তারপর সচিব হিসাবে ব্যাংকিং বিভাগ ও সমাজকল্যাণ বিভাগে কাজ করার পর পরবর্তীতে আবার শেষবারের মতো ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিআরে ফিরে আসি। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আমি এনবিআর থেকে পদত্যাগ করে সরকার থেকে চলে আসি।

এটা হলো সংক্ষিপ্তভাবে এনবিআরের সাথে আমার যোগাযোগ। এ সময়গুলোতে আমি যেসব কাজ করেছি তা আলাদা করে উল্লেখ করব। এনবিআর এর বাইরে আমার চাকরি জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও আছে। তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ থাকবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সময়কাল

ফাইন্যান্স সার্ভিস থেকে এন্টি করাপশনের মহাপরিচালক হিসেবে আমার পোস্টিং হয় ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রায় দু'বছর আমি সেখানে ছিলাম। সেটাই ছিল কাস্টমস সার্ভিসের বাইরে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ইতোমধ্যে আমি সদস্য হয়েছি, এডিশনাল সেক্রেটারির পদবি ধারণ করছি। সেখানে যোগ দিয়ে যার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম তিনি হলেন প্রখ্যাত উপন্যাসিক, সাহিত্যিক আবুল খায়ের মোসলেহ উদ্দিন সাহেব। বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে তিনি মারা যান। তিনি অন্য খানে বদলী হয়ে চলে যান।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে কাজ করতে যেয়ে আমার বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। এখানে দুর্নীতির বিভিন্ন মামলা আসে। হাজার হাজার অভিযোগ আসে। সেসব আমাদেরকে তদন্ত করতে হয়। সেসব তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশকে যে ক্ষমতা দেয়া আছে ব্যুরো অব এন্টি করাপশনের অফিসাররা সেই একই ক্ষমতা ভোগ করে। Criminal Procedure code বা সংক্ষেপে CRPC (সিআরপিসির) মাধমে পুলিশ

www.pathagar.com

অফিসাররা বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। সিআরপিসি বা দণ্ডবিধি আইনের আওতায় পুলিশ বিভাগ যেমন সকল মামলা তদন্ত করে ব্যুরোও সেভাবেই সেগুলো তদন্ত করে।

আমি যখন দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে যোগদান করি তখন এর নিজস্ব লোকবল খুব কমই ছিল। বেশিরভাগ অফিসারই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে এখানে আসত। এর হেড অফিস ছিল ঢাকায়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে এন্টি করাপশন অফিসার ছিলেন। সেই সাথে বিভাগীয় দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তা। এখানে এসব বর্ণনার চেয়ে এর অভিজ্ঞতাই আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি লক্ষ্য করি এখানে অনেক বেনামী অভিযোগ আসে। লোকেরা সাধারণত স্ব-নামে অভিযোগ দিতে সাহস করত না। আমাদের একটা সুন্দর ও সঠিক নির্দেশনা ছিল কোনো বেনামী অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে না যদি না সেটা সুনির্দিষ্ট না হয়। যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হয় তাহলে তা বেনামী হলেও তদন্ত করতে হবে। এটা সঠিক ছিল এই জন্যে যে স্ব-নামে অভিযোগ করলে আমাদের দেশে সাধারণত নানা ভয় ভীতি থাকে। আবার নামে অভিযোগ করা নানা কারণে সম্ভবও নয়। এটাও ঠিক যে তা যদি সুনির্দিষ্ট না হয় তাহলে তা করাও ঠিক না। কিন্তু নাম দিয়ে বিষয় দিয়ে কখন, কোথায়, কিভাবে, কি কি হয়েছে, কারা কারা করেছে এরকম যে অভিযোগ তাকে তো আর অবহেলা করা যায় না। এটা ঠিক, কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে আমি দেখেছি অভিযোগ আসত অনেক। এর বেশির ভাগই অনির্দিষ্ট ও শত্রুতামূলক। তিলকে তাল বানানো হতো। একেক জনের বিরুদ্ধে বিশ ত্রিশটি পর্যন্ত অভিযোগ করা হতো। আবার একই অভিযোগ পত্র কখনো কখনো অসংখ্য জায়গায় পাঠানো হতো।

আমাদের সমাজে দুর্নীতি বেশি। একদিকে অনিয়ম বেশি, আরেকদিকে মানুষের মন মানসিকতা হচ্ছে শত্রুতা পরায়ন এবং অন্যের পিছনে লেগে থাকার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে খুব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে অভিযোগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের কাছে খুব ছোট বিষয় নিয়েও অভিযোগ করা হয়। এটা ছিল একটা দিক। দ্বিতীয় যে দিকটি আমি লক্ষ্য করলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল দুর্নীতি দমন ব্যুরো খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত একটা বিভাগ। তারা নিজেরাই বড় বড় করাপশন করছে বলে আমি লক্ষ্য করতাম এবং একই সঙ্গে ভীষণ অবাক হতাম। এর ফলে আমি আমার অফিসারদের এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, নিজেদের হাতই যখন এতো কালো বলে মনে হয় তাহলে আমরা কেন এতো ছোটখাট জিনিস ধরছি। বড় জিনিসগুলোই ধরা আমাদের কর্তব্য, দেখা আমাদের কর্তব্য। তবুও তারা চাইতেন সকল ক্ষুদ্র বিষয় যেন আমরা তদন্ত করি। আর সেটা করার জন্য অনেক সময় কেস করা হতো, চাপ দেয়া হতো। কিন্তু দু'টি কারণে আমি এর পক্ষপাতি

www.pathagar.com

ছিলাম না। একটি কারণ ছিল, আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা যদি অতি ছোটখাট বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি তাহলে বড় কিছুই করতে পারব না। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমি নিজে নিশ্চিত ছিলাম - এ বিভাগ নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। এদের কোনোই অধিকার নেই অন্য মানুষের কোনো ক্ষুদ্র ছিদ্রান্বেষণ করার।

ডিজি এন্টি করাপশন হিসাবে আমি কয়েক মাস পার করলাম। আস্তে আস্তে এর কাজ রপ্ত করলাম, বুঝতে থাকলাম। এ সময়ের মধ্যে এর আইনগুলো পড়ে নিলাম। তখন সিআরপিসি, পেনাল কোড, এভিডেন্স এ্যাক্ট, এন্টি করাপশন ম্যানুয়েল পড়ে ফেললাম। বিভিন্ন বিষয়, তাদের পদ্ধতিসমূহ বুঝে নিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম এখানে পুলিশের মতো ডেকে এনে অফিসের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এন্টি করাপশনকে, পুলিশকে সাংঘাতিক ভয় পায়। কাজেই আমি এটাকে খুবই অন্যায় মনে করতাম। সিআরপিসি'র ১৬১ ধারায় জবানবন্দী পুলিশকে তাদের কাছে গিয়ে নেয়া উচিত। ডেকে আনা মানে হলো তাকে তার অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেটাকে আমি সঠিক মনে করতাম না। এটা একটি ট্রাডিশনাল প্রসিডিউর ছিল এবং আমি একা তার বিরোধিতা করে কুলাতে পারতাম না। তবে ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। সিআরপিসি সম্পর্কে গভীরভাবে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

যদিও আমি জানি আমাদের দেশের বেশির ভাগ ট্রাডিশিয়াল পুলিশ অফিসাররা যে কোনো কারণেই হোক বৃটিশ আইনের বড় ভক্ত - এর কারণ আমার মাথায় একদমই ঢোকে না। তারা মনে করে প্যানাল কোর্ট ঠিক আছে। সিআরপিসি, সিপিসি, এভিডেন্স এ্যাক্ট সব ঠিক আছে। তারা হয়ত ভাবে যে কোনো প্রকার সংশোধনই এই জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে। আমি কেন জানি মনে করি এটা আমরা বুঝতে ভুল করছি যে বৃটিশ শাসনের সময় যেগুলো তৈরি করা হয়েছিল তারা তাদের স্বার্থেই সেগুলো তৈরি করেছিল। একটা পরাধীন জাতিকে দমন করার জন্য নিপীড়নের জন্য তারা তা করেছিল। কিন্তু আমরা মানসিকভাবে এম.ন অধীন হয়ে গেছি যে এ কথাগুলো উপলব্ধি করি না। এসব আবার নতুন করে তৈরি করার দরকার। সংস্কার করার দরকার - সেটা আমরা করিনি। আমরা শুধু ছোটখাট সংশোধন করি যেটাতে পুরো কাজও হয় না। আমাদের এ মানসিকতা একদমই সঠিক নয়। আমি আমাদের বেশির ভাগ আইনজীবিদের এটা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে দেখিনি যে মানুষের বড় বড় সমস্যা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। তাদেরকে বর্তমান অবস্থাতে অর্থাৎ যেটা বৃটিশ থেকে পাওয়া তারই সমর্থক বলে লক্ষ্য করেছি।

যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যেই জিনিসটা বুঝে গেলাম। আমার সময় ব্যয় হতো

www.pathagar.com

প্রধানত লোকদের দুর্নীতি দমন করতে বা দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যে এমন নয়। আমাকে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে হয়েছিল আমার কিছু অফিসারের নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে। শত শত লোক স্ব-শরীরে আমার কাছে হাজিরা দিত কিংবা চিঠি দিত যার মাধ্যমে আমি জানতে পারতাম কিভাবে তাদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে বা কিভাবে নির্যাতিত হবার ভয় তারা করছে। এর জন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এই নিপীড়ন থেকে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। আমিও যে পুরোপুরি সে কাজ করতে পেরেছি বা সক্ষম হয়েছি তাও নয়। কিন্তু তারপরও বলব, শত বিরোধীতা এখানে থাকলেও যখনই বুঝেছি যে যেখানে যেখানে বাড়াবাড়ি আছে, আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে, অন্যায় আছে, অপরদিকে লোকগুলো নিরীহ - তখনই সেগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি। নিরীহদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করেছি।

এমনও হয়েছে, দেখা গেছে কোনো ঘটনার মামলায় পাঁচশ জনকে আসামী করা হয়েছে, সেখানে খুব বেশি হলে পাঁচজনকে আসামী করা যায়। কিংবা যেখানে মাত্র পাঁচ সাতজনকেই আসামী করা যায় সেখানে আসামী করা হয়েছে শতাধিক ব্যক্তিকে। এর জন্য সেসব ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত দোষী নয় তাদের নাম কাটাতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং এগুলো করতে গিয়ে এর বিরোধীতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাকে নোটের পর নোটে যুক্তি দিতে হতো কেন আমি এদের নাম কেটে দিচ্ছি। না হলে উল্টা আমার উপরই এই অভিযোগ হতে পারে যে পরবর্তীতে দুর্নীতি করে আমিই এদের ছাড়িয়ে দিয়েছি। কাজেই সেখানে সব সময় কঠিন বাস্তবতা কাজ করত। তবুও এ কাজটি আমি করেছিলাম।

এন্টি করাপশনে থাকাকালে একজন অফিসারের সাথে আমার সংকট দেখা দেয়। এরকম সংকট এই বিভাগের অন্যান্যদের পরস্পরের মধ্যে অনেক ছিল। তিনি আগে যেখানেই চাকরি করেছেন, যাদের সঙ্গেই তার মতবিরোধ হয়েছে, তিনি দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে এসেই তাদেরকে ঘায়েল করার চেষ্টা শুরু করলেন। তাদের বিরুদ্ধে একটা করে মামলা খাড়া করার চেষ্টা করলেন। এরকম প্রায় বিশ ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করে ফেললেন। যাদের বিরুদ্ধে তিনি এরকম মামলা করেছেন তারাই এসে আমাকে জানালো যে শুধুমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি এ রকম মামলা করছেন। অভিযুক্তদের বক্তব্য শুনেও আমি নিজেই বুঝতে পারলাম যে এ সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু সে ব্যক্তি যেহেতু আইনের মাধ্যমে আগাতেন তাই তার নোটকে খণ্ডন না করে কিছু করারও ছিল না। এগুলোকে আমার বিবেচনায় নিতে হয়েছে। ফলে খুব সাবধানে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যতটুকু পেরেছি আইনের মাধ্যমে

www.pathagar.com

রক্ষার করার চেষ্টা করেছি। অনেককেই আমি এর ফলে রক্ষা করতে পেরেছি এবং অনেককেই এমন অবস্থা করে দিয়েছি যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আর কিছু করে উঠতে পারেনি।

সে অফিসারের স্বভাব ছিল সব ধরনের কূটনীতি প্রয়োগ করে লোকদেরকে হেনস্তা করা। এটা একেবারেই ব্যক্তিগতভাবে করা হতো। এমনকি দুঃখজনক হলেও সত্য তার সঙ্গে পাশের বাসার যদি ঝগড়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেও তিনি মামলা করে দিয়েছেন। যারা তার অধীনে কাজ করছেন তাদের কথা মানেনি বা শোনেনি। তিনি তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করে দিয়েছেন। তিনি তার বসদের বিরুদ্ধেও মামলা দিয়েছেন। এই ধরনের পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে বোঝা যায়, সরকারের ভিতরে এ ধরনের কিছু লোক আছে তাঁরা সত্যিকার অর্থেই নিরপেক্ষ নন। এটা আমার জীবনের অন্যতম একটা দুঃখজনক ঘটনা। এটা যেমন আমার দুর্ভাগ্য তেমনি এই অর্থে সৌভাগ্য যে আমি মানুষ চিনতে পেরেছিলাম। এতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এক অর্থে প্রশিক্ষণও।

এখানে থাকা অবস্থায় আরো দু'একটি অভিজ্ঞতা বলার মতো আছে। পরবর্তীকালে আরেক জন ব্যক্তি যিনি প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি ঐ সময় এক করপোরেশনের সিনিয়র অফিসার ছিলেন। তার এবং তার পরিবারের সাথে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে আমি তদন্ত শুরু করলাম। তখন রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আমার কাছে টেলিফোন আসল কেন আমি তা তদন্ত করছি। আমি তাকে কারণগুলো বললাম। তিনি আমাকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে তার সাথে পরের দিন দেখা করতে বললেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। তিনি খুব বেশি ইন্টারফেয়ার করেননি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এটা নিয়ে আর বেশি অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। আর যদি অগ্রসর হই তাহলে অন্য কোনো কাজই করতে পারব না। একটা কাজ করতে গিয়ে অন্য পঞ্চাশটি কাজ নষ্ট করব। ফলে সেসব দিক বিবেচনা করে আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

সেসব ঘটনা কতটুকু সত্য ছিল তা বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা তা নিয়ে তদন্তের জন্য খুব বেশি দূর আগাইনি। এটা স্বীকার করি যে, আমি যে কয়টি বিষয় নিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি তার মধ্যে এটা একটা। কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যেমন, তার মতো একজন একটি করপোরেশনের অফিসার রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করতে পারে, সেটা ভাবতে অবাকই লাগে, যার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি শুধু টেলিফোনই করেন না ডেকে নেন এবং কাগজ দেখতে চান।

www.pathagar.com

ডেপুটি গভর্নর : বাংলাদেশ ব্যাংক

আমার চাকরি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর এবং ব্যাংকিং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯২ সালে আমি হজ্জে যাই। হজ্জ থেকে ফেরার পথে জেদ্দা এয়ারপোর্টে আমি জানতে পারলাম আমার পোস্টিং হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর হিসেবে। এই খবরে বলা যায় আমি খুব ক্ষেপে যাই। কারণ কথা ছিল তখন আমাকে সচিব করা হবে। কিন্তু সচিব না করে করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। তাই তখন মনে মনে নিয়ত করেছিলাম জয়েন করব না।

জেদ্দা থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌছা মাত্রই কাস্টমস বিভাগের এক সিনিয়র অফিসার জানালেন আমি যেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করি। কেননা তৎকালীন গভর্নর জনাব সেগুপ্তা বখশ চৌধুরী তাকে আমার ব্যাপারে বলেছেন আমি যেন হজ্জ থেকে ফিরে এসেই তার সাথে দেখা করি। তার সাথে আলাপ না করে আমি যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেই। তবে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমিই শুধু জানতাম। এটা কাউকে প্রকাশ করিনি। আমি ক্ষেপে গেছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে জয়েন করব না একথা কাউকে বলিনি। ফেরার পরের দিনই আমি সেগুপ্তা বখশ চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এর একটি কারণও ছিল যে তিনি আমাব একজন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, সৎ অফিসার ছিলেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার অধীনে আমি বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছি। তার সঙ্গে আমার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তিনি আমাকে বোঝান যে কেন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে জয়েন করলে আমার ভালো হবে। আমি তার কথা মেনে নিয়ে দুইদিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগ দেই। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে আরো দু'জন ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। নিয়ম ছিল দু'জন ডেপুটি গভর্নর হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতর থেকে আর একজন ডেপুটি গভর্নর সরকার পাঠাবে। আমি সরকার মনোনীত ডেপুটি গভর্নর ছিলাম। নিয়ম আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরের একজন সদস্য নিযুক্ত হয় ডেপুটি গভর্নর থেকে। সরকার আমাকে বোর্ডেরও প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দু'টি বিভাগ আমার দায়িত্বে পড়ে। ব্যাংকিং রেগুলেশন অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এটা তার মধ্যে একটি। সেন্ট্রাল ব্যাংকের দু'টি দায়িত্বের মধ্যে ব্যাংকিং রেগুলেশন একটি এবং অন্যটি হচ্ছে মনিটরি পলিসি অপারেশন। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকাকালীন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু

www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেসব কারণে এক পর্যায়ে আমাকে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বও আমাকে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বলা যায় শেষ দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রায় অর্ধেকের উপর কাজ আমার উপর অর্পিত হয়েছিল। আমার উপর আরেকটি বড় দায়িত্ব আসে। তখন 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রাম' নামে একটি প্রোগ্রাম ছিল। এটাকে সংক্ষেপে এফএসআরপি (FSRP) বলা হয়। সেটা সরকারের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চুক্তির আওতায় চলছিল। এক পর্যায়ে আমাকে তার প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের দায়িত্ব নিতে হয়। সব মিলিয়ে আমি ব্যাপক দায়িত্ব পাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা অবস্থায় আমি যেসব কাজ করতে পেরেছিলাম তার ফল আমি মনে করি, দেশের জন্য অনেক ভালো হয়েছে। একটি কাজ আমি ইসলামী ব্যাংকের জন্য করি। এর জন্য ব্যাংকিং আইন সংস্কার করি যাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য যেসব প্রতিবন্ধক ছিল সে আইনে তা দূর হয়ে যায়। যেমন আইনে ছিল কোনো ব্যাংক কোনো ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু আমরা সেখানে একটি শর্ত যোগ করি যে, ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তারা ব্যবসা করতে পারবে। তেমনিভাবে অন্যান্য ধারার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে দেই। ঐ সময়ই আমরা আরো দ'টি ইসলামী ব্যাংকের জন্য অনুমতি দেই। এর জন্যও আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করি যাতে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক খোলার জন্য লাইসেন্স পেতে পারে। সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক সে সময় লাইসেন্স পায়।

ব্যাংকিং সেক্টরের সার্বিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনগত যেসব বিষয় ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঋণ শ্রেণীকরণ। ঋণ শ্রেণীকরণ যদি খুব ঢিলেঢালা হয় তাহলে ব্যাংকিংয়ের রোগ ভালো করে ধরা পড়ে না। কিন্তু এটা টাইট হলে ব্যাংকিংয়ের ঋণের ক্ষেত্রে রোগগুলো ধরা পড়ে। সে জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চাপ ছিল যাতে ঋণের শ্রেণীকরণের তৎকালীন পদ্ধতিকে আমরা যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাই। এ ব্যাপারে ব্যাংকিং সেক্টরের লোকদের নানারকম দ্বিধা ছিল বাঁধা ছিল। কেননা এরকম একটি শক্ত ঋণ শ্রেণীকরণ নীতি আমাদের করা উচিত কি না, আমরা পারব কি না তাতে সন্দেহ ছিল। নানা কথা ছিল। নানা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি নিজে সার্বিক বিবেচনায় দেখলাম যে একে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো হবে। তবে ৩/৪ বছরের সময় নিয়ে একাজ করতে হবে। আমরা অবশেষে সেই দুর্বল ঢিলেঢালা শ্রেণীকরণ পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক নীতিই গ্রহণ করি এবং এই সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা ক্রমান্বয়ে এটাকে শক্ত করব। এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায় চার বছরের সময় নির্ধারণ করি। আমি ৯৫ এর শেষে ব্যাংক থেকে চলে আসি

www.pathagar.com

এবং ৯৬-৯৭ এটা পুরোপুরি কার্যকর হয়। বর্তমান সময় এসে দেখা গেছে তা এখনও বলবৎ আছে। এতে ব্যাংকের স্বাস্থ্য প্রকৃতপক্ষে কত খারাপ তা আগের পদ্ধতিতে বর্তমানের মতো এতো ভালো করে বোঝা যেত না। এখন সহজেই তা বোঝা যায়। এখন যদি শ্রেণীকরণ ঋণের পরিমাণ ১০% এর কথা বলা হয় এর মানে দাঁড়ায় এটা টাইট হওয়ার কারণে ১০%। অথচ আগের হিসাবে এটা হতো ২%। অর্থাৎ আগে খারাপের পরিমাণ ও প্রকৃতি বোঝা মুশকিল ছিল। আগে বিভিন্ন ব্যাংকের যে ৩৫%, ৩৬% ঋণ ছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি ছিল যা আজকের হিসেবে ৭০%, ৭৫%। আজকে যদি আমরা বলি এটা ২০% বা ২৫% এ নেমে এসেছে তাহলে বলতে হবে তা আগের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থা। সুতরাং বলা যায়, ব্যাপকভাবে ঋণের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কাজগুলো সবই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রামের আওতায়।

আগে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর ক্যাপিটাল রাখা হতো দায় (liability) ভিত্তিক। অর্থাৎ এত টাকা ডিপোজিট হলে এত পারসেন্ট রাখতে হবে। কিন্তু আমরা এটাকে আন্তর্জাতিক নিয়মে নিয়ে গেলাম। আমরা তাতে এসেট ভিত্তিক অর্থাৎ ঋণ ভিত্তিক, ঋণের ঝুঁকি দেখে কোনটা কি রকম সেই ভিত্তিতে করি। এটাকে বলা হয় রিস্ক ওয়েটেড ক্যাপিটাল এডিকুয়েসি অর্থাৎ রিস্কের মান পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তার ভিত্তিতে ক্যাপিটাল বা পুঁজি রক্ষা করা। এটাও আমাদের ব্যাংকিং এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল। এই সময় আমরা ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো করি। ব্যাংক ঋণ দিত অথচ তারা জানত না তাদের পার্টির সার্বিক স্বাস্থ্য কেমন। সে কোন ব্যাংক থেকে কত ঋণ নিয়েছিল। তখন সিস্টেম ছিল একটি ব্যাংক অন্য দশটি ব্যাংকের কাছে লিখত, পার্টি সম্পর্কে জানতে চাইত। এতে সময় লাগত, কেউ উত্তর দিত কেউ দিত না। এরকম পরিস্থিতির ফলে তারা ভালো করে জানতে পারত না, এতে অনেক সময় ব্যাংকগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নিত।

সিদ্ধান্ত হলো ক্রেডিটের জন্য একটি ইনফরমেশন ব্যুরো হবে। সেখানে সকল পার্টি কি কি ঋণ নিয়েছে সেই তথ্য দেবে। তা কম্পিউটারে রক্ষিত হবে। এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে রক্ষিত হওয়ার কারণে যে কোনো ব্যাংক চাইলে তাকে সেন্ট্রাল ব্যাংক তথ্য সরবারহ করবে। আমাদের সময় সিদ্ধান্ত ছিল আমরা এক বা দুই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেব। আমি এটা গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে করি। কিন্তু বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী অভিযোগের সম্মুখীন হলেন। পলিটিক্যাল লেবেলে তারা অনেক সময় ঘাবড়ে যান কিন্তু এটা আমি তাদেরকে বোঝাই। বিভিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গভর্নর সাহেবও তখন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টায় এটা টিকে গেল। আর এটা যে দেশের জন্য ব্যাংকের

www.pathagar.com

জন্য কত ভালো হয়েছে তা আজকের ব্যাংকাররা উপলব্ধি করছেন। তখন আমি ঘাবড়ে গেলে হয়ত বিষয়টি অন্য রকম হলেও হতে পারত।

বর্তমানে বিআইবিএম ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্টের উপর যে মাস্টার্স ডিগ্রি দিচ্ছে সেটাও আমার সময় একটা প্রস্তাব ছিল যে এমবিএ ডিগ্রির বাইরে ব্যাংকিং এর উপর একটা কোর্স ওপেন করা উচিত। সে প্রস্তাব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ছিল। সেটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং কার্যকর করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভিতরে বাইরে এর খুব বিরোধীতা ছিল। এক পর্যায়ে আমি যখন ব্যাংকিং সেক্রেটারি হই তখন এটা অনুমোদন করি। সুখের কথা যে সেটাও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে।

এ সময় আমরা আরেকটি বড় কাজ করি যেটা সব সময়ই করা উচিত ছিল, সেটা হলো রিস্ক এনালাইসিস। এটাকে লেন্ডিং রিস্ক এনালাইসিস বা ক্রেডিট রিস্ক এনালাইসিস দুই ভাবেই বলা হয়। ক্রেডিট যে দেয়া হচ্ছে তার রিস্ক ফেক্টর কতটুকু তা এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এফএসআরপির যে দশ বারো জন বিদেশী আমার সাথে কাজ করছিল তারা তার একটা ফরমেট তৈরি করে। সেটা প্রথমে আমরা ন্যাশনালাইজড ব্যাংকগুলোতে কার্যকর করি। যদিও এটা এফএসআরপির প্রোজেক্টে ছিল না তা সত্ত্বেও আমি নিজে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংকগুলোকে লিখি এবং এটাকে কার্যকর করতে বলি। এর ফলে একটি সিস্টেমেটিক ফরমুলা করে বাধ্য করে দেয়া হলো। এটা ব্যাংকগুলো করতে বাধ্য। এর ফলে বেড লোন বা কু-ঋণ নিয়ন্ত্রণে একটি নতুন হাতিয়ার বা নতুন অস্ত্র পাওয়া গেল।

এরকম কাজ ছাড়াও আরো ছোট বড় অনেক ধরনের কাজ করি। তবে প্রশাসনের যখন দায়িত্ব পেলাম সেটা আমার জন্য খুবই দুঃখজনক ছিল। সেখানে সাধারণ ইস্যুগুলো তো আছেই। সবগুলো কাজ আমি সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছি। তবে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হলো অফিসার সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে। আমার বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মৃতির কথা যখন মনে হয় তখন আমার বেদনার দিকগুলো ভেসে ওঠে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্কিত দিকটি। তাদের অসম্ভব চাপ এবং অন্যায় চাপ সব সময় লক্ষ্য করেছি। তারা দৈনিক এসে দেখা করতে চাইতো। ট্রেড ইউনিয়নের লোকজন নিজেরা কোনো কাজ করবে না। সারাদিন ঘুরে বেড়াবে। তাদেরকে টেবিলের কোনো দায়িত্ব দেয়া যাবে না। তাদেরকে বদল করা যাবে না। উপরন্তু তারা বিভিন্ন জনের পক্ষে বিভিন্ন রকমের বদলির জন্য চাপ দেবে। তাদের দৃষ্টিতে যে লোক ভালো সেই কেবল ভালো, যে মন্দ সে মন্দ। তাদের সেই দৈনিক চাপের সামনে এখন কি করতে পারতাম জানি না তবে তখন সব সময় ডিপ্লোমেসি করতাম। কিছুটা কাজ করে দিতাম। কিছুটা

www.pathagar.com

বোঝাবার ব্যবস্থা করতাম। সার্বিক বিবেচনায় আমি এভাবেই চলেছি। সব মিলে এটা আমার জীবনে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক দিক।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট অত্যন্ত সঠিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট বিশ্বব্যাপীই অবনতিশীল হয়ে যাচ্ছে। তবে হতে পারে আমাদের দেশে একটু বেশি। সবখানেই এর একটা পতন ঘটেছে। এর মধ্যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড এবং কোনো নৈতিক মান দেখি না। অন্তত বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা আমার তাই বলে। এ ব্যাপারে কি করা যায় তা দেশের রাজনৈতিক দল, শ্রমিক দলগুলোকেই চিন্তা করা উচিত। অফিসারদের দেখেছি তারা শুধু পোস্ট বাড়াতে চায়, প্রোমোশন চায়। উপরের দিকে পোস্ট সৃষ্টি করতে বলে। কিন্তু ব্যুরোক্রেসি বড় হচ্ছে কিনা, ব্যাংকের খরচ বাড়ছে কিনা বা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হচ্ছে কিনা সেসব দিকে কোনো খেয়াল তাদের নেই। এই ধরনের পরিস্থিতি আমার সামনে ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকে জয়েন করার কয়েক মাস পরেই গভর্নর হয়ে আসেন খোরশেদ আলম সাহেব। তার সাথে আমার খুবই সুসম্পর্ক ছিল। তবে তার সঙ্গে শুরুটা আমার ভালো হয়নি। তিনি যখন জয়েন করলেন আমরা তাকে রিসিভ করলাম। আমার মনে হয় কেউ না কেউ তাকে আমার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা দেয়ায় শুরুতেই তিনি আমার উপর কেন যেন সন্দেহের দৃষ্টি রাখতেন। অথচ আমি যখন রাজস্ব বোর্ডে ছিলাম তখন তিনি আমার কামরায় এসেছেন। আমি উনাকে সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতা করেছি। তিনি যখন বাণিজ্য সচিব হন তখন আমি তার কাছে গিয়েছি। তিনি আমার সাথে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঠিক সেন্ট্রাল ব্যাংকে আসার আগে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মিস ব্রিফিং এর কারণে আমার প্রতি তার সন্দেহ ছিল বলে মনে হয়েছে। কেউ হয়ত তাকে আমার সম্পর্কে মিস ব্রিফিং করে থাকবে। তবে তার এই ভুল বোঝা শেষ পর্যন্ত আর থাকেনি। আমি আমার ব্যবহার, কাজ দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ করি যে আমি একজন লয়াল অফিসার। আমি কোনো বসের জন্য কোনো সমস্যা নই। পরে তিনি নিজেই সকল দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দেন। পরবর্তীতে আমি যখন ব্যাংকিং সেক্রেটারি হই তিনি তখনও গভর্নর। তখন আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। যদিও আমার সময়ই উনাকে মেয়াদের আগেই গভর্নর পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে সেটা ছিল অর্থমন্ত্রী এবং তাদের মধ্যেকার ব্যাপার। আমাকে সেখানে শুধু একটা দায়িত্বের অংশ হিসেবে কিছু কাজ করতে হয়েছিল মাত্র।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

আমার চাকরি জীবনের একটি বড় ঘটনা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করার সঙ্গে জড়িত হওয়া। সেই সাথে এটাকে এদেশে পুরোপুরি কার্যকর করা বা প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কর ব্যবস্থা যে গতানুগতিক হয়ে গেছে তা আমরা গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। সেই ট্যাক্স ব্যবস্থা, বেশ পুরোনো। তাতে আধুনিকতার ছাপ লাগেনি। বিশ্বে কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের কর ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটেনি। সেসব কারণেই কর ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হচ্ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের একটি টীম একটি স্টাডি করে। তার রিপোর্ট তারা ১৯৮৬-৮৭ সালে উপস্থাপন করে। সে রিপোর্টের সবচেয়ে বড় সুপারিশ ছিল এক্সসাইজ ডিউটি ও সেলস ট্যাক্স যেটা ছিল তার পরিবর্তে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স (Value Added Tax Vat) বা মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা। তাদের সাজেশন ছিল, এই করকে প্রথম পর্যায়ে ম্যানুফেকচারিং লেবেল পর্যন্ত করা। অর্থাৎ ইমপোর্টের উপর ভ্যাট হবে এবং ম্যানুফেকচারিং এর উপর ভ্যাট হবে। এটাকে পরবর্তী কোনো এক সময় রিটেইল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন এনবিআর এর মেম্বার, কাস্টমস ছিলাম। কিন্তু সে সময় অন্য কতগুলো কারণে আমি বদলি হয়ে যাই বোর্ডের এক্সসাইজ সাইডে। আমার বদলির পিছনে কারণ ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের কানে আমার ব্যাপারে তার এক নিকট আত্মীয় নানা কথা তোলে। যতটুকু আমি জানি এবং বুঝতে পারি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনটি হয়। পরিবর্তনটি আমারই বন্ধু এস এম আকরাম আর আমার মাঝে হয়। আমি তার জায়গায় যাই এবং সে আমার জায়গায় আসে। আমি আগেই বলেছি আকরাম সাহেব আমার ক্লাসমেট এবং নিকটতম বন্ধু। তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। এর ফল হলো আমি এক্সসাইজ সাইডের দায়িত্ব পেলাম এবং এই পরিবর্তনের কারণেই মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর মতো ঐতিহাসিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। দেখা গেল আমার বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালের সেই ঘটনা আমার জন্য ভালোই হলো।

যাই হোক, আমি এর ফলে এ বিষয়ে স্টাডি করলাম। কিন্তু সত্যিই স্টাডি করার পরও কিছুই বুঝতে পারলাম না। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই হলো না। তখন আমাদের একটা টিম করা হলো, এতে আমরা ভ্যাট সম্পর্কে জানতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দেখে আসব। সেই মোতাবেক তখনকার এনবিআরের চেয়ারম্যান, ড. একরাম হোসেন, এনবিআরের প্রথম সচিব জাহিদ হোসেন, আইএমএফএর একজন প্রতিনিধি, আমি এবং প্রাইভেট সেক্টরের চারজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিকে বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বন্ধু মরহুম এম এ কামাল। এ সফরে প্রথমে আমরা ভারতে যাই। ভারতে একটা মোডিফাইড ভ্যাট ব্যবস্থা আছে। তবে সেটা মূলত ভ্যাট নয়। বুঝলাম সেটা এক্সসাইজ ডিউটির সামান্য অদলবদল। সেখান থেকে যাই ফিলিপাইনে। সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্যাট কার্যকর করা হয়েছে একদম খুচরা পর্যায়

www.pathagar.com

পর্যন্ত। তাদের ভালোমন্দ দেখলাম। সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া গেলাম। ইন্দোনেশিয়াতে হোলসেল পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাট সিস্টেম করা হয়েছে। সেখানে তাদের মন্ত্রী মারী মোহাম্মদের সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, আপনারা আর যাই করেন হোলসেল পর্যায় পর্যন্ত যাবেন না। হয় খুচরা পর্যায় পর্যন্ত যাবেন না হয় ম্যানুফেকচারিং পর্যায় পর্যন্ত থাকবেন। এটা একটা মূল্যবান পরামর্শ ছিল। কেননা কোনটা হোলসেল আর কোনটা খুচরা সেল তা পার্থক্য করা খুব কঠিন হয়। এরপর ইন্দোনেশিয়া থেকে আমরা থাইল্যান্ড যাই। থাইল্যান্ড তখন ভ্যাট এর জন্য তৈরি হচ্ছে। ভ্যাট তখনও কার্যকর করেনি। সেখান থেকে ভ্যাট নিয়ে তাদের প্রস্তুতি দেখে দেশে ফিরে আসলাম।

এই সফরে আমার মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আমি আরেকটি বিষয় ভালো করে খেয়াল করি সেটা হলো, বিভিন্ন দেশের টিভি প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে আমি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। ভারতে হিন্দু ধর্মের যে উত্থান হচ্ছিল তাতে দেখলাম সে উত্থান প্রধানত নেগেটিভ দিকে চলে গেছে। সেখানে মূর্তিপূজার ব্যাপকতা লক্ষ্য করলাম একটা সভ্য জাতির মধ্যে। আরেকটা বিষয় দেখলাম এন্টি-মুসলিম সেন্টিমেন্ট। অথচ হিন্দু ধর্মের কোনো পজেটিভ বিষয়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে তা আমি পেলাম না। এ দু'টি জিনিস আমাকে ব্যথিত করল। যদি আমি ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে হিন্দু জাতির উত্থান লক্ষ্য করতাম তাহলে আমি খুশি হতাম। মানবতার জন্য যে কোনো অধার্মিকতার চেয়ে ধার্মিকতা ভালো। ফিলিপাইন প্রধানত একটি ক্যাথলিক দেশ। তাদের টিভিতে খৃস্টধর্মের মৌল আলোচনা খুব কম দেখলাম। তাদের ওখানে ঈসা (আ) এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি বিশ্বাস কর তাহলে সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে, মুক্তি পাবে- এই একটা কথাই বারবার বলা হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা, খৃস্টধর্মের শিক্ষায় আলোচনা বাদ দিয়ে সেখানে জিসাস কেন্দ্রিক আলোচনাই বেশি। এতে আমি বেশ হতাশ হলাম এই জন্য যে, আমি ভাবছিলাম খৃস্টধর্মের ভিত্তিতে মানবসমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব কি না? তখন আমার মনে এই সন্দেহ জাগে যে, এটাই যদি পদ্ধতি হয় তাহলে তা অসম্ভব।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম অবস্থাও আমাকে হতাশ করল। সেখানকার রাস্তাঘাটে, হোটেলে অনেক মূর্তি দেখলাম। এটা আমার কাছে অবাকই লাগল। সেখানকার লোকেরা ভালোই আরবি জানে। হোটেলের বয় বেয়ারাও আরবি জানে। শপিং সেন্টারগুলোতে দেখলাম ফ্লোরে ফ্লোরেই নামাজের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ে উভয়ে সেখানে নামাজ পড়ে। এমনকি যোহরের সময় মসজিদেও দেখলাম অর্ধেক মেয়ে। এটা আমার কাছে অবাকই লাগল। আজ থেকে তা অনেক আগের কথা। তাতে সেখানে ইসলামের একটি পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়। তার আগে ইসলামের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য

www.pathagar.com

সুহার্তের আমলে বহুদিন পর্যন্ত নির্যাতন চলেছে। সেখানে মুসলিম শক্তি নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। তারপরও আমার মনে হয় নানা কারণে গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিকে ইসলামী শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। তারই ফলাফল স্বরূপ দেখা যায় গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে, যেটা সে দেশের প্রথম অবাধ নির্বাচন, তাতে তিনটি ইসলামিক দল চলে এসেছে এবং তাদের সংখ্যা পার্লামেন্টে প্রায় অর্ধেক।

থাইল্যান্ডে বৌদ্ধ পূজা এবং রাজার প্রশংসা দেখা যায় খুব। রাজার প্রশংসা বলতে রাজাকেন্দ্রিক রাজাপূজাই বলা যায়। আর বৌদ্ধ পূজা তো বৌদ্ধমূর্তি কেন্দ্রিক। যেই বুদ্ধ চেয়েছিলেন মূর্তিপূজা দূর করতে সেই বুদ্ধই হয়ে গেছেন মূর্তি এবং তারই পূজা হয়ে গেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দিক। এসব ছিল দীর্ঘ সফরে সেই সব সমাজকে বোঝার একটা দিক। সেসব দেশে আমি প্রায়ই সর্বত্রই পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলাম। বোঝাই যায় সবখানেই ব্যাপক পাশ্চাত্যকরণ হয়েছে। এরই মধ্যে মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যকরণকে প্রতিহত করেছে বলে মনে হলো।

সফর শেষ করে দেশে এসে আমরা একটি রিপোর্ট তৈরি করি। তাতে মূল বিষয়ে আমরা কিভাবে সামনের দিকে আগাবো তা নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য শুরুর পর্যায় আমাদেরকে আইনগত ধারা তৈরির কাজ করতে হয়। যেহেতু আমারই দায়িত্ব তাই আমি ও ড. জাহিদ হোসেন মিলে সেটা শুরু করলাম এবং আইনের মোটামুটি একটি খসড়া তৈরি করে ফেললাম। সেটা করেছিলাম ইংরেজিতে। আইন পাস করার আগে তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। তার আগেই কথা উঠল এই আইন ইংরেজিতে করা যাবে না, করতে হবে বাংলাতে। তখন আবার নতুন করে আইনটা বাংলায় তৈরি করতে হলো। সেই কাজে আমি তখন প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ গাজী শামসুর রাহমানের সাহায্য নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীর হয় আমি যখন এন্টি করাপশনের ডিজি ছিলাম সে সময়। প্রকৃতপক্ষে তখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তার সাথে আমার সম্পর্ক শুরু হয় একটি বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আর সেখান থেকে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তার সাথে দেশ, ইসলামের বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হতো। এতে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, যেটা আল্লাহর রহমত ছাড়া বিশেষ কিছু নয় যে, তিনি যে কোনো বিষয়ে আমার কাছে সর্বশেষ একটা মতামত নেয়ার চেষ্টা করতেন এবং আমি যেটা দিতাম তিনি সাধারণত তা মেনে নিতেন।

আমাদের খসড়া আইন অদলবদল হয়ে এক পর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে আবার আমাদের কাছে ফেরত আসে। আমরা সেটাকে আবার ঘষামাজা করে দাঁড় করালাম। যেহেতু এটা একটি নতুন জিনিস ছিল, আইন মন্ত্রণালয়ও তা বুঝত না বলে শত শত প্রশ্ন করত। সে সময় সেসব প্রশ্ন খুব গভীরভাবে বোঝার মতো লোক

www.pathagar.com

এই দেশে খুব কম ছিল। আইএমএফ-এর বিশেষজ্ঞ ড. হাসান মনসুর ও আমি দুই জনে মিলে আমরা একটা সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করতাম এবং সেগুলো আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর তারা সেটাকে গুছিয়ে একটা আইন তৈরি করত।

ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মন্ত্রী পরিষদকে বোঝাবার চেষ্টা করা। সেটা তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম এ মুনীমকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তিনি আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে একটি মিটিং ডাকলেন। তিনি সহ আমরা তাদেরকে তা বোঝাবার চেষ্টা করি এবং আমি বলব তাদেরকে আমরা মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারা স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট সম্পর্কে সব সময় সন্দেহে ভুগতেন না জানি আমরা ভালো করতে গিয়ে আরো কিছু খারাপ করে ফেলি। এ ভীতি সবার মধ্যে ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সিদ্ধান্ত নেই ১৯৯২ সালের বাজেটে এটা কার্যকর করব। এর আগের বাজেটেই মুনীম সাহেব আগামী বছরের বাজেটে ভ্যাট ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

যেহেতু এটা কার্যকর করতে সময়ের প্রয়োজন তাই খালেদা জিয়ার সরকার আসার পরপরই এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে আমরা মন্ত্রীসভায় পেশ করি। সেখানে অনেক কষ্টের পরে আমরা মন্ত্রীসভার অনুমোদন পাই। তাদেরও একই কথা, সেই সন্দেহ যে আমরা নতুন মন্ত্রীসভায় এসেছি, না জানি ভালো করতে গিয়ে তা আরো মন্দ হয়ে যায়। আবার ভালোভাবে কার্যকর করা যাবে কি না - এসব বিষয় ছিল। সেই কেবিনেটে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাধ্যমতো চেষ্টা করেন বিষয়টি সবাইকে বোঝাবার জন্য। আমার যিনি সেক্রেটারি ছিলেন নূরুল হোসেন খান তিনি চেষ্টা করেন। আমি চেষ্টা করি। সেই কেবিনেট মিটিং বঙ্গভবনে হয়েছিল। তাতে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করেছিলেন। তখনও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ছিল। সেখানে প্রবল বিতর্কের পর ভ্যাট ব্যবস্থা পাস হয়। অর্থমন্ত্রীর যুক্তি ছিল এটা না করলে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হবে। দ্বিতীয়ত, এটা না করলে আরো বেশি করে বিক্রয় কর আরোপ করতে হবে যা সবার আরো অপছন্দ হবে। আর তা হবে রাজনৈতিকভাবে আরো কঠিন।

শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ৯১ সালের ১ জুন থেকে তা কার্যকর করব। তবে এর জন্য আগেই যারা উৎপাদন করে, যারা ব্যবসায়ী, আমদানী করে তাদের রেজিস্ট্রির একটা ব্যাপার আছে। তার জন্য দেশব্যাপী আমরা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করলাম। সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে তার ব্যবস্থা করা হলো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এটাও একটা জটিল ব্যাপার ছিল। অন্যদিকে অফিসারদের একটা বিরাট অংশও ভ্যাট বুঝতে পারছিল না। তারা এর পক্ষে ছিল। তাদের বোঝানো, সম্মত

www.pathagar.com

করাও একটা কঠিন কাজ ছিল। সেটাও আমাদেরকে করতে হয়েছে। দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে ঢাকায় ডেকে এনে তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে। তাদেরকে নতুন করে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। এখানে আইনের একটি ধারা ছিল ভ্যাট কার্যকর করতে কোন কোন ধারা আগে কার্যকর করতে হবে সেই ধারাগুলো আমরা আগে কার্যকর করে ফেলি।

ভ্যাট কার্যকর শুরু হওয়ার পরই স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে নানা জটিলতা দেখা দেয় এবং ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা প্রায়ই বিদ্রোহ করে বসল। তারা এটা চায় না। যদিও তারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল। এফবিসিসিআই জড়িত ছিল। কিন্তু তারা বলল, আমরা এর জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেইনি। অথচ ভ্যাট এসময় কার্যকর করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল।

অর্ডিন্যান্স করে ভ্যাট আইন করা হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে পার্লামেন্ট থাকলে ৯০ দিনের মধ্যে তা আইনে পরিণত করতে হবে। ফলে পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য সাবমিট করা হলো। এ বিলের বিরোধীতা করে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। এদিকে কুটিরশিল্প মালিকেরা ঢাকায় প্রায় বিদ্রোহ করে বসে। ঢাকায় তাদের শত শত প্রতিনিধি এই আইন প্রত্যাহারের বিভিন্ন দাবি নিয়ে জড়ো হতে থাকেন। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি উঠল। এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভ্যাটকে রক্ষা করাও একটি কঠিন সংগ্রামে পরিণত হলো। তখন সাইফুর রহমান সাহেবের অনুরোধে সকল ব্যবসায়ী, চেম্বার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসতে হলো। একেবারে শেষে আমি সহ কয়েকজন মন্ত্রী ও সেক্রেটারির উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেও ঠিক কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। শেষে আমি কথা বললাম। প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি বললাম, ম্যাডাম, আমার মনে হয় আমি যেহেতু ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমি বুঝতে পারছি আপনার চিন্তাটা কি? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা খুবই ভালো একটি সিস্টেম। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, আগের সরকার এটা কার্যকর করার কথা দিয়েছে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে। আবার গত বাজেটেই বলা হয়েছে এবার এটা কার্যকর করা হবে। আর এটা একটি উত্তম পদ্ধতি। যেসব সমস্যা হচ্ছে তা সাময়িক। তারপরও আমি আপনার চিন্তা বুঝতে পারছি। এর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি, যেখানে খুব বেশি সমস্যা সে কয়টা জায়গা থেকে আমরা এটা প্রত্যাহার করে নিতে পারি। আপনি বললে আমরা দেখে দেখে ৭/৮টি আইটেম থেকে কিছু সময়ের জন্য ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেব। তাহলেই গোটা সিস্টেম রক্ষা পাবে।

কেন জানি তিনি আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন এবং তিনি সাইফুর রহমান সাহেবকে আমার উপর দায়িত্ব দিতে বলে দিলেন। তখন আমি কিছু সেনসেটিভ

www.pathagar.com

আইটেম বেছে বেছে তার উপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য পেশ করার পর পরের রাতেই পার্লামেন্টে তা পাস হয়ে যায় সকল বিরোধী দলের ওয়াক আউটের মধ্যেই। এর ফলে ভ্যাট রক্ষা পেল। আর ভ্যাট রক্ষা পাওয়ায় তা যে ভালো হয়েছে সেটা লোকেরা আজকে বুঝতে পেরেছে।

ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য সে সময় সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের উপস্থাপনায় একটি টিভি প্রোগ্রামে আমি অংশ নেই। সেখানে আমি দুই দুইবার জাতীয় বিতর্কে শরিক হই। আমি যতটুকু উপলব্ধি করি তাতে আমি সেখানে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলাম। আমার বন্ধুদের মতে, আমি সে বিতর্কে জিতেছিলাম। বাকি আল্লাহ জানেন।

ভ্যাট সিস্টিমে আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলাম। এখানে আগের এক্সসাইজ আমরা বহাল রাখলাম। যেমন, আমরা দেখলাম নিউজপ্রিন্ট, বিড়ির মতো কিছু আইটেম আমরা ভ্যাটে আনতে পারবো না। এগুলোতে করলে তার দাম এত বেশি বেড়ে যাবে যা সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। যেহেতু সমস্ত পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা আমার ছিল, আর আমি তা করতে বাধ্য হয়েছি, সেখানে মূল সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হয় বলে সেখানে আমরা কিছু এক্সসাইজ ট্যাক্স রেখে দিলাম, শুধু সেল ট্যাক্স বাতিল করলাম। ভ্যাটে সব কিছুই আসবে শুধু এক্সসাইজ আইটেম বাদ দিয়ে। যখন আমরা এক্সসাইজ ট্যাক্স তুলে ফেলব তখন তা ভ্যাটে চলে আসবে। এটা একটা মেজর সিদ্ধান্ত ছিল। এটা আমি করেছিলাম। আমি মনে করি বাংলাদেশের বাস্তবতাকে সামনে রেখে একটা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ভ্যাটে আরেকটি বিষয় ছিল সেটা হলো, আগে আদায় করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে জমা দেয়া হবে। এটা বিশ্বব্যাপী অনেকখানেই স্বীকৃত। কিন্তু আমরা এটাকে নিলাম না। আমাদের দেশে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া একটা বড় অভ্যাস। সেই জন্য কারেন্ট একাউন্ট রাখার কথা বলা হলো। এখানে পরে এডজাস্টমেন্টের কথা বলা হয়। অর্থাৎ টাকা আগেই পেয়ে যাচ্ছিল। এই পরিবর্তন আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে করেছিলাম। এটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। না করলে আমাদের পক্ষে ভ্যাট কালেকশন খুব কঠিন হতো।

তৃতীয় যে বিষয়টি আমি নিজ দায়িত্ব নিয়ে করেছিলাম সেটা হলো সবাই হাইরেট অর্থাৎ ১৫.৫০% না করার পক্ষে ছিল কিন্তু সেটা আমি করেছিলাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইআফএমও ১০%-১২% করার পক্ষে ছিল। আমি দেখলাম আমরা নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি, যদি কোনো কারণে তা ফ্লপ করে, দ্বিতীয়ত আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও খুব

www.pathagar.com

কম তা যদি বাড়াতে হয় তাহলে আমাদের এখানে ভ্যাটের রেট বাড়াতে হবে। আমরা বারবার বাড়াতে পারব না। যা করার একবারেই করে ফেলতে হবে। এই ভিত্তিতে আমি ১৫% করে ফেলি। যার কারণে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। তবে কার্যের পরিমাণ কোনো দেশে ৫% আবার কোনো দেশে ৩০% আছে। কিন্তু আমাদের শুরুই করতে হয় একটু বেশি রেট নিয়ে। ভ্যাট রেট আসলে প্রয়োজন মতো বাড়াতে হয়। আমাদের প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থাটি কতটুকু ঠিক ছিল না ছিল সে হিসাব নিশ্চয় বিতর্কমূলক। তবে ঐতিহাসিক বিচারে আমি বলব, এটা করার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তা কল্যাণকর হয়েছে। শুধু এই কারণেই হতে পারে, ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ২০/৩০ হাজার কোটি টাকা বেশি ট্যাক্স পেয়েছি এবং তা শুধু ১২% এর পরিবর্তে ১৫% করায়। সবই সরকার করে, অনুমোদন সরকারকেই করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি ছিল মূলত আমার। ট্যাক্স শিল্পপতিরা দেয়নি, দিয়েছে দেশের জনগণ এবং তা প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ও হয়েছে দেশের জনগণের জন্যই। সুতরাং জনগণই এর বেনিফিট পেয়েছে। এর জন্য সিস্টেম বানাতে এবং দেশের জন্য কার্যকর করতে আমাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করতে হয়েছে।

যাই হোক, ভ্যাট টিকে গেল। ভ্যাট প্রবর্তনের সময়টা ছিল আমার জীবনে বড় ধরনের একটা পরিশ্রমের সময়। দুই তিন বছর এর জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত খাটতে হয়েছে। এর জন্য খুব একটা সহযোগিতা পাইনি। শিল্পপতি, রাজনীতিবীদ, ব্যবসায়ীদের পাস কাটিয়ে এটা এই জন্যই করেছি যে, আমি এটা জাতির জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। শুরুতে ভালো সিস্টেমকে লোকেরা অনেক সময় বুঝতে পারে না। আর জনগণ তো জেনে বিরোধীতা করে না। তাদের তো এই বিষয়টি জানা ছিল না। এতে সার্বিকভাবে একদিকে কিছু রেট বেড়ে ১৫% হয়েছে আবার অন্যদিকে কিছু রেট কমে ১৫% হয়েছে। এটার ব্যাখ্যা এরকম যে, মাটি যদি উঁচু-নিচু থাকে তাহলে উঁচু স্থানের মাটি নিচে আনলাম আর নিচের স্থান উঁচু করে সমান করলাম।

সরকারের সচিব থেকে পদত্যাগ

বিএনপি আমলেই সেক্রেটারি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলাম। তখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আমি যথেষ্ট সক্রিয় করার চেষ্টা করি এবং এর জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেখানে একটি গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করি। তারপর হঠাৎ করেই আমাকে ব্যাংকিং ডিভিশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা ঘটে আওয়ামী লীগ আমলে। তখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন মোজাম্মেল হক সাহেব। কিবরিয়া সাহেব ছিলেন অর্থমন্ত্রী। কিবরিয়া সাহেব আমার কোনো এক বন্ধুর

www.pathagar.com

আগ্রহের কারণেই চাইতেন আমি অর্থমন্ত্রণালয়ে বা ব্যাংকিং ডিভিশনের দায়িত্বে থাকি। তিনি কিবরিয়া সাহেবের সাথে আলাপ করেন এবং কিবরিয়া সাহেব আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জানান, আপনাকে তো আমি ব্যাংকিং ডিভিশনে আনতে চাই, আপনি ব্যাংকিং সমস্যা কি কি বলে মনে করেন? সেই সাথে তিনি অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নও করেছিলেন। এটিই উনার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সেদিন সেই আলাপচারিতার শেষে তিনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, দেখেন বিগত সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের লোকেরা ব্যাংকিং-এ তো সুযোগ পায়নি, আপনি কি তাদের দিকে খেয়াল রাখতে পারবেন? এ ধরনের প্রশ্ন তিনি আমাকে করায় আমি তাকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, সার, এ ধরনের কথা সত্য নয়, Banking community like any other community is equally divided. ব্যাংকের যারা মালিক তাদের মধ্যে বিএনপির যেমন লোক আছে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিরও তেমনি লোক আছে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না। এখানে আপনার ধারণা আমার মতে সঠিক নয়। তবে আমি বিশেষভাবে কোনো পার্টির জন্য কিছু করতে পারব না। নিয়মনীতির মধ্যে থেকেই সব কিছু করব।

কিছুদিন পরই ব্যাংকিং বিভাগে জয়েন করার আদেশ হয়ে গেল। এতে আমার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হক সাহেব খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। তিনি নামাজী লোক ছিলেন। তার সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন সেটা তো আমি জানি না। তার সাথে মাত্র তিন মাস কাজ করেছি। এতেই তিনি আমাকে পছন্দ করতেন। আমার উপরে তার আস্থা ছিল। আমার বদলির আদেশ শুনে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ করেন। বলেন, আপনি হান্নান সাহেবকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি এজন্যই তাকে নিয়ে যাচ্ছেন যে তিনি জামায়াতে ইসলামীর লোক? হান্নান সাহেব তো আমার জন্যে খুব ভালো ছিল। তিনি নিজে একথাগুলো মিটিং-এ বলেছিলেন। সেখান থেকেই আমি জানতে পেরেছি। তিনি সেটা আমার সামনেই বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমার সচিবকে নিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর লোক বলেই কি? কিন্তু আমি উনাকে একজন ভালো সচিব বলে মনে করি। আমি তাকে রাখতে চাই। আমাকে না বলে উনাকে নেয়া আপনার ঠিক হয়নি। আমি জামায়াতে ইসলামীর হই বা না হই এটাই আমার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল। প্রাইম মিনিস্টার তাকে বোঝালেন - না না, এটা উদ্দেশ্য নয়। ব্যাংকিং সেক্টরে তার মতো যোগ্য লোকের দরকার। এটা এ জন্যেই করা। এটা তার বিরুদ্ধেও নয়, আপনার বিপক্ষেও নয়।

www.pathagar.com

আমি ব্যাংকিং বিভাগে জয়েন করলাম। সেখানে সাধ্যমতো ভালো কাজ করার চেষ্টা করলাম। যে কাজগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকতে করেছিলাম, যে কাজগুলো বাকি ছিল সেগুলো এখানে গোছানোর চেষ্টা করলাম। আমার চাকরি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই আছে। এখানে তার দু'টি কথা বলে রাখা ভালো। আমার এক পুরানো বন্ধু, সচিব - তিনি আমার সিনিয়র হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলেন যে আমি তার কাজগুলো করে দেব। এটা অন্যায় কিছু নয়। সিনিয়ররা এরকম ভাবতেই তো পারেন। কিন্তু তিনি কি করলেন? তিনি একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। গান-বাজনা পছন্দ করতেন। মন্ত্রী এবং আমার কাছে রিপোর্ট আসল যে তিনি বেশ কিছু গাড়ি কিনেছেন। খুব হাই প্রাইস। এগুলো কেনার ক্ষমতা মূলত তাদের নেই। তিনি অফিসেই তার কবি বন্ধু, সাহিত্যিক, গায়কদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি গানের আড্ডাও বসাতেন। হতে পারে যত না ঘটে তার চেয়ে বেশি রটে। এসব রিপোর্ট আমার কাছে আসত। অন্যদিকে তিনি আমাকে অনুরোধ করতেন এটা করে দিতে, ওটা করে দিতে। কিন্তু আমি সেগুলো করতে পারছিলাম না। আমি করিনি। এ বিষয়গুলো সামনে আসার পরে তা আমি কিবরিয়া সাহেবের নজরে আনতে বাধ্য হই যাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হয়। আমার এখন ঠিক মনে নেই আমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু এর ফলে তিনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে আমি তার কথা শুনছি না। বাস্তবে এসব বিষয়ে তার কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আরেকজন মন্ত্রী হয়েছিলেন সিভিল সার্ভিস থেকে। তিনি একজন শক্তশালী সচিব ছিলেন। ক্ষমতাধর মন্ত্রীও হয়ে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল তিনি অনেক ভালো লোক, মন্দ লোক নন। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতায় যেটা পেলাম সেটা হলো তিনি যে কয়টা তদবীর করেছেন সব কয়টাই বাজে তদবীর, মন্দ তদবীর, ভুল তদবীর, অন্যায় তদবীর।

এ সময় একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। স্টক মার্কেটে আমার সময়ই ধ্বস নামে। এগুলো হয়েছিল দুষ্ট কিছু স্টক মার্কেট অপারেটরের জন্য। যদিও পরবর্তীতে কিবরিয়া সাহেবের দোষ দেয়া হয়েছে। আমি জানি কিবরিয়া সাহেবের কোনো দোষ এ ক্ষেত্রে নেই। এটা আমি বলতে পারি তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। আমিও তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। আসলে, শেয়ার বাজার পরিচালনা যারা করে তারা খুব সাংঘাতিক ধরনের কতগুলো বাজে কাজ করে গোটা স্টক মার্কেটে ধ্বস নামিয়ে দেয়। আরেক দিকে আগে থেকেই স্টক মার্কেটের নিয়মকানুনে কিছু ত্রুটি ছিল।

www.pathagar.com

এর কিছু দিন পরে আমাকে আবার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, এনবিআর-এ নিয়ে যাওয়া হলো। আমি এনবিআর এ যেতে চাইতাম না। যদিও আমি সেখানকার কালেক্টর, ফার্স্ট সেক্রেটারি, সদস্য সবই ছিলাম। তবুও এনবিআরকে ভয় পেতাম। এর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে চাইতাম না বলে কিবরিয়া সাহেবকে বললাম আমি এর দায়িত্ব নিতে চাই না। কিন্তু তিনি জবাবে বললেন, প্রাইম মিনিস্টার তো আপনাকে এনবিআরএ চাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম বিভিন্ন শিল্পপতি গ্রুপ থেকে দাবি উঠছিল এনবিআরএ আমি গেলে ভালো হবে। কারণ তাদের ধারণা সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান ভালো আছে। আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি সেখানে অসৎ কিছু করব না। ভালো কিছু করব। এরকমই ধারণা সমাজে, বিভিন্ন মহলে রয়েছে। কিন্তু আমি ভাবতাম এখানে দুর্নীতি খুব বেশি। কাস্টমসে, ইনকাম ট্রাক্সে দুর্নীতিসহ আরো অনেক বিষয় মিলিয়ে আমি মনে করতাম এটা আমার জন্য ভালো জায়গা নয়। তবে শেষ পর্যন্ত আমাকে এনবিআর-এ যেতে হলো। কিবরিয়া সাহেব আমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি এটা বাতিল করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে তিনি বললেন, আমি পারিনি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনাকে চলে যেতে হবে।

এনবিআর-এর চেয়ারম্যান হিসেবে বছর দেড়েকের মতো ছিলাম। সেখানে ১৯৯৭ সালের বাজেট তৈরি করি। প্রত্যেক বাজেটেরই কিছু না কিছু ভালো দিক আছে। ঐ বাজেটে যে ভালো কাজ হয়েছিল তা হচ্ছে আজকে আমরা ঢাকায় যে ট্যাক্সিক্যাব (Taxi cab) সার্ভিস দেখছি তা সে বাজেটের মাধ্যমেই হয়েছিল। এর আগে আশির দশকে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালুর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয় বলে তখন সরকার মনে করেছিল যে সেটা করা আর ঠিক হবে না। কিন্তু আমি এটাকে কার্যকর করার জন্য সরকারকে রাজি করালাম। আমি নিজেও মনে করতাম এবং সরকারকেও বোঝালাম যে এটা হওয়ার দরকার। পৃথিবীতে এমন কোনো বড় সিটি নাই যেখানে ট্যাক্সি সার্ভিস নাই। ঢাকায় বর্তমানে এক কোটি লোকের বাস। এখানে ট্যাক্সি সার্ভিস হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই ট্যাক্সিক্যাব এর সুবিধাদি সম্পর্কে কিছু ব্যবসায়ী আমাকে বুঝিয়েছিলেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এদের মধ্যে লুৎফর রহমান সাহেব নামে ফরিদপুরের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন। কেন দরকার? কি করতে হবে? কি কি না করলে এটা হবে না? ইত্যাদি। সেগুলো আমি মোটামুটি আত্মস্থ করলাম। আরো অন্য লোকদের সাথে আলাপ করলাম। ঠিক করলাম এটাকে খুব বেশি সুবিধা দিতে হবে। বেশি সুবিধা না দিলে এটা বাস্তবে কাজ করবে না। আমি কিবরিয়া সাহেবকে রাজি করালাম। তিনি এটা বাদ দেয়ারই পক্ষে ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। বর্তমান ঢাকায় ট্যাক্সি সার্ভিস নামে যা আছে তা সেই বাজেটেরই অবদান।

www.pathagar.com

ঐ বাজেটে আমি আইটি সেক্টরের দিকেও বিশেষ নজর দেই। তাদের অনেক দাবি ছিল। আইটি সংক্রান্ত অনেক বিষয় আমি নিজেও ভালো করে বুঝতে পারছিলাম না। তাদের বিষয়গুলো আগে ভালো করে শোনাও হচ্ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জামিলুর রেজা চৌধুরীও আমাকে বোঝান। ফলে সর্বোচ্চ সুবিধা যেটা আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল বলে মনে করেছি তা দিয়েছি। সেখানে কর ১০ ভাগ করা হয়। পরের বাজেটে তা শূন্য হয়ে যায়। ফলে তারা আরো ভালো করতে পেরেছে। আইটি সেক্টরের ব্রেক থ্রো হয় ১৯৯৭ এর বাজেটে। আমার ধারণা মোটামুটি একটা ভালো বাজেট আমি পেশ করতে পারলাম।

বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও এনবিআর-এর চেয়ারম্যানের মধ্যে হয়। অর্থ সচিবকে রাখা হয় না। কিন্তু ঐ বছর অর্থ সচিব ড. আকবর আলী খান সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি উনাকে রাখা নিরাপদ মনে করলাম। তিনি যোগ্য ব্যক্তি। আমার বন্ধু মানুষ। তিনি অত্যন্ত ভালো একজন অফিসার। তাকে রাখা ভালোই হয়েছিল।

বাজেট মিটিং হচ্ছিল একটি ছোট রুমে। প্রধানমন্ত্রীকে আইটেম বাই আইটেম আমাকে বোঝাতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনেক বেশি বোঝাতাম, বিশেষ করে যেগুলো খুব সেনসেটিভ বিষয় ছিল। সেখানে একবার কিবরিয়া সাহেব বলেন, হান্নান সাহেব, এত বোঝাতে চাচ্ছেন কেন? বিষয়টা তো পরিষ্কারই আছে। তখন প্রাইম মিনিস্টার আমাকে সমর্থন করে বলছেন, না না, ঠিকই আছে। হান্নান সাহেব মনে করছেন বিষয়টি সেনসেটিভ - একথা বলে তিনি আমাকে সমর্থন জানালেন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ভালো জানতেন। তার সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল। ফলে তিনি বুঝতেন যে, যে কোনো জিনিস করার আগে তিনি যেন ভালোভাবে বিষয়টি বুঝে নেন এটা আমি চাই।

মিটিং হচ্ছিল গণভবনে যেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকেন। দুপুরে খাবার সময় আরো কিছু লোক খাবারে যোগ দেন। খাবার টেবিলে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। একজন প্রতিমন্ত্রী যার কথা একটু আগেই বলেছি, সিভিল সার্ভিস থেকে এসেছেন, ডাক সাইটে। তিনি হঠাৎ করে একটি কথা বলে ফেললেন। সেখানে আমরা পনের-বিশ জনের মতো উপস্থিত ছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার হেড অব দ্যা টেবিল। তিনি বললেন, মাওলানা মওদূদী মদ খেতেন। এ কথাটা বলা হয়েছিল আসলে আমাকে লক্ষ্য করে। ফলে আমি একটু চুপ থেকে মনে করলাম যে এটা বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তখন কিছুটা উচ্চ গলায় আমি তাকে বললাম যে, আপনি যদি এ কথা আমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য বলে থাকেন তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। তবে আপনি জেনে

www.pathagar.com

রাখুন আমি মাওলানা মওদূদীর ছাত্র। তিনি আমার শিক্ষক। এবং আমি জানি তিনি মদ খেতেন না। সবাই থ হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

আরেকটা ঘটনা খাবার টেবিলে ঘটল। শুক্রবার ছুটি না রবিবার ছুটি এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। আধুনিক সমাজের অবস্থা যা হয়, কয়েকজন রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি দেবার জন্য বলতে লাগল। আর এক পক্ষে আমি একা। তবে অনেকেই চুপ ছিলেন। শেষের দিকে আমি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি তাদের কথা শুনবেন না। যদি শোনেন তাহলে আপনি ডুববেন। এটা জনমত নয়। এটা জনমতের বিরুদ্ধে যাবে। আরো বললাম, শুক্রবার করার ফলে এ পর্যন্ত রপ্তানির এক বিন্দুও ক্ষতি হয়নি, একটি কনসাইনমেন্টও বাতিল হয়নি। আমদানি-রপ্তানিতে কোনো সমস্যা হয়নি। কাজেই এগুলো শুধু প্রপাগান্ডা। পাশ্চাত্য অনুকরণ ছাড়া কিছুই না। তিনি একটু চুপ থেকে খানিক্ষণ পর সবার সামনে আমাকে বলেন, হান্নান সাহেব, আমি কি পাগল হয়েছি নাকি? আমি এটা করব না।

শিল্পপতিদের বেশির ভাগই রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি করার পক্ষে ছিল। ট্রেড বডিও পক্ষে ছিল। পত্রিকাগুলোর একটা অংশ ছিল রবিবারের পক্ষে যারা নাকি ইসলামের কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না। তাদের এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বাইরের কিছু চাপও থাকতে পারে। কিন্তু তারপরও যে শুক্রবার ছুটি বাতিল না হয়ে থেকে গেল, আমি বলব তা প্রথমত শেখ হাসিনার জন্যই হয়েছে। আবার নতুন করে বিএনপি ক্ষমতায় আসল তখনও শুক্রবার পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেটাও যে থেমে গেল, আমি বলব তা শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার জন্যই। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ই বুঝতে পেরেছিলেন এটা জনমতের বিরুদ্ধে যাবে। শেখ হাসিনা পারসিভ করলেন না। এটা জনমতের বিরুদ্ধে হবে। এতে কোনো কল্যাণ নাই। শুক্রবার থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো ক্ষতি নাই।

বাজেট হলো। দুর্ভাগ্যক্রমে বাজেটের পরে একটি ঘটনা আমার বিরুদ্ধে গেল। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রেভিনিউ আদায়ের গতি কম হয়ে গেল আগের বছরের তুলনায়। আগের বছরও আমি ছিলাম। দেশী, আন্তর্জাতিক নানা কারণে এটা হয়েছিল। এটাকে শত চেষ্টা করেও আমরা রিকভার করতে পারছিলাম না। সেটা সরকারের একটা উদ্বেগের কারণ ছিল। আমাকে সরকার এর জন্যে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারে। এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই আমাকে সরকারের সচিব থেকে পদত্যাগ করতে হয়। একজন মন্ত্রী আমাকে কতগুলো কাজ নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন। আমি সেটা করতে পারছিলাম না। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্টদের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। তিনি পুরনো বন্ধু, বয়সে

www.pathagar.com

আমার জুনিয়র। আমাকে ভালোই জানতেন। কিন্তু যেহেতু তার কথাগুলো অন্যায় বলে আমি রাখতে পারছিলাম না সেজন্য তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটল। জনৈক শিল্পপতির বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির মাধ্যমে আমাকে আদেশ দেন। তখন আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে জানালাম এই তদন্ত আমার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করবে। সেই শিল্পপতির বন্ধু হলেন একজন ক্ষমতাধর মন্ত্রী যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। তখন তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, হান্নান সাহেব, এটা আপনি করেন। প্রাইম মিনিস্টার নিজে যেহেতু বলেছেন আপনার অন্য কিছু দেখার দরকারটা কি? তখন আমি তাকে জানালাম, ঠিক আছে আমি করব কিন্তু একটু ধীরে যাব।

ধীরে যাবার সিদ্ধান্তই নিলাম। সিনিয়র অফিসারদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারাও আমাকে ধীরে অগ্রসর হতেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পনের বিশ দিনের মধ্যেই তদন্তের বিষয়টি সেই মন্ত্রী জেনে গেলেন। শিল্পপতিও মন্ত্রীর কাছে হাজির হলেন। মন্ত্রী টেলিফোনে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। তখনই ভাবলাম, আমি বুঝতে পারছি আমি আর এই সরকারের সাথে থাকতে পারব না। আমি মন্ত্রীকে বললাম, আপনারা যা করছেন তাতে আমি আর আপনাদের সাথে থাকতে পারছি না। দুর্ভাগ্যের বিষয় একই সময় প্রাইম মিনিস্টারের আরেক মন্ত্রী আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন। তিনি হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ছিলেন এবং মন্ত্রী পদ মর্যাদার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি আরেকটি বিষয়ে খুব খারাপ ব্যাবহার করাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, না আর থাকা সম্ভব নয়। তখন বিষয়টি আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলাম। তাকে না থাকার কথাও জানালাম। তিনি বয়সে একটু ছোট হলেও আমার বন্ধু। তিনি বললেন, হান্নান ভাই, আপনি পদত্যাগ করবেন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে আপনাকে জানাবো। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি আলাপ করতে পারতাম। কিন্তু করলাম না।

এর মধ্যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কাছ থেকে যখন কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না তখন পাঁচ-সাত দিন পর অর্থ সচিব আকবর আলী খানকে বিষয়টি বললাম। তিনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি তখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে কথা বলেন। তিনি আমাকে না যেতে বললেন। কিন্তু এর মধ্যে আর কি হচ্ছিল জানি না। এক রাতে অর্থমন্ত্রী আমাকে জানালেন, হান্নান সাহেব আপনি যেতে চাচ্ছিলেন, আপনি যেতে পারেন। আমিও আপনার কারণে অনেক আক্রমণের সম্মুখীন। এতে তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তার কলিগদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বলেন, আপনি এরকম লোককে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ বিরোধী বা যাকে আওয়ামী লীগ বিরোধী লোক বলে

www.pathagar.com

মনে করা হয়। তাকে এরকম স্পর্শকাতর পদে রাখছেন কেন? দোষটা যেন কিবরিয়া সাহেবের। সাথে সাথে আমি মন্ত্রীকে জানালাম, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি অফিসে গিয়ে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব। পরদিন সকালে অফিসে গেলাম। সকল মেম্বারদের ডেকে বললাম, আপনারা সকলেই সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে নেন। আর আমি একটা লেটার অব রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আমি একটি পদত্যাগ পত্র কিবরিয়া সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। লিখলাম, আপনার সাথে গত রাতে আমার টেলিফোন আলাপও হয়েছে, আপনি আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করুন। আমি পরের দিন থেকে আর স্বাভাবিকভাবেই অফিসে যাইনি।

কয়েক দিন পর প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকলেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে সব বলেন? আমি তাকে সব খুলে বললাম। এতে তিনি দুই মন্ত্রীর উপরে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। আমাকে বললেন, আমি তো এসব কিছুই জানি না। আপনি থেকে যান। আমাকে শুধু বলা হয়েছে বাজেট খারাপ হচ্ছে এখন চেঞ্জ করলেই ভালো হয়। আর কিছু আমাকে বলা হয়নি। তখন আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, হতে পারে। আমি তাকে জানালাম, এখন পত্র-পত্রিকায় অনেক কথা চলে এসেছে। কাজেই থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি তখন বলেন, ঠিক আছে আপনি আপনার টার্ম পর্যন্ত ওএসডি হিসেবে থাকবেন। এর মধ্যে স্বাভাবিক সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক মতোই পাবেন। আপনি এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন, যে পর্যন্ত আপনার টার্ম আছে। আমি সেটা মেনে নিলাম। চেয়ারম্যান, এনবিআর থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হিসেবে বাকি সময়টা কাটালাম।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেদিন আমার অনেক আলাপ হয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার পরামর্শ চান। আমি তাকে কিছু পরামর্শ দেই। এর মধ্যে একটি ছিল এনবিআর-এর চেয়ারম্যান কার হওয়া উচিত। আমি তখন আবদুল মুয়ীত চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। তিনি তাই করেছিলেন। আরেকটা পরামর্শ ছিল ট্রানজিট নিয়ে তাড়াহুড়ো না করা। শেষ পর্যন্ত এটা তিনি আর করেননি। একেবারে শেষে তিনি আমাকে বলেছিলেন, হান্নান সাহেব, আপনার যখনই কোনো পরামর্শ থাকবে আমাকে দিবেন।

আমি তাকে আরেকটি পরামর্শ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আপনার যে পার্টি তা ঠিকই আছে। কিন্তু পার্টিতে ইসলামকে আত্মস্থ করেন। তিনি হেসে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার পার্টি ইসলামের খুব কাছেই আছে। তখন আমি বলেছিলাম, ইসলামকে আরেকটু আত্মস্থ করলে এ জাতির কাছে আপনার জন্য তা আরো বেশি ফেভারেবল হবে। ভালো হবে। আপনি তো ঈমানদার মেয়ে। তিনি হাসতে থাকেন।

যাওয়ার সময় তিনি সুন্দর আলাপ করেন। আমাকে খাওয়ান।

www.pathagar.com

বিদেশ সফর

প্রথম বিদেশ সফর

১৯৫৭ সাল। তখনও আমি ছাত্র। সেই সময়ই আমি প্রথম দেশের বাহিরে যাই। ইসলামী ছাত্র সংঘের একটা ডেলিগেশন ঢাকা থেকে করাচী যাচ্ছিল। পনের সদস্যের সেই দলে আমিও ছিলাম। একটা ছাত্র সংগঠনের পক্ষে সেই সময় এতজনের বিমান টিকিট সংগ্রহ করা কষ্টকরই ছিল। খরচ বাঁচাতে সে জন্যে আমরা ট্রেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ঢাকা থেকে আমরা ট্রেনে করে কলকাতা গিয়ে পৌঁছালাম। সিরাজগঞ্জে ট্রেন বদল করতে হয়। কলকাতায় দুই দিন ছিলাম। খরচের কথা চিন্তা করে আমরা মুসাফিরখানায় থাকলাম। নিজেদের সামান্য কিছু বিছানাপত্র ছিল। সবাই মিলে সেখানে একত্রে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া শুধু পাশের যাকারিয়া স্ট্রিটের হোটেলে করতাম। পরে হাওড়া থেকে ট্রেনে করে অমৃসর শহরে পৌঁছলাম। এটাই আমার প্রথম ভারত সফর এবং সেই সাথে প্রথম বিদেশ সফরও। নিজের দেশের বাহিরে এই প্রথম বের হলাম।

আমরা মনে করেছিলাম জায়গা পেতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে ইঞ্জিনের সাথে লাগানো বগিতে। মানুষ নানা কারণে ইঞ্জিনের সঙ্গের বগিতে উঠতে চায় না। কিন্তু আমাদের চিন্তা ছিল আমরা যদি সেই বগিতে যাই তাহলে জায়গার সুবিধা হবে; হায়াত-মওত তো আল্লাহর হাতে। অমৃসর শহর থেকে আমরা ওয়াগাটারী বর্ডার বলে এক সীমান্তে পৌঁছলাম। সেখানে ইন্ডিয়ান কাস্টমস চেকিং হলো। তারা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহারই করল। আমার মনে আছে, আমার সাথে কুরআন শরীফ ছিল তারা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তছাড়া খুব একটা ভালো ব্যবহার পেলাম না। সেই সময় পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কও খুব একটা ভালো ছিল না। বাংলাদেশের সাথে আজকের দিনের সম্পর্ক সেই সময়ের তুলনায় বেশ ভালো বলা যায়। সেখান থেকে আমরা লাহোর গেলাম। লাহোরে আমরা দেড় দিনের মতো ছিলাম। সেখানে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জামায়াতে ইসলামীর সদর দপ্তরে ভিজিট করলাম। জামায়াতে ইসলামীর ইচড়াস্থিত অফিসে গিয়ে আমি অবাক হলাম, দেখলাম খুবই ছিমছাম একটা অফিস। অত্যন্ত সুন্দর ছোট অফিস। তখন জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর অফিস আজকের মতো এত বড় ছিল না এখন যেমন লাহোরের মনসুরাতে হয়েছে। সেখানেই ইচড়া অফিসে আমরা মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর সেখান থেকে করাচী গেলাম।

সম্মেলনটি ছিল অল পাকিস্তান ছাত্র সংঘের, করাচীতে। অর্থাৎ ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের বার্ষিক সম্মেলন। সিন্দ মাদরাসা গ্রাউন্ডে সম্মেলন হয়। সিন্দ মাদরাসা বলা হলেও সেটা আসলে কলেজ। ওই সময়ের একটা বড় কলেজ ছিল। কলেজের মাঠও ছিল অনেক বড়। সেখানেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পরও আমরা করাচী শহরে কয়েকদিন ছিলাম। করাচী শহর দেখি। করাচী বিচ দেখতে যাই। সেটাও প্রথম বারের মতো। করাচী শহরের একটা বিখ্যাত জায়গা হলো 'গান্ধী গার্ডেন'। পাকিস্তান হবার পরেও তারা গান্ধী গার্ডেন নামটি পরিবর্তন করেনি। অথচ আমাদের দেশে যেটা দেখা যায় খুব সহজেই আমরা নাম পরিবর্তন করে ফেলি। আমি যতটুকু জানি বোম্বেতে এখনো 'এম এ জিন্নাহ' রোডের নাম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

সম্মেলন শেষে আমরা আবার করাচী থেকে লাহোরে ফিরে আসি। লাহোরে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখি। সালামার গার্ডেন, ইকবালের মাজার, বাদশাহী মসজিদ, মোঘল কেল্লাগুলো দেখি। সেখানে আমরা জাহাঙ্গীরের কবরস্থান যাকে 'মকবেরা জাহাঙ্গীর' বলে - সেটা আমরা দেখি। এরই মধ্যে আমরা সেই সময় পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত মওলানা আমিন আহমদ ইসলাহী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি পরবর্তীতে একটা বিখ্যাত তাফসীর লেখেন 'তাদাব্বুরে কুরআন' নামে। তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার সঙ্গে কথা বলে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারি। সে সময় কাদিয়ানীদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আমাদের বলেছিলেন, তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দলিলভিত্তিক বই লেখার প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে এর উপর একটি বই মওলানা আবুল হাসান নদভী লেখেন 'কাদিয়ানাত' নামে আরবীতে। সেটা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা সেই একই পথে ঢাকায় ফিরে আসলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ছাত্র সংঘের বাংলাদেশ অংশের তৎকালীন সভাপতি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সাহেব, যিনি আমার ক্লাসমেটও ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তিনি আমাদের দলের দলনেতা ছিলেন। উপনেতা ছিলেন জনাব আখতার ফারুক সাহেব। তিনি তখন শর্ষীণা মাদরাসাতে পড়তেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমি ছাড়াও ছিলেন প্রফেসর রফিকউদ্দিন আহমদ। তিনি বাংলা সাহিত্যের ভালো ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন। অন্যদের কথা এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। আমার এই সফর ছিল দেশের বাইরে ছাত্রজীবনেরও প্রথম সফর।

তুরস্ক ও ইরান সফর

এরপর লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে প্রবেশ করলাম। চাকরি জীবনের প্রথম সফর হলো ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে। তখন Central Treaty Organization (CENTO) নামে একটি সংস্থা ছিল। বাংলাদেশ অংশ থেকে আমরা দু'জন এবং পাকিস্তান অংশ থেকে দু'জন সহ মোট চারজন সেই সংস্থার আমন্ত্রণে ইরান ও তুরস্ক গিয়েছিলাম। স্মাগলিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে একটি ট্রেনিং কোর্সে অংশ নিতে যাই। আমি ঢাকা থেকে রওনা হয়ে করাচী পৌছলাম। সেখানে কয়েক ঘন্টা সময় হাতে ছিল। বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা অফিসার জনাব নূর মোহাম্মদ আকন্দ সাহেব, পরবর্তীতে তিনি Director General of Post Office হয়েছিলেন, করাচীতে থাকতেন। তখন তিনি খুব সম্ভব ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসাবে পাকিস্তানে ছিলেন। হাতে কিছু সময় থাকাতে তার সাথে দেখা করতে আমি তার বাসায় যাই। তিনি দেখলেন যে, আমি শীতের কাপড় তেমন সঙ্গে নিয়ে যাইনি। তিনি যেহেতু অনেক ভ্রমণ করেছেন, তিনি জানতেন সেখানে অনেক শীত হবে। তাই তিনি তার কিছু শীতের কাপড় আমার সঙ্গে দিয়ে দেন। আমি এয়ারপোর্ট থেকেই সরাসরি তার বাসায় চলে গিয়েছিলাম। তিনি নিজেই আবার আমাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়ে যান। এয়ারপোর্টেই আমরা চারজন সফরসঙ্গী একত্রিত হলাম।

বাগদাদ হয়ে খুব সম্ভব ৬ই নভেম্বর আমরা ইস্তাম্বুল পৌছালাম। বাগদাদে এক ঘন্টা স্টপ ওভার থাকায় বের হতে পারিনি। শুধু আকাশ থেকেই শহর দেখতে হয়েছে। রাত ছিল, তাই কিইবা আর দেখা যায় যে বাগদাদে এখন কত ঘটনাই ঘটে গেল।

ইস্তাম্বুল শহরে নেমেই, মনে পড়ে আমি একটা তুর্কী পত্রিকা নিলাম। সেটাতে বিরাট হেডিং ছিল 'Nixon Olde Hamfrey Ilardc' - আগের দিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। সেটা ছিল তারই ফলাফলের খবর। বিষয়টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পত্রিকার সেই বিরাট হেডিং 'নিক্সন ওলদে' মানে হলো নিক্সন জয়লাভ করেছে এবং 'হামফ্রে ইলারদে' হলো হামফ্রে পরাজিত হয়েছে। আট কলাম হেডিং ছিল। ভিতরে তুর্কি ভাষায় ছাপা ছিল - যার কিছুই বুঝি না। ওদের ভাষা তুর্কী হলেও স্ক্রিপ্ট ইংরেজিতে থাকায় ভাসাভাসা বোঝার চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

সেখান থেকে প্লেন পাল্টিয়ে তারকিশ হাওয়া ইললোরী অর্থাৎ তার্কিশ এয়ার লাইন্সের প্লেনে করে আমরা রাজধানী আঙ্কারা পৌছালাম। আমরা তুরস্কে ছিলাম তিন সপ্তাহ। তুরস্কে অবস্থানকালে আমরা তাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গেলাম। কেননা এটা ছিল স্মাগলিং বিষয়ক ট্রেনিং। তাদের একটা ডিফেন্স ফোর্স হলো 'জান্দারমা'– এটা আমাদের বিডিআরের মতো। আমরা তাদের হেডকোয়ার্টারে গেলাম। যারা নারকোটিকস নিয়ে কাজ করে তাদের হেড কোয়ার্টারে গেলাম। কাস্টমস ডিপার্টমেন্টে গেলাম। তাদের কোর্টে গিয়ে তাদের বিচার পদ্ধতি, জেলে গিয়ে জেল ব্যবস্থা আর মাদক হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখলাম। তুরস্কে যাওয়ার আগে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কিছু নাম ঠিকানা আমি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের সাথে আমি দেখা করি। সেই সব নাম আমার আজ মনে নেই। সেখানকার এক ডেইলি পত্রিকার তরুণ সম্পাদক আমার হোটেলে আসলেন। তার নাম ছিল মুস্তাফা রিনগে। তখনই আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুরস্কে, ইসলাম জাগ্রত হচ্ছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার নামে তুরস্কে ইসলামকে দমিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামের চর্চার অবকাশ কম যা ইংল্যান্ডে কিংবা আমেরিকাতে আছে। এমন ধরনের অদ্ভুত কঠোর সেকুলারিজম সেখানে আছে। সেখানে অফিসে, স্কুল-কলেজে মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ পড়তেও দেওয়া হয় না সেকুলারিজমের নামে।

তুরস্কে অবস্থানকালে সেখানে আমরা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখলাম। ওসমানী খেলাফতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখলাম। তাদের বিভিন্ন প্যালেসসহ নিদর্শনগুলো দেখে বুঝতে পারলাম তাদের কত বিশাল একটা রাষ্ট্র ছিল। তাদের কত প্রাধান্য ছিল ইউরোপ এবং এশিয়ার উপরে তাও তাতে বোঝা যায়। এর মধ্যেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মারমারা সাগরে আমাদের একটা ট্রাভেলে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা ছোট একটা স্পিড বোর্টের মতো বোটে উঠেছিলাম। এক পর্যায় তাতে আগুন ধরে গেল এবং বোর্টটি ডুবতে লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুই বলতে হয়। আমরা তীর থেকে দেড় দুই মাইল দূরে ছিলাম এবং ভাগ্যক্রমে আমাদের চারপাশে কিছু নৌকা ছিল। তখনও আমরা কেউই বাঁচার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেইনি। এরই মধ্যে চারপাশ থেকে নৌকা এস আমাদেরকে উদ্ধার করে। সে যাত্রা বেঁচেই গেলাম। সাগর তীরেই আমরা দুপুরের লাঞ্চ করছিলাম। আমাদের সাথে ইরানের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ছিলেন। ইরান টিমের হয়ে তিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তুর্কি ভাষায় মাছকে 'বালিক' বলে। দুপুরের খাবার খেতে খেতে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হান্নান সাহেব, আমরা এখন বালিক খাচ্ছি, কিন্তু যদি ডুবে যেতাম তাহলে বালিকই আমাদের খেত'। এটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা এবং তা এখনো মনে পড়ে।

www.pathagar.com

সেখান থেকে প্রায় তিনশ মাইল দূরে জামালুদ্দীন রুমীর মাজার দেখতে আমরা কোনিয়া গেলাম। তুরস্কের রাস্তাঘাট সে সময়ই খুব ভালো ছিল। সুন্দর এবং পরিকল্পিত রাস্তা বলেই মনে হলো। কোনিয়াতে কিছু হিজাব পড়া মেয়ে দেখলাম। আজকে যেখানে আমরা জানতে পারছি তুরস্কের রুরাল এরিয়ায় প্রায় ৭০-৮০ ভাগ মেয়েই হিজাব পড়ে এবং শহরে সেখানে প্রায় চল্লিশভাগ মেয়ে হিজাব পড়ে। এটা এজন্য নয় যে তারা হিজাব পড়ে না বা পছন্দ করে না। এটা এ জন্যে যে তুর্কী সরকারের ও তার নীতিমালার কারণে তাদের একটা বিরাট অংশ হিজাব পড়তে পারেনি। কিন্তু তারা তখনও হিজাব পছন্দ করত। সে সময় কামাল আতাতুর্কের জন্ম কি মৃত্যু দিবস পড়ে গেল। আমরা তাদের সরকারী অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলাম।

আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম শেষ হলে আমরা যাব ইরানে। ইরান যাবার পথে নিজেদের খরচে আমরা দুই-তিন দিন বৈরুত থাকলাম। টিকিট ও প্রোগ্রামে একটু পরিবর্তন এনে আমাদের গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বৈরুত থাকবে। আমরা নিজেরাই সাগরের সম্মুখে একটা ছোট হোটেল ঠিক করে নিলাম। পরবর্তীতে ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর আবার বৈরুত যাই। সেই সময়টাও নভেম্বরের সময়েই ছিল। সেখান থেকে সাগরের তীরে বেড়াতে যেতাম। শেষবারও আমরা সি ফ্রন্টের আশেপাশেই ছিলাম। সেখানে কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে আমরা এক প্রতারকের পাল্লায় পড়েছিলাম। বৈরুত বড় শহর। বৈরুত কম বেশি দুইভাগে বিভক্ত - মুসলমান ও খৃস্টান দুই অংশ। তবে প্রতারকের পাল্লায় পড়েও বেঁচেই গেলাম। আমার এক বন্ধু সেখানে কোট কিনতে চেয়েছিল। কোট কিনতে গিয়ে এক লোক ডেকে আমাদের এক বাজারের এমন এক সংকীর্ণ স্থানে নিয়ে গেল সেখানে আমরা ভয়ই পেয়ে গেলাম। তবে আমাদের শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি।

বৈরুতে থাকতেই রোজা শুরু হয়েছিল। ইরান পৌছালাম। আমি রোজা ভেঙে ফেল্লাম। কারণ ভ্রমণে আমার পক্ষে রোজা রাখা খুব কষ্টকর ছিল। শারীরিকভাবেও আমি দুর্বল ছিলাম। কেউ কেউ রোজা রাখলেন। মনে আছে সকালে নাস্তা করার জন্য আমি শহরে দোকান খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু নাস্তার কোনো দোকান খুঁজে পেলাম না। সব বন্ধ। তারা আমাকে এক রকম তাড়িয়ে দিল। ১৯৬৮ সালে ইরানে শাহের আমল। তা সত্ত্বেও ইরানী জনগণের অধিকাংশেরই ইসলামী বিশ্বাস লক্ষ্য করলাম, Iranian Society at the heart of heart was very strongly Islamic.

আমাদের ট্রেনিং তুরস্কের মতোই হলো। কাস্টমস, পুলিশ, জান্দারমা (বিডিআর), এন্ট্রি স্মাগলিং ডিপার্টমেন্ট, নারকোটিকস ডিপার্টমেন্ট, জেল, কোর্ট-এগুলোতে আমরা প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে গেলাম। ইরানের জেলের একটা ঘটনা আমাকে

www.pathagar.com

এখনো খুব পীড়া দেয়। আমরা জেলে গিয়ে সেখানে দেখলাম পাকিস্তানের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বন্দী হয়ে আছেন। তিনি আমাদের দেখে চিৎকার করে বলতে লাগলেন Please! help us, please! help us - আমি বিনা দোষে এখানে আটকা আছি। আমি সহ কেউ কেউ তার দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। তার কথা শুনতে চাইলাম। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ তা শুনতে দিল না। হয়ত আমাদের এই ঘটনার পরে তার উপর আবার অত্যাচারও হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে কোনো কারণে তিনি ইরানে গিয়েছেন। ভ্রমণ বা মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে এরকম বিপদে পড়ে যান। সে সময় আমাদের প্রতি তার যে ধরনের আবেদন ছিল তাতে আমি নিশ্চিত যে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এটা এখনো আমার মন বলে। তবু আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।

ইরানের যে সমস্ত অফিসার ছিল তাদের সাথে তুরস্কেই আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন যুবক ছিল তার সাথে তুরস্কের একুশ দিনের অবস্থান হওয়ায় খাতিরও হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। সে তার মা ও পরিবারের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে যায়। তার বাসায় কয়েকবারই খাওয়ায়। তার যারা বান্ধবী ছিল তাদের বাসায় নিয়ে গেল। বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সেখানে যেটা লক্ষ্য করলাম, ঘরের ভিতরও তারা সালোয়ার কামিজ পড়ে। বয়স্ক মেয়েরা সব লম্বা চাদর পড়ে। কিছু মহিলার সাথে দেখা হলো তারা বিদেশী কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শেখে বা পড়াশুনা করে, তারা আধুনিক দেখলাম। আর তাদের নৈতিকতাও ভালো নয়। তাদের সবার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম সেখানে তখনই শাহের বিরুদ্ধে একটা গোপন আন্দোলন চলছে। সেটা ছিল সোসালিস্ট ধরনের। আমাকে যারা নিয়ে গেল মনে হলো তাদেরও সোসালিস্ট অনুপ্রেরণা ছিল। আমার সেই বন্ধু Para Military Force এর মেজর পদের ছিল। সেও ওই আন্দোলনের সমর্থক ছিল। যদিও তা বাইরের কেউ তেমন বুঝতে পারবে না কিন্তু আমি বেশি মেশার ফলে বুঝতে পেরেছিলাম। আর সেও আমাকে এরকম বলেছিল যে, এখানে ইসলাম ও সোসালিস্টদের শক্তিশালী কাজ রয়েছে এবং তারা কমবেশি তাদের কাজের সমন্বয় করছে।

ইরানে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ফলে অন্যরা ইস্পাহান ও শিরাজে গিয়েছিল। আমি সেখানে না গিয়ে হোটেলে থেকে গেলাম। তেহরানেই ঘোরাফেরা করলাম। তখন ইরানকে উন্নত দেশ বলেই মনে হলো। যদিও রুরাল ইরান বা ইরানের পল্লী অবস্থা তখনো দেখিনি।

www.pathagar.com

জাপান সফর

বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৭ সালে প্রথম বিদেশ সফর করি জাপানে। তখন আমি এনবিআরের ফার্স্ট সেক্রেটারি। একটি ট্যাক্স ট্রেনিং প্রোগ্রামে জাপান গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে ব্যাংকক গেলাম থাই এয়ারলাইন্সে। সেখান থেকে জাপান এয়ারলাইন্সে করে জাপান পৌঁছাই। থাইল্যান্ডে একদিন বিরতি ছিল। আমার এখনো মনে পড়ে যখন টোকিও বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন স্পর্শ করল তার টাচ ডাইন এতো নিখুঁত ছিল যে বিমানটির অবতরণ সম্পর্কে কিছুই বোঝা গেল না।

জাপানে আমাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল 'জাইকা' (Japan International Corporation Agency) নামে একটি সংগঠন। তাদের একটা হোস্টেল আছে টোকিও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার নামে, সেখানে আমাদের রাখা হয়েছিল। তবে আমরা কয়েকজন ছিলাম সিবুইয়া সানরুট হোটেলে। আমাদের মূল ট্রেনিং হয়েছিল মিতসুই বিল্ডিংয়ে। আমরা ট্রেনিং উপলক্ষে জাপানের মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স, মিনিস্ট্রি অব ফরেন ট্রেড প্রভৃতি ভিজিট করি। ট্রেনিং ছিল একুশ দিনের মতো। প্রায় বিশটি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী এসে এতে শরিক হয়। বাংলাদেশ থেকে আমি ও ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের আবদুর রহমান খান সাহেব (যিনি পরবর্তীতে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার হন) অংশগ্রহণ করি। অন্যান্য দেশের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ ছিল। সিরিয়ান, আফগান, ইরানীয়ান লোকেরাও ছিল।

জাপানে মি. হোসেন খান নামে আমার এক পুরাতন বন্ধু থাকতেন । তিনি পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন। এক সময় ঢাকায় থাকতেন। ঢাকায় তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে প্রায় চার বছরের মতো ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপান চলে যান। আমি জাপান গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি এবং সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে জাপানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। তাতে আমি লক্ষ্য করলাম, জাপানে ইসলামের কাজের মোটামুটি অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু ব্যাপকতা তাতে আসছে না। টোকিও ইসলামিক সেন্টার ভিজিট করি। সেখানে সুদানী এক ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়, তিনি পরে টোকিওতে সুদানী এ্যামবাসিডর হয়েছিলেন। তিনি বর্তমান সুদানের ইসলামী আন্দোলনের লোক। সেখানে অবস্থানকালে জাপানী ইসলামী স্কলারদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। পাকিস্তান ও ভারত থেকে যাওয়া স্কলারদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়।

টোকিও ইসলামিক সেন্টার খুব সুন্দর একটা লোকেশনে অবস্থিত। তাদের একটা ভালো লাইব্রেরি আছে এবং ভালো প্রকাশনা আছে। তাদের কাজগুলো মোটামুটি সিস্টেমিক বলেই আমার ধারণা হলো। মনে পড়ে টোকিওর বড় ও বিখ্যাত যে

www.pathagar.com

মসজিদটি সেখানে আমরা ঈদের নামাজ পড়ি। সেখানে প্রায় দুই হাজার মুসল্লির সমাবেশ হয়। সেই নামাজে ইমামতি করেছিলেন সেই মসজিদেরই একজন তার্কিস ইমাম। সোভিয়েত দখলের পর সেন্ট্রাল এশিয়ার তুর্কি ভাষি কিছু মুসলিম জাপানে অভিবাসিত হয়। তারাই জাপানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আরবরাসহ উপমহাদেশের মুসলমানরা সেখানে যায়। কিন্তু টোকিও মসজিদের প্রধান নিয়ন্ত্রণ তুর্কিদের হাতেই রয়ে গেছে এবং তারাই তুরস্ক থেকে ইমাম নিয়ে আসেন। পত্রিকায় দেখেছি বর্তমানে সেই মসজিদটি ভেঙে আরো বড় করা হয়েছে।

কিন্তু জাপানে ইসলামের প্রতি গভীর আগ্রহ আছে বলে বুঝতে পারলাম না। এর কোনো কারণও বুঝতে পারিনি। ইরানী বিপ্লবের পর বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি সেই সময় জাপান যাই। যদিও হাজার পঞ্চাশেক লোক সেই সময়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে, তারপরেও ইসলামের দিকে দলে দলে আসার যে প্রবণতা পাশ্চাত্যে রয়েছে সেটা আমি সেখানে লক্ষ্য করিনি। এটার কারণ কি তাও বলা আমার পক্ষে মুশকিল। তারা কি খুব বস্তুবাদী হয়ে গেছে নাকি তারা কোনো আধ্যাত্মিক শূন্যতা বা স্পিরিচুয়াল ভ্যাকুউয়াম অনুভব করেছে না - এটা একটি স্টাডির বিষয়, বিবেচনার বিষয়।

পশ্চিমেরাও তো বস্তুবাদী সভ্যতা। তা সত্ত্বেও তাদের ভিতর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক পুরুষ এবং নারী, বিশেষ করে নারীরা বেশি সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করছে। সেটা কালোদের মধ্যে যেমন হচ্ছে, সাদাদের মধ্যেও হচ্ছে। যদিও বর্তমানে জাপান বস্তুবাদী সভ্যতার অংশ হয়ে গেছে, ইউরোপ আমেরিকার মতো না হলেও, তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ১৯৭৭ সালের মতো বর্তমানেও জাপানীদের উল্লেখযোগ্যভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়া আমরা লক্ষ্য করছি না। এটাও একটা গভীর বিবেচনার বিষয়।

জাপানীদের ধর্ম বৌদ্ধ ও সিন্টোর (Shintoism) মিশ্রণ বলেই মনে হলো। বহু লোক একই সঙ্গে বৌদ্ধ এবং একই সঙ্গে সিন্টো। তাদের ধর্ম কোনো রিভিল রিলিজিয়ান - খৃস্টানিটি, ইসলাম বা জুডাইজমের মতো নয়। তাদেরটা একটু পৃথক ধরনের। আমার কেন জানি মনে হলো তাদের ধর্মের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। ইসলামে যেমন সুস্পষ্ট আকীদা আছে, সেখানে তাদের ধর্মে সেরকম আকীদা আছে বলে মনে হলো না। তাদের ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে কালচার নির্ভর বলেই আমার কাছে মনে হলো। আরো লক্ষ্য করলাম, পশ্চিমাকরণ সেখানে খুব গভীর হচ্ছে। ট্রাডিশনাল লাইফ ক্রমেই পশ্চিমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সে তুলনায় আরব বিশ্বে, উত্তর আফ্রিকায় বা মুসলিম বিশ্বে, এমনকি বাংলাদেশেও সে

www.pathagar.com

রকম পশ্চিমাকরণ ঘটেনি। জাপানীরা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে আনবিক বোমার মোকাবিলা করেছে। তাতে বহু লোক নিহত হয়েছে। তারপরও লক্ষ্য করলাম তারা সেই পাশ্চাত্যেরই অনুকরণে চলে এবং তাদেরই জীবনাচার তারা গ্রহণ করছে।

জাপানের শহরগুলো অনেক পরিকল্পিত বলেই মনে হলো। টোকিও থেকে কোবে, ইকোহামা, কিয়োটা গেলাম। বুলেট ট্রেনে সফর করলাম। তাতে একটি পরিকল্পিত শহর ও সমাজ লক্ষ্য করলাম। উন্নয়ন সে সময়েই হয়েছে আর সে উন্নয়ন বর্তমানে হয়েছে আরো ব্যাপক। কৃষির ক্ষেত্রে মনে হলো একটি উন্নত কৃষি ব্যবস্থা তাদের রয়েছে। তারপরও শিল্পের প্রতি তারা জোর দিয়েছে বেশি। অনেকটা আমেরিকার মতো জাপান একই সঙ্গে শিল্প ও কৃষিতে উন্নত হয়েছে।

জাপানে একটি জিনিস আমাকে অবাক করেছিল। টোকিওর কেন্দ্রীয় রেল স্টেশন ছিল সিনজুকু। সেখান হয়েই আমাদেরকে মিতসুই বিল্ডিংয়ে প্রতিদিনই যেতে হতো। তারই আশপাশে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে সাব-কন্টিনেন্টের খাবার খেতাম। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম, সেই সিনজুক রেল স্টেশনে একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এবং তার পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে যাচ্ছে। অথচ কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, এটা কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে পুলিশ বা অন্য কোনো সরকারী সংস্থার কোনো লোক না আসা পর্যন্ত কেউ তাকে ধরবে না। আমার চোখের সামনে দিয়েই কমপক্ষে পনের হাজার লোক চলে গেল, কিন্তু আমি কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার

যুক্তরাষ্ট্রে আমি ১৯৯২ সালে প্রথম যাই। তবে এর আগে ১৯৮৪ সালে একবার আমার আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সেবার শরীর ভালো না থাকায় আমি অবশেষে যেতে পারিনি। সেটা ছিল আইএমএফ এর একটি প্রোগ্রাম। যখন যুক্তরাষ্ট্রে যাই আমি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। আমার জন্য USAID একটি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে। আমি যেহেতু সরকার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েছি, সে জন্য আমার নিজের বিশেষ ট্রেনিং এর প্রয়োজনে আমাকে বিশ্ব ব্যাংকের একটি বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হলো। আমার সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন যুগ্ম সচিব জনাব ড. আবদুল মুবিন। তিনি ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসের লোক। পরবর্তীতে তিনি সচিব হয়েছিলেন। তিনি সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীতের ছোট ভাই।

www.pathagar.com

আমেরিকা যাওয়ার আগে লন্ডনে আমরা দু'দিন থাকলাম জনাব মুবীনের এক আত্মীয়ের বাসায়। লন্ডনস্থ সোনালী ব্যাংকের প্রটোকল অফিসার আমাদেরকে রিসিভ করলেন। তিনি অত্যন্ত ভালো লোক। তিনি এবং জনাব মুবীন দু'জনেই সিলেটের লোক। খুব ভোরে আমরা হিথ্রো এয়ারপোর্ট পৌছাই। ঠাণ্ডাও ছিল ভীষণ। ওভারকোট পড়েই বিমান বন্দর ত্যাগ করি। প্রাইভেট কারে বসেই আমি ফজরের নামাজ পড়ে নেই।

লন্ডনে থাকতে আমার সঙ্গে ড. আব্দুল বারী সাক্ষাৎ করেন, যিনি পরবর্তীকালে ইসলামিক ফোরাম, ইউরোপের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ফিজিক্সে ডক্টরেট করেছেন। ড. বারী লন্ডনে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। ইসলামী মুভমেন্টের আরেকজন খুব সক্রিয় সদস্য ছিলেন ড. আজিজুর রহমান। খুব সম্ভব তিনিও ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন। তারা এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে আমি লন্ডনসহ গোটা ইউরোপের অবস্থা বোঝার জন্য একটা ধারণা নিতে চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে পরামর্শ দেই এবং আরো সক্রিয় হতে বলি। বিশেষ করে ড. আজিজুর রহমান মনে হচ্ছিল আন্দোলনের প্রতি সময় কম দিয়ে অন্য কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তাকে অনুরোধ করি সে যেন ইসলামিক মুভমেন্টের কাজে আরো বেশি সক্রিয় হয়।

আমরা যেখানে ছিলাম তারা আমাদেরকে অত্যন্ত যত্ন করে, বিশেষ করে আমি মেহমান ছিলাম বলে। লন্ডনের আরেকটি এয়ারপোর্ট 'গ্যাট উইক' হতে TWA এর বিমানে করে আমরা আমেরিকার পথে আটলান্টিক পাড়ি দিলাম। সামগ্রিকভাবে যদিও লন্ডন মানচিত্রের অনেক উত্তরে তারপরও আটলান্টিক পাড়ি দিতে আরো উত্তর দিয়ে বিমান যায়। ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বোঝা যায় বেশির ভাগ এলাকাই বরফ আচ্ছাদিত। আমাদেরকে ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্স (TWA) যুক্তরাষ্ট্র ল্যান্ড বর্ডার থেকে আরো তিন ঘন্টা ভিতরে পোর্ট লুইস নামক এক বিমান বন্দরে নিয়ে যায়। আমি তখনও এতো ভিতরে যাবার ঘটনাটা বুঝতে পারিনি। তবে পরে জানলাম পোর্ট লুইস হলো TWA এর হেড অফিস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটা এয়ারলাইন্সেরই আলাদা হেড কোয়ার্টার আছে। সেখানে খুব শক্ত কাস্টমস চেকিং হলো। মনে পড়ে ড. মুবীন পান নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা সেগুলো ফেলে দেয়। এর একটি কারণ হলো প্লান্ট কোরেন্টাইন। প্লান্টের ভিতর জীবানু থাকতে পারে, যা ছড়িয়ে সেখানে পড়তে পারে। কিছু খাদ্য ছিল তাও ফেলে দেয়। আমি কিছুই নেইনি। পোর্ট লুইস থেকে দুই-আড়াই ঘন্টার ফ্লাইটে ওয়াশিংটন পৌছালাম। লন্ডন

www.pathagar.com

থেকে ওয়াশিংটনের ফ্লাইট খুবই উন্নত মানের। কিন্তু আমি অবাক হলাম অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইটের খুব খারাপ অবস্থা দেখে। প্লেন চলে ভালো কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণ বাজে মানের। এটা ছিয়ানব্বইতে গিয়েও টের পেয়েছি। তাদের সেবার মানও খুব খারাপ। হয়ত বা ব্যয় সংকোচ বা কস্ট কাটিং এর একটা ব্যাপার আছে।

আমেরিকায় অনেক সার্ভিস এজেন্সি আছে। আমরা ওয়াশিংটন পৌছলে সে রকমই একটি এজেন্সি আমাদেরকে রিসিভ করে। এই ক্ষেত্রে যারা আমন্ত্রণ জানায় তারা রিসিভ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে না। ভার্জিনিয়া স্টেটের হোটেল ভার্সিনিয়াতে সেই এজেন্সির এক মহিলা আমাদেরকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা দু'জনই আমাদের লাগেজ হারিয়ে ফেললাম। সন্ধ্যার সময় হোটেলে যখন পৌছাই তখন আমরা ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি বিশ্রামে চলে যাই। ফজরের পর উঠে দেখি আমাদের লাগেজ পৌছে গেছে। সিস্টেমটা খুব ভালো। তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে সব করে থাকে। হারানো জিনিস পেয়ে গেলে বাড়িতে পৌছে দেয়।

বিশ্বব্যাংকে আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল সেন্ট্রাল ব্যাংকিং, কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ইত্যাদির উপর। সেটা ভালো একটা ট্রেনিং ছিল। কিছু কিছু লেকচার ছিল খুবই উন্নতমানের। সেখানে বিশ-পঁচিশটি লেকচারের মধ্যে পাঁচ-সাতটা লেকচার এমন ছিল যা আমার কাছে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে বলে মনে হলো। সেটা ফাইনান্সিয়াল সিস্টেমের উপর আমার উপলব্ধিকেও অনেক উচ্চ করে। তিন সপ্তাহের ছিল সে সফর।

ভার্জিনিয়ায় থাকতাম। পাতাল রেলে ট্রেনিং সেন্টারে যেতাম। ভার্জিনিয়া হোটেলে স্বাভাবিক সময়ই কাটিয়েছে। সেখানকার একটি ঘটনা বেশি মনে পড়ে। একদিন হোটেলে লিফটের অপেক্ষা করছিলাম। লিফটের সামনে দেখি এক লোক একটি কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। আমি কুকুরটি দেখে হঠাৎ ছিটকে পিছে সরে আসি। কারণ আমি কুকুরকে খুব ভয় পাই। দুইজন বেলবয় যারা মালামাল উঠানামা করে, পাশেই ছিল। তাদের বয়স বড় জোর বিশ কি একুশ হবে। তারা আমাকে আমি কেন এভাবে ছিটকে পড়লাম তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। আমি উত্তর দেবার আগেই ড. আবদুল মুবীন সাহেব বললেন, হান্নান সাহেব কুকুরকে ভয় পান। এ কথা শুনে সেই বেলবয়দের মধ্যে একজন এমন একটা মন্তব্য করল যা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তার মন্তব্য ছিল, Why are you afraid of dog? You should be afraid of American women, the more money you have, the more they love you.

আমি তার সেই মন্তব্যে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেটা ছিল মেয়েদের প্রতি একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক বাজে কমেন্ট। কিন্তু নিশ্চয় সেটা ছিল আমেরিকান সোসাইটির

www.pathagar.com

একটা দিকের পরিচয়। তা না হলে সেই যুবক এরকম কমেন্ট করে কিভাবে? তবে আমি নিশ্চিত এটা একটা একপেশে মন্তব্য। যদি আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম তাহলে তারা হয়ত একই ধরনের মন্তব্য বা এরকম কিছু একটা আমেরিকান ছেলেদের সম্পর্কে করত। কেউ হয়ত আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমি মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা না করে এরকম কথা বলছি কেন? কিন্তু বিভিন্ন লিটারেচার পড়ে আমার এরকমই ধারণা হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের যারা আছে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি। সেখানে রিসিপশনে একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে মেয়েটি স্কার্ফ পড়া ছিল। পরবর্তীতে জানতে পারলাম তার নাম শাহানা। তার কাছেই তার নিজের সম্পর্কে খোঁজখবর জানলাম। তারা বাবা-মা, ভাই-বোনসহ আমেরিকা আসে। তার স্বামী একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। মেয়েটির বয়স তখন বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে। তার স্বামী তাকে বারবার বলত হিজাব নেয়ার জন্য। তখন সে নেয়নি। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সে তা গ্রহণ করে। শাহানা একদিন আমাকে ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টার দেখায়। সেখানে নামাজ পড়ি, কিছু লোকজনের সাথে কথা বলি। দুপুরের খাবার খাই একটি আজারবাইজানি হোটেলে। কয়েক দিন পর আমি যখন নিউইয়র্ক যাই সেখানে আমার এক ছোট ভাই ও বন্ধু মীর কাসেম আলীর এক ভাই মাসুম আলী থাকতো। তার ডাক নাম ছিল কামাল। তার বিয়ের কথা চলছিল। আমি কামালকে সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বলি। মেয়ের সাথে টেলিফোনে পরিচয় করিয়ে দেই এবং শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে হয়। পরবর্তীতে যখন ছিয়ানব্বই সালে পুনরায় আমেরিকা গেলাম তখন কামাল ও শাহানাদের বাসাতেই আমি ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব কয়েকদিন ছিলাম।

ওয়াশিংটনে ড. মুবীনের আত্মীয়ের বাসাতে বেড়াতে যাই। সেখানে জনাব আবদুল মুকিত চৌধুরীর সাথে পরিচয় হলো। তিনি আমাকে একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। সেটা একজন মৃতের জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান ছিল। সেই দোয়া অনুষ্ঠানে মুকিত সাহেব আমাকে কিছু বলতে বলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমি কি বলব তা বুঝতে পারছিলাম না। তবু আমি পশ্চিমা বস্তুবাদকে সামনে রেখে কোরআনের একটি আয়াত ব্যাখ্যা করি। আয়াতটি ছিল, ইয়া আইয়ুহাল ইনসানা মা গাররাকা বে রাব্বিকাল কারীম' - হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার রবকে ভুলিয়ে দিয়েছে? আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেই বলেছিলাম, কোনো কিছুই যেন আমাদের থেকে আমাদের রবকে ভুলিয়ে দিতে না পারে। সব সময়ই আমরা যেন আমাদের রবকে স্মরণে রাখি যে রবের কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অনুষ্ঠানের পরপরই

www.pathagar.com

নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু সেখানেও দেখলাম কিছু লোক চায় না যে, ছেলেমেয়ে একত্রে নামাজ পড়ুক। তবে আমি যখন সকলকে একত্রে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে বলি তখন আর কেউ বাঁধা দেয়নি।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ট্রেনিং এর সময় সেখানে কোনো নামাজের ব্যবস্থা ছিল না। আমি কোনোরকমে ঘুপচি টুপচি বের করে নামাজ পড়তাম। অন্য মুসলিমরা নামাজ ত্যাগ করে যেত। হয়তো পরে পড়ত। সেখানো ভালো লোক থাকলেও তাদের পক্ষে এতোটা দৃঢ় হওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু আমি কোনো না কোনো জায়গায় নামাজের সময় হলেই দাঁড়িয়ে যেতাম। বিশ্বব্যাংকের ট্রেনিং সেন্টারে ১৯৯২ সালে কোনো নামাজের জায়গা ছিল না। অথচ তারা জানে প্রত্যেক কোর্সে বেশ কিছু মুসলিম ছেলেমেয়ে আসবে। কিন্তু তাদের এদিকে এই খেয়াল নেই। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মূল ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ডে একটা জুমার নামাজের জায়গা আছে। আমি দুটা কি তিনটা জুমা সেখানে পড়েছিলাম। তারা জুমার জন্য প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো ছুটি দিতে চায় না। একটা জুমায় আমি অনুরোধ করেছিলাম একটা ক্লাস পরে নিতে। কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় ক্লাস হলো এবং আমি ক্লাস বাদ দিয়ে নামাজেই গেলাম। যদিও ক্লাসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রোগ্রামের প্রশাসক এগুলো পছন্দ করতো না। তিনি বোধহয় উদার লোক ছিলেন না যে কারণেই এরকম হয়। না হলে আমার নামাজে কোনো সমস্যা হতো না।

ওয়াশিংটনের প্রোগ্রাম শেষ করে নিউইয়র্ক রওনা হলাম। কামাল আমাদেরকে রিসিভ করল। তার বাসায় আমি গেলাম। নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে ড. মুবীনের আত্মীয়ের বাসায় যাই। সেখানে ড. মুবীনের ভাগনী (ডা. শায়লার কন্যা) হার্ভার্ডের ছাত্রী (সম্ভবত লুবনা নাম) সাথে পরিচয় হয় এবং তাকে আমি কয়েকটি ইসলামিক বই দেই। তাকে আমার অত্যন্ত যোগ্য ও মেধাবী বলে মনে হলো। আমি যখনই কোনো ছেলে বা মেয়েকে যোগ্য হিসেবে দেখি তাকেই ইসলামের বই বিতরণ করে থাকে। আমি এটা দেখি না কে কত আধুনিক। আমি চিন্তা করি, আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। হতে পারে এর ফলে সে আংশিক বা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। সামান্যও যদি বদলায় তাও কল্যাণকর।

এরপর নিউইয়র্ক থেকে আমরা লন্ডন হয়ে ঢাকা ফিরে আসি। ফেরার সময় লন্ডনে কয়েক ঘন্টা মাত্র ছিলাম।

দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে

আমি দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাই ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব দেশ চালাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

একটা ভিজিটরস প্রোগ্রাম আছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় তাদের দেশ দেখানো জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লোক নিয়ে যায় এবং সেখানে নানা ধরনের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। যাদেরকে নেয়া হয় তাদের প্রয়োজন মতো করে সেই প্রোগ্রাম সাজানো হয়। যেমন, যদি কোনো সিনিয়র আইনজীবীকে নেয়া হয় তাহলে তাকে তাদের লিগ্যাল সিস্টেম দেখানো হয়। কোনো ব্যাংকার গেলে তাকে তাদের ব্যাংকিং সিস্টেম দেখানো হয়। অর্থাৎ তারা সাবজেক্ট রিলেটেড বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

আমার কিসে আগ্রহ সে বিষয়ে তারা আমার কাছে জানতে চায়। আমি যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় অবস্থা, বিভিন্ন ধর্মের কি কি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং তাদের কি অবস্থা - সেসব দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। তারা চাচ্ছিল আমি ব্যাংকিং সিস্টেম দেখে আসি। কিন্তু আমি ঐগুলোই পছন্দ করলাম। তারা আমার প্রস্তাবে রাজি হলো এবং সফরসঙ্গী হিসেবে অন্য কারো নাম জিজ্ঞাসা করল। শেষ পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট মোবায়েদুর রহমান এবং আমি গেলাম। আমাদেরকে লন্ডন হয়ে ওয়াশিংটন পৌছানোর পরের দিন ইউএস ইনফরমেশন অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে দেয়া হলো। কোনো কোনো ইসলামী, ইহুদী এবং খৃস্টান প্রতিষ্ঠান আমরা ভিজিট করব তার তালিকা আমাদের দেয়া হলো। সেই সাথে শহরগুলোও ঠিক করা হলো। এই তালিকায় ছিল ছয়টি শহর ওয়াশিংটন, ডেনভার, ইন্ডিয়ানাপলিস, লসএঞ্জেলস, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক। ইউএস ইনফরমেশন অফিসে নিয়োজিত বেশ কিছু গাইড আছে যারা খুবই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। এরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের লোকদের সঙ্গে লিয়াজো করে থাকে। পর্যটনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তারা ভালো জানে। তাদেরই মধ্যে থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। তিনি পুরো প্রোগ্রামে অর্থাৎ ছয় সপ্তাহ আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা প্রত্যেক শহরে এক সপ্তাহ করে ছিলাম।

আমরা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন খৃস্টান সংগঠন দেখলাম। তাদের ওয়ার্ল্ড চার্চের (সকল চার্চের) কেন্দ্রীয় সংগঠন যেখানে আছে সেখানে গেলাম। তাদের সঙ্গে অনেক ধরনের আলোচনাই হলো। আমি বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে দু'টি বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করি। অনৈতিকতা বৃদ্ধির মোকাবিলার জন্য আপনারা কি করছেন এবং বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কি করছেন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন কি না বা ফল হচ্ছে কি না? বিশেষ করে গোটা বিশ্বে তাদের ভাষায় যে যৌন বিপ্লব (সেক্সুয়াল রেভিলুশন) হয়েছে, এডাল্টারি (অবৈধ যৌন সম্পর্ক) বিস্তার লাভ করেছে এর বিরুদ্ধে আপনারা কি চিন্তা করছেন? এই সব মৌলিক প্রশ্ন আমি বিভিন্ন জায়গায় খৃস্টানদের মধ্যে তুলি।

www.pathagar.com

এসব আলোচনায় আমার কাছে মনে হলো, তাদের যেন খ্রিস্টান মোরালিটিকেই ধরে রাখার প্রতি আগ্রহ বেশি। তার জন্য কোথাও কোথাও তারা চেষ্টাও করছেন। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তারা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এই মোরালিটি বা ম্যাটেরিয়ালিজমের যে প্লাবন তার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না বলেই তাদের ধারণা। অবৈধ সম্পর্কের বিস্তার এবং যৌনতাকে যেভাবে সহজ করে নেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এই কথাগুলো তারা তুলছে না। তারা যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করছে না। আমার কাছে বিষয়টা এ রকম বলে মনে হলো - আমরা বহু চেষ্টা করেছি, তেমন কিছু হচ্ছে না ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছ। যৌবনে যাই করুক না কেন, এই সময়টা পার হলে জীবনে স্থিতি আসবে। পারিবারিক শৃঙ্খলা আসবে। তখন তারা আমাদের কথা শুনবে। আমরা কিছু একটা তাদের করতে পারব। এই চিন্তা কতটুকু সঠিক জানি না, তবে এরকম দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন আমি তাদের মধ্যে দেখেছি। তবে তাদের মধ্যে আমি অত্যন্ত শক্তিশালী খৃস্টান সংগঠন দেখেছি। একটা সংগঠন আছে যারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পুরুষদের মধ্যে কাজ করে। তারা এই শপথ নেয় যে, তারা কোনো অনৈতিক কাজ করবে না। আমরা খৃস্টান মিশনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে দেখলাম তাদের ট্রেনিং এর পরিবেশ অনেক উন্নত। সেটা সত্যি একটি কলেজ বা ইউনিভার্সিটির মতোই। লক্ষ্য করলাম, তারা তাদের কোর্সে অনেক আধুনিক বিষযকে যুক্ত করেছে। কোর্স তো বাইবেলকে ভিত্তি করে আছেই। আরো যেমন সাইকোলজি, ফিলোসফি, ইকোনোমিকসের মতো বিষয় নিয়ে এসেছে যেগুলো একজনকে ভালো প্রচারক বা যাদের প্রিচার বলে, হতে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশের মাদরাসাগুলোতো এরকম ব্যবস্থা নেই। তাই সাইকোলোজি সাবসিডিয়ারি হিসেবে হলেও মাদরাসা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। কেননা সাইকোলোজি মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে। তেমনি ইকোনোমিকস মানুষের সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে। সোসালজি সমাজকে জানতে সাহায্য করে। চিন্তার ক্ষেত্রে কি ধরনের বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে তা বুঝতে সাহায্য করে ফিলোসফি। এরকম শিক্ষা পদ্ধতিই আমাদের মাদরাসাগুলোতে হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। তাদেরকে দেখে মনে হলো তারা এ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন।

সেটা ক্যাথেলিকদের কেন্দ্র ছিল। তারা এখনও প্রিচাদেরকে বিয়ে করতে দেয় না। এটা সত্যিকার অর্থেই একটা সমস্যা হিসেবে রয়েছে যেটা অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক। এটা তাদের ধর্মের ভিত্তিতে কতটা প্রয়োজন তা চিন্তার বিষয়। একথা ঠিক যে ঈসা (আ) বিয়ে করেননি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কেউই বিয়ে করতে পারবে না। ঈসা (আ) বিয়ে করেননি এটাই যদি মানতে হয় তাহলে তো কোনো খৃস্টানেরই

www.pathagar.com

বিয়ে করা উচিত নয়। সেই সাথে দেখা যায়, প্রোটেস্টানরা বিয়ের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। এসব দেখে আমার মনে হয়, বিষয়টি ক্যাথলিক চার্চের একটি বিরাট সমস্যা। তারা এমন একটা আননেচারাল পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে যার ফল ভালো হচ্ছে না। অন্যদিকে আবার মানুষ তার স্বভাবের বিরুদ্ধেও চলতে পারছে না।

সফরে আমরা বিভিন্ন খৃস্টান সংগঠন দেখলাম। লক্ষ্য করলাম, তাদের কাজ যেমন বাড়ছে শক্তিও তেমন বাড়ছে। এটাও একটা কারণ যে, বস্তুবাদের বিরুদ্ধেও একটা প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়ারই এটা একটা দিক বলা যায়। অন্যদিকে অনেক ইহুদী প্রতিষ্ঠান আমরা ভিজিট করি। তারা নিউইয়র্কে যে হালোকাস্ট মিউজিয়াম করেছে সেটা দেখলাম। সেখানে নাজিরা জার্মানীতে যে অত্যাচার করেছে এবং যেখানে যেখানে জার্মান অকুপেশন হয়েছিল সেগুলোকে তারা ডকুমেন্ট হিসেবে সংগ্রহ করেছে। তাদের একটা বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সেখানে স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। যে কোনো দর্শনার্থীকেই তারা সেটা দেখায়। এটা ইহুদীরাই শুধু দেখাচ্ছে তা নয়, এটা আমেরিকা সরকারের স্পন্সর প্রোগ্রামেরও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটা দেখানোর একটা কারণ হতে পারে এন্ট্রি সেমেটিজম বা ইহুদী বিরোধী যে জনমত এখনো আছে তা যাতে না থাকে, এরকম ঘটনা আর না ঘটে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এর ফলে ইসরাইলের পক্ষে বিপুল পরিমাণ অর্থ আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। আমেরিকান পলিটিকসকে প্রভাবিত করার জন্য এই ঘটনাকে সব সময় সামনে নিয়ে আসা হয় এবং এটাকে ভিত্তি করে ইহুদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। খৃস্টানদের মধ্যে সিমপেথি সৃষ্টি করা হয়। এমনকি প্যালেস্টাইন ইস্যুতেও তারা এটাকে ব্যবহার করে থাকে। এটা আসলে অনেক ব্যাপক ও জটিল ব্যাপার। এটা যে শুধু একটা সাদামাটা প্রদর্শনী তাই নয়। এর পিছনে ভালোমন্দ দুটি উদ্দেশ্যই আছে বলা যায়।

ইহুদীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেয়ে মনে হলো তারা অনেক বেশি সংগঠিত ও যোগ্য। তারা তাদের কমিউনিটির প্রত্যেককেই শিক্ষিত ও যোগ্য করে তোলে। এটা একটা অবাক ব্যাপার যে তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার অনেক বেশি। এটা পরিকল্পিতভাবেই করা হচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা তাদের জন্য ভালো ফল দিয়েছে। তারা সঠিক কাজই করেছে এবং তাদের কাছ থেকে অন্যদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে আমরা বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন দেখলাম। International Institute of Islamic Thought (IIIT) এর অফিস ভিজিট করলাম। সে সময় তারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে

www.pathagar.com

পরিকল্পনা আমরা দেখলাম। সেখান থেকে ইসলামি স্টাডিজের গ্রাজুয়েট সহ মাস্টার্স ও পিএইচডি'র প্রোগ্রাম করা হবে। তখনই তারা এসব পরিকল্পনা করছিল। এটা অবশ্য ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। সেখান থেকে তাদের লাইব্রেরি প্রকাশনা সম্পর্কে জানলাম। নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বললাম। ট্রিপল আইটি (IIIT) হলো আমেরিকার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় থিংক ট্যাংক বলা যায়। এটা ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। শিকাগোতে আমেরিকান ইসলামিক কলেজও আমরা ভিজিট করি। লস এঞ্জেলস সহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইসলামিক সেকেন্ডারি স্কুল দেখলাম। তাদের স্কুলগুলো খুবই সুন্দর পরিবেশে তারা করছে। এর জন্য লোকাল কমিউনিটিকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কয়েকশ হাইস্কুল ইতোমধ্যে সেখানে হয়েছে। আরো অনেক হওয়ার দরকার। স্কুলগুলো যথারীতি আমেরিকান কারিকুলাম মেনে চলে। সেই সাথে তারা কারিকুলামে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ যোগ করেছে। উপরের দিকে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা পড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেখানে প্রায় মেয়েই ইসলামিক পোশাক পড়ে। ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার পরে হিজাব চাপের মধ্যে থাকলেও দিন দিন এর সংখ্যা বাড়ছেই।

সেখানে আমরা ইসলামিক মুভমেন্টের বিভিন্ন ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারি। সেখানে তাদের যথেষ্ট সক্রিয় দেখলাম। বাংলাদেশিরা সেখানে ইসলামী উম্মাহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এর কারণ হিসাবে তারা জানায়, বিভিন্ন কারণে তারা আরব কিংবা পাকিস্তানীদের সাথে মিলে কাজ করতে পারে না। ফলে তারা কিছু স্বতন্ত্র পথেই অগ্রসর হতে চায়। তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করেছি। আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম, বাংলাদেশিদের কাজ আমেরিকাতে আলাদাভাবে হওয়া উচিত নয়। আমি এটাই মনে করেছিলাম যে, সেখানে বাংলাদেশি মুসলমানরা ভাষার স্বতন্ত্রে পৃথক না থেকে ইসলামের ভিত্তিতে কাজ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে, সেখানে আরব ও পাকিস্তানী সহ অন্যান্য অনেকেরই আলাদা সংগঠন আছে। আবার Islamic Society of North America (ISNA) বা Islamic Center for North America (ICNA)-এর মতো সামগ্রিক সংগঠনও আছে। এরকম বৃহৎ সংগঠন ছাড়াও সেখানে আরো অনেক সংগঠন আছে। MSA, AMSB এরাও উল্লেখযোগ্য।

আমার ধারণা তারা যতই তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা পঞ্চম প্রজন্মের দিকে পৌঁছাবে ততই তাদের মধ্যে এই লোকাল আইডেন্টিটি কমে যাবে। তখন বাংলা বা উর্দুর এতো প্রভাব তাদের মধ্যে থাকবে না। তাদের মাতৃভাষা হবে ইংরেজি। আশা করি, তখন

www.pathagar.com

তারা এক আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি হিসেবে গড়ে উঠবে। বাস্তবে সেটাই হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এসব ছোট ছোট দল থেকে একটা বৃহৎ দলে আমেরিকান মুসলিম আইডেনটিটি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আবার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন

আমি তৃতীয়বারের মতো আমেরিকা যাই ২০০০ সালের অক্টোবরে। সেটা আমার ব্যক্তিগত সফর ছিল। এরই মধ্যে আমি সরকার থেকে অবসর নিয়েছি। সে বছর আগস্ট মাসে আমি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। আমার সেই সফরের টিকিট বিমান বাংলাদেশ দিয়েছিল। এর কারণ হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে আমি দুই বছর পর্যন্ত বিমান বোর্ডের সদস্য ছিলাম। বিমানের নিয়ম হলো বোর্ড সদস্যরা বছরে কয়েকটি টিকিট পান। একটা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং দু'তিনটি টেন পার্সেন্ট মূল্যে পাওয়া যায়। আবার রিটায়ারমেন্টের পরে তারা তিন বছর পর্যন্ত একটা করে ফুলফ্রি টিকেট পেতে পারে। আমার সেই বছরই টিকেটের শেষ সময় ছিল। আমি তাদেরকে বললে তারা আমাকে ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা আসা যাওয়ার ফার্স্ট ক্লাস টিকিট দেয়। আমার এই ব্যক্তিগত সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন বিশ্রাম নেয়া। মাত্র কয়েকদিন আগে আমার স্ত্রী মারা যান। এদিকে অন্য কিছু সমস্যাও ছিল। সব কিছু মিলিয়ে আমার মনটাও খারাপ ছিল। অন্যদিকে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ছিল আমি যেন আমেরিকা থেকে বেড়িয়ে আসি। সেই সব বিষয়কে সামনে রেখেই সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। একই সময় Association of Muslim Social Scientist (AMSS) এর পক্ষ থেকে তাদের ২৯তম সম্মেলনে আমার দাওয়াত ছিল এবং সেই সাথে সম্মেলনে আমার একটি প্রবন্ধ পড়ার কথাও ছিল।

দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টার জার্নিতে দুবাই, লন্ডন হয়ে নিউইয়র্কে পৌছাই। সেখানে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইমরান, ববি, সারা আহমদ, কাওসার আহমদ, শিবলী সহ কয়েকজন আমাকে রিসিভ করে। প্রথমে কাওসার আহমদের বাসায় গিয়ে ঘন্টা দুয়েক থাকি। সেখান থেকে গেলাম নিউজার্সিতে ইমরানের বাসায়, সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ইমরান ও ববি তাদের বাসায় আমার সকল ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করে। ড্রইং রুমে একটা স্পেশাল খাট পাতা হলো আমার জন্য। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লাইব্রেরি আছে। প্রায় বিশ দিনের মতো আমি সেখানে ছিলাম। মধ্যে মাত্র তিনদিন ওয়াশিংটনে ছিলাম। ইমরানদের বাসায় যাবার সময় আমি আইসিএনএ'র (ICNA) হেড কোয়ার্টার ভিজিট করি। সেখানে আমি মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক বিষয়ের

www.pathagar.com

উপর বক্তব্য রাখি। আমি একটি জিনিস দেখে অবাক হলাম। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলিমদের মধ্যে এখনো গণতন্ত্র নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি আছে। সেটা আমি তাদের দূর করার চেষ্টা করলাম। তবে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বলতে পারি এই ভ্রান্তি ক্রমাগত দূর হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদেরই মুখপত্র 'ম্যাসেজ ইন্টান্যাশনাল'-এ ডেমোক্রেসির উপর একটা বিশেষ ইস্যু বের হয়েছে। সেখানে আমারও একটা লেখা আছে, তাতে গণতন্ত্র সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা আছে তার উল্লেখ রয়েছে। ড. মুমতাজ আহমদের একটি লেখা Democracy in Islam : The Emerging Consensus অনলাইনে পড়েছিলাম। এসব থেকে প্রমাণ হয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু জায়গায় যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে রশীদ ঘানুশী অনেক কাজ করছেন। ড. কারযাভীর কারণেও এটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমিও আমার সাধ্যমতো যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি। গত কয়েক বছর ধরে আমি এর উপর পরিশ্রম করছি।

নিউনিয়র্কে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি টেলিফোন কনফারেন্স হয়। একটি ছিল জেন্ডার ইস্যুর উপর। উইটনেসের মেয়েরা, যারা এখান থেকে গিয়েছে এবং যারা ওখানে আছে তাদের মধ্যে চার-পাঁচ জন নিজেদের জেন্ডার সংক্রান্ত জমা প্রশ্নগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা টেলিফোনে আলোচনা করে। সেখানে যত ধরনের প্রশ্ন ছিল তার উত্তর আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি। জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি আমার 'নারী ও বাস্তবতা' বইতে তুলে ধরেছি। সেখানে নানা বিষয় বলা আছে। সেই টেলি কনফারেন্সে ড্রেস সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা আমি আমার মতো উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। মেয়েদের জিন্স পড়া নিয়ে আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেখানে মেয়েদের জিন্স প্যান্ট পড়তে হয়। সেসব দেশে খুব শীত থাকে। আমি তাদের বললাম - আমি তাতে কোনো সমস্যা দেখছি না। আমি বলেছি, প্রয়োজন হলে পড়বে, সতর ঢাকাটাই হিজাবের বড় কথা। সেখানে ড্রেস সংক্রান্ত বিষয়টিই বারবার চলে আসে বিভিন্ন দিক থেকে। হিজাব করতে হবে - সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। কারণ ইসলামে হিজাবের শিক্ষা ইউনিভার্সেল এবং তা অবশ্যই পালনীয়। এটা অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় - এতে কোনো সন্দেহ নাই। লক্ষ্য রাখতে হবে, পুরুষ ও মেয়েদের পোশাক যেন সম্পূর্ণ এক রকম হয়ে না যায়। এটা খেয়াল রাখা উচিত। বিষয়টি সার্বিকভাবে দেখতে হবে। হাতে মোজা, পায়ে মোজা কিংবা গলায় যদি কেউ রুমাল পড়ে তাহলেই পুরুষ বা মেয়ের পোশাক এক হয়ে যায় না। সেই জন্য সামগ্রিকভাবে তা দেখতে হবে এবং একই সাথে তার স্পিরিটকে দেখতে হবে। ইসলামে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্পিরিটটা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই হিজাবের সীমার মধ্যে

www.pathagar.com

আমি এ কথাগুলো বললাম। সেই সাথে শীত ও কষ্টের কথা আমার জানা ছিল। পোশাক পড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে নামাজে যাতে কোনো সমস্যা না হয়। উঠতে বসতে যাতে সমস্যা না হয়। এরকম নানা বিষয় সেখানে এসেছিল। তাদেরকে আমি বিখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞ ড. জামাল আল বাদাবীর সঙ্গে আলাপ করতে বললাম।

আরেকটি টেলিফোন ইন্টারভিউ উইটনেস পাইওনিয়ারের লিডারশিপের সঙ্গে হলো। আট-দশ জনের সাথে সেই আলাপের মূল বিষয় ছিল উইটনেস-পাইওনিয়ার সংগঠন নিয়ে আমি কি ভাবছি। সেই সাথে ছিল প্রশ্নোত্তর। উইটনেস-পাইওনিয়ার প্রসঙ্গে আমি জানালাম, আমি ঠিক করেছি, একটা উচ্চমানের ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তৈরি করতে হবে যারা সারা মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে অভাব বা শূন্যতা আছে তা পূরণ করতে সহায়তা করবে। উইটনেস-পাইওনিয়ারকে নিয়ে এ কাজ আমি বাংলাদেশেও শুরু করেছি। আমাদের অনেক লোক তৈরি করা দরকার। যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাদের লোক তৈরি সহ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোই করতে হবে। সেই সাথে বললাম, উইটনেস ও পাইওনিয়ারে মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কতগুলো কারেন্ট ইস্যুর দিকে বেশি নজর দেয়া। যেমন ইসলামের কোনো পড়াশুনা ঠিক মতো হয় না যদি উসূল-আল-ফিকহ জানা না যায়। উসূল-আল-ফিকহ বা কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূলনীতি জানা না থাকলে ভিত্তি খুব দুর্বল হয়। সকলকে কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূল বিষয় জানতে হবে। আমি এটা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বলি।

আমি এক্সট্রিমিজমকে (চরমপন্থা) খুব বড় সমস্যা হিসেবে ধরে সেই বিষয়ের উপর জোর দিলাম। এটাই ইসলামকে ক্ষতি করবে। পরবর্তীতে এক্সট্রিমিজমের ফলে কি ক্ষতি হয়েছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সংস্কারের জন্য সারা বিশ্বে আমাদের এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। কোরআনে যেটাকে মধ্যমপন্থা বা উম্মতে ওয়াসাত বলা হয়েছে সেটার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমি তাদেরকে ড. কারযাভীর বিখ্যাত বই Islamic Awakening between Rejection and Extremism এর উপর নজর দিতে বললাম। বইটি বাংলা আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি বইটি তাদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বললাম।

তৃতীয়ত, আমি জেন্ডার বিষয়কে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য মেজর প্রশ্ন হিসেবে নিয়ে আসি। এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি। আমার বিভিন্ন বইয়েও তা আছে। নারীদের যে শুধু সম্মান করতে হবে তাই নয়। নারীদেরকে সমান মানুষ ভাবতে হবে। তাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং শারিরিক গঠনে কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু

www.pathagar.com

মানুষ হিসেবে তারা সমান। সেই দায়িত্ব এবং মর্যাদা তাকে দিতে হবে। তাদেরকে ইসলামের কাজে পুরোপুরি জড়াতে হবে। সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফূটিত হওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে কোনোভাবে বঞ্চিত করা ইসলামের লক্ষ্য নয় এবং এটা ইসলামের কোনো উদ্দেশ্যকে পূরণ করবে না। ড. কারযাভী, ড. জামাল বাদাবী, ড. হাসান তুরাবী, আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহসহ বড় বড় আলেমগণ এই কথাই বলেছেন। এ ব্যাপারে সব স্কলাররাই যে একমত তা বলছি না, তবে ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রধান ধারার (মেইন স্ট্রিমের) একটা বড় অংশই এই কথা বলেছেন। আমি সেই সাথে তাদেরকে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বললাম। আল্লাহর আইনের অধীনে সেটা হতে হবে যে নামেই করি না কেন। হোক তা খিলাফত, গণতন্ত্র বা ইসলামী গণতন্ত্র - এটা আমাদের করতে হবে।

উইটনেস-পাইওনিয়ার বাংলাদেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আন্তর্জাতিক হবে সে সম্পর্কে আমি তাদেরকে বলেছি। সেটা নিয়ে পরবর্তীতে তাদের কারো কারো মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, যেহেতু এই সংগঠনটি প্রথমত প্রতিষ্ঠা করেছিল আমার ছাত্র এবং ছাত্রীরা, সেই হিসাবে কতকগুলো বিষয়ে তাদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য আছে। এই চিন্তার ঐক্য ভাঙা ঠিক হবে না। যেহেতু এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল এবং ভার্চুয়াল (যেখানে শারীরিকভাবে একত্র হওয়া হয় না) সংগঠন, কোনো এলাকা ভিত্তিক সংগঠন না, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি জায়গায় এরা ছড়িয়ে আছে, সে জন্য এটা শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমেই চলে। কাজেই শুরুতেই দশ-বারো বছর পর্যন্ত এর নেতৃত্ব থাকতে হবে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। এটা এই জন্য যে এখানে যাতে চিন্তার ঐক্যটা নষ্ট না হয়। এর সদস্য কাদের করা হবে সে বিষয়েও আমি তাদের বলেছিলাম। যদিও চূড়ান্ত লক্ষ্য আন্তর্জাতিক হওয়া কিন্তু প্রথম দিকে শুধু প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পরিচিতদের এবং তাদের মাধ্যমে যারা ইসলামী দাওয়াত পাবে তাদেরই এর সদস্য হওয়া উচিত যাতে প্রথম থেকেই খুব শক্তভাবে এ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে কারো কারো মনে হয়তো এই সন্দেহ জন্মেছে যে, আমি এটাকে সীমিত করছে চাচ্ছি। ফলে তা আন্তর্জাতিক হতে পারবে না। হতে পারে এটা তাদের একটা বিবেচ্য পয়েন্ট, কিন্তু আমি মনে করেছিলাম এবং এখনও করি যে, উইটনেস-পাইওনিয়ারের মূল বক্তব্যে ও এর আইডিয়াতে যদি কেউ ঐক্যমত্য পোষণ করে তাহলে নতুন লোক আনায় আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আর তা না করা হলে এই সংগঠনে সমস্যা হতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেছে পরবর্তীতে সমস্যা হয়েছে। তার ফলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট টানাপোড়নের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সেই টানাপোড়ন

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে দূর হয়েছে। তারা এও বুঝেছে যে, শুরুতে সংগঠনকে বাইরে ছড়িয়ে দেয়া বেশি সুবিধার হবে না। আমি এর গতি সম্পর্কে বলেছি, সারা বিশ্বেরই লোক নেয়া যাবে কিন্তু আস্তে আস্তে। শুরুতেই নেতৃত্ব অন্যের হাতে দেয়া ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত, জেন্ডার, একট্রিট্রিমিজমের এর মতো বিষয়গুলোতে একমত না হলে তাদের সদস্য করা ঠিক হবে না। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যাতে সংগঠনের চিন্তার ঐক্য থাকে, চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বা বিভক্তি না আসতে পারে।

আমেরিকা অবস্থানকালে ওয়াশিংটনে এএমএসএস-এর (AMSS) একটি সম্মেলনে যাই। সেখানে বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেলে আমি আর ইমরান দুই রাত ছিলাম। সেই সম্মেলনে আমার এবং ড. কবির হাসানের যৌথভাবে লিখিত একটি পেপার পড়া হলো। সেটা কবির হাসান উপস্থাপন করে। সম্মেলনের একটি সেশনে আমি সভাপতিত্ব করি। এএমএসএস হলো মুসলিম এসোসিয়েশন অব সোসাল সাইন্টিস। ইসলামই তাদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করে তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় গবেষণা করে। এটা বর্তমানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এটা একটা বড় সংগঠন এবং সবখানে তার লোক আছে। মূলত সেখানে রিসার্চ ও কনফারেন্সের কাজ বেশি হয়। সেই সাথে থাকে তাদের ন্যাশনাল কনভেনশন। এর সভাপতি তখন ছিলেন ড. মুমতাজ আহমদ। তিনি একজন পাকিস্তানী। তিনি বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সফর করে গেছেন। তিনি তাবলীগ জামাত, মাদরাসা সিস্টেম প্রভৃতি বিষয় স্টাডি করেছেন। এর জন্যেও তার বাংলাদেশে আসতে হয়। তার মতে ড. সোলায়মান নিয়াংগ (Soleyman Nyang) হচ্ছেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানী। তখনও আমি তাকে চিনতাম না। দেখতে আমার মতো হেংলা পাতলা। নাইজেরিয়ান। রঙে কালো - শুধু এই পার্থক্য। আমি তাকে বললাম, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ড. ওমর চাপরা যেরকম কাজ করেছেন সেরকম কাজ পলিটিক্যাল সায়েন্সে হয়নি। আমি তাকে এরকম কাজ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এবং ড. মুমতাজ রাজি হলেন এরকম কাজ করার জন্য এবং আমি আশা করি একাজ তারা করবেন।

এই সফরে উইটনেস-পাইওনিয়ার সংক্রান্ত অনেক কাজ হয়। আমার ফিরে আসার দুদিন আগে আমার এক ছাত্রী সাইয়েদা রাজিয়া সুলতানা এবং তার স্বামী মাহবুব রাজ্জাক (এখন তারা দুজনেই পিএইচডি শেষ করেছে) তারা কানাডা থেকে আসে। তারা দুজনই তখন কানাডায় পিএইচডি করছিল। তাদের সঙ্গে দুদিন অনেক আনন্দে কাটে। আসার দিন মাহবুব, ইমরান ও শিবলী আমাকে নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে পর্যন্ত গিয়ে বিমানে উঠিয়ে দেয়। আমি ঢাকা ফিরে আসি।

www.pathagar.com

কাজাকিস্তান সফর

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম' নামে গত শতাব্দীর সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে আমি একটি বই লেখি। সম্প্রতি বইটির ইংরেজি সংস্করণ বেরিয়েছে। সেটি বর্তমানে আমার Law Economics and History বইয়ের History অংশে সংযুক্ত আছে। সে বইতে কাজাকিস্তানের কথাও উল্লেখ আছে। গত ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে কাজাকিস্তান যাই। আইডিবির ২৮তম এই সম্মেলন কাজাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শহর আলমাতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি মোটামুটি জানতাম কাজাকিস্তান বিশ্বের নবম বৃহত্তম দেশ। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত এরপর কাজাকিস্তান। রাশিয়া ১৮৭০ থেকে ৭৬ এর মধ্যে কাজাকিস্তান দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সনে রাশিয়ার জারের পতন ঘটায় ক্রেমনোস্কির নেতৃত্বে ডেমোক্রেটরা। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সংহত হওয়ার আগেই পুনরায় বিপ্লব হয় সে বৎসরই। জারের অধীনে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাজাকিস্তান ছিল। এরপর কমিউনিজমের অধীনে ছিল ১৯৯১ সালের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত। তাদের কিছু তেল শিল্প ছাড়া তেমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই। সেখানে গমের উৎপাদন ভালো। বাকি সবই তারা আমদানী করে।

কাজাকিস্তানে জমি অনেক, মানুষ কম। সেখানে কৃষির সম্ভাবনা খুব ভালো। সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ মুসলিম, বাকি ৩০ ভাগ রাশিয়ান নন মুসলিম। জনসংখ্যার ৬০ ভাগই কাজাক। রাশিয়ান বসতকারী ৩০ ভাগ আর অন্যান্য ছোটখাট গোষ্ঠী মিলে ১০ ভাগ।

আসতানা এয়ার লাইন্সের পুরানা এয়ারক্রাফ্টে করে আমরা দুবাই থেকে আলমাতি যাই। প্লেনের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বিমান বন্দর থেকে ল্যান্ড করার পর যখন বেরিয়ে আসলাম তখন পথে কোনো মসজিদ দেখতে পেলাম না। পরে জানতে পারলাম সেই শহরে মোট ১৫টি মসজিদ আছে। আর গোটা কাজাকিস্তানে আছে ১৫০০ মতো মসজিদ। এই কথা আমাকে আলমাতি শহরের চিফ ইমাম জানালেন। আলমাতি শহরের প্রধান ইমামকে তারা বলে 'ইমামে শহর'। সেই ইমামের বয়স পয়ত্রিশের মতো। মুখে কোনো দাড়ি নেই। ইয়াং ম্যান। মাথায় বিরাট পাগড়ি। মুসলমানদের মুখে দাড়ি বেশি দেখা যায় সাধারণত আরব বিশ্বের কিছু এলাকায় এবং আমাদের সাবকন্টিনেন্টে। আরব বিশ্বের মধ্যে আবার সৌদি আরব, কুয়েত, ইয়েমেন এসব এলাকায় বেশি। সে তুলনায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া কিংবা উত্তর আফ্রিকায় দাড়ি কম দেখা যায়।

www.pathagar.com

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত যেতে যেতে কাজাকিস্তানে যে ইসলাম আছে তার কিছুই দেখতে পেলাম না। এটা আমার কাউকে নিরাশ করার জন্যে বলা নয়, এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থাটা। ইসলাম কোথাও আছে কি না তা বোঝার জন্য আমরা লক্ষ্য করি সেখানে মসজিদ আছে কি না, লোকজনের মুখে দাড়ি আছে কি না অথবা মেয়েরা হিজাব পড়ে আছে কি না। যে কেউ বাংলাদেশে এসে এসব দেখতে পাবে। এসব দেখেই তারা ইসলামী দেশ বলে আমাদেরকে সনাক্ত করে। সেখানে আমি মেয়েদের পশ্চিমা পোশাকে দেখেছি। তবে এটা ঠিক আলমাতি শহরের অর্ধেক রাশিয়ান। ছুটির দিন থাকায় রাস্তায় কম লোক ছিল। এর মধ্য যে কয়জন মেয়ে চোখে পড়ল তাতে বলা যায় প্রতি একশ জনের মধ্যে মাত্র দুই-তিন জন মেয়ের মাথায় স্কার্ফ আছে। মেয়েরা শার্ট প্যান্ট পড়া, ওড়না ছাড়া, বুকে অতিরিক্ত কাভার ছাড়া। সেখানে আমি ওড়না, হিজাব, দাড়ি, টুপি কিংবা লম্বা কাপড়ও দেখলাম না। এর দ্বারা আমি যে সেই সোসাইটি ইসলামিক কি আন-ইসলামিক তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং আমার মন বলল এখানে ইসলাম খুব দুর্বল।

আমি যে হোটেলে ছিলাম তার নাম হোটেল রিজেন্ট আলমাতি। এখানেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেশ সুন্দর হোটেল। সেখানকার জনগণের সাথে আমার আলাপ হয়। আমার একটা বইতে আমি লিখেছিলাম, ১৮৯৯ সালে কাজাক পপুলেশন ৩০ ভাগ হয়ে গেছে। এটা কমতে কমতে হয়েছে। কিন্তু গত দশ বছরের কাজাক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হোক আর রাশিয়ানদের চলে যাওয়ার কারণেই হোক আজকে কাজাক ৭০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসার পর জানতে পারলাম সেখানে মোটামুটি ২০ ভাগ মানুষ নামাজ পড়ে। রোজা আরো বেশি সংখ্যক লোক রাখে। এটা শুনে আমার কাছে সংখ্যাটা খুব একটা খারাপ বলে মনে হলো না। এসব দেখে একজন ইসলামিস্ট হিসাবে আমার মাথা তখন ঘুরছে এই ভেবে যে, এই দেশে ইসলামের কাজ কিভাবে করা যায়? আমি প্রথম নিশ্চিত হলাম কাজাকিস্তান অচিরেই ইসলামের পিলার হবে এরকম কোনো আশা নেই। পঞ্চাশ একশ বছর পর গিয়ে ইতিহাসের আলোকে বলা যায় এখানে হয়ত ইসলামের প্রচার-প্রসার হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কাজাকিস্তানের পক্ষে ইসলামের জন্য রোল প্লে করা সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হলো কমিউনিস্টরা গত একশ বছরে সেখানে এত বেশি ডি-ইসলামাইজড করে ফেলেছে যে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের অনেক সময় লাগবে।

আমি সেই সাথে আরেকটি জিনিস ভাবছিলাম। যদি এখানে ইসলামের জন্য কাজ করতে হয় তাহলে তার জন্য কি করতে হবে? আমি ভাবছিলাম, এরপর আমি সেখানকার কিছু কাজাক পুরুষ ও নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদেশের মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে কিনা? কেননা আমার মন বলল, যদি তারা ইসলামকে

www.pathagar.com

ভালোবাসে তাহলে ইসলামের জন্য কাজ করার ও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আশা আছে। আর যদি ভালো নাই বাসে তাহলে তো আশাই নাই। তারা মোটামুটি জানাল, তাদের প্রাকটিস যাই হোক, তারা ইসলামকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তারা তাদের আইডেন্টিটির ব্যাপারে সচেতন। তাদের বরং এই বিষয়ে অহমিকা যে রাশিয়ানরা গুড ফর নাথিং। তারা অনেক সুপিরিয়র। এই ধরনের মানসিকতা তাদের আছে। জাতীয়তা আছে। তাদের ভিতর কাজাক ও মুসলিম ফিলিংস আছে। স্বাধীনচেতা মনোভাবও আমি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করলাম। তখন আমার মনে একটা আশা জাগল যে, সেখানে কাজ করার অন্তত একটা ভিত্তি আছে।

আমি ডেলিগেট হিসেবে আসা অন্যান্য দেশের বন্ধুদের সাথে সেখানে কিভাবে কাজ শুরু করা যায় সে ব্যাপারে আলাপ করলাম । আমি জানি এখানে নামাজ পড়ার কথা বলে কাজ শুরু করা যাবে না। আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে সামনে আগাতে হবে। আমার মনে কোনো সাহসই নাই যে, আমি তাদের হিজাব তো দূরের কথা নামাজের কথা বলব, তোমরা নামাজ পড়। তা করাও আমার কাছে কঠিন বলে মনে হলো। তবে আমার মন একটি বিষয় নিয়ে দাওয়াত শুরু করার কথা বলল। যেই কাজ করুক না কেন, অন্তত এটা বলতে পারে, তোমরা নিজেদেরকে যে মুসলিম বল এবং ইসলাম নিয়ে গর্ব কর, তাহলে অন্তত পক্ষে কোরআন শরীফ তোমরা পড়ে ফেল। এতে যদি শতকরা মাত্র একজনও সাড়া দেয় তাহলেও এই এক ভাগই ভিত্তি হবে যারা বাকি ৯৯ জন মানুষকে আস্তে আস্তে ইসলামের কথা বলবে। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এখানে তাৎক্ষণিক ফলাফলের কোনো অবকাশই নাই। আমাদের দেশের মানুষ কত রকম দাবি করে বসে কিন্তু আমরা ভাবতেই পারি না পরিস্থিতির কারণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কি রকম পরিবর্তন হয়ে যায়। মালয়েশিয়ায় মুসলিম অমুসলিমদের যেরকম সহ অবস্থান দেখেছি - সেখানে মুসলিমরা হিজাব পড়ছে অমুসলিমরা ওয়েস্টার্ন পোশাক পড়ছে, তাতে আমি বুঝেছিলাম যে জোর করে কোথাও ইসলাম করা যাবে না। এই কথাটিই কাজাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে জোর করে ইসলাম করার আর কোনো অবকাশ নাই। মানুষকে ডেমোক্রেসির অধীনে রাখতে হবে। সবাইকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সেখানে মূল কাজ হবে শিক্ষা ও দাওয়াত। এর জন্য কারা এগিয়ে আসবে আর কারা আসবে না তার জন্য আসল বিচারক আল্লাহতায়ালা তো আছেনই। সব কিছুর বিচার তো দুনিয়াতে হবে না। কিন্তু আমরা কেন দুনিয়াতে সব কিছুর বিচার চাই? আল্লাহতায়ালা আখেরাত তো এজন্যই রেখেছেন যে, যারা অন্যায় করবে সেখানে তাদের শাস্তি দেবেন। মালয়েশিয়া থেকে আসার পর আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে, জোর করে ইসলাম করার কোনো সুযোগই নেই। আর কাজাকিস্তান সফরে এসে বুঝলাম, সেখানে এর কোনো সম্ভাবনাও

www.pathagar.com

নেই, যদি না আল্লাহ কোনো সুযোগ সেখানে দান করেন তা ব্যতীত।

এটা আমার জীবনের একটা নতুন শিক্ষা ছিল। ইসলাম সম্পর্কে বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা এই অঞ্চলে আমরা যেরকম ভাবছি তা সব দেশের জন্য স্ট্রাটেজি নাও হতে পারে। স্ট্রাটেজি আমেরিকার জন্যও এক হতে পারে না। আমরা পড়েছি, strategy and policy cannot be same. পরিস্থিতি বুঝে স্ট্রাটেজি এবং পলিসি পরিবর্তিত হবে। সেখানে কাজাকিস্তানের পলিসি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। সেখানে বাংলাদেশের মতো পলিসি গ্রহণ করা যাবে না। সেখানে বেশ কিছু ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে। কিন্তু তাদের সেভাবে কাজ করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তাদেরকে মসজিদের বাইরে কাজ করতে দেয়া হয় না। নানা ধরনের বাঁধা সেখানে আছে। এর থেকে উজবেকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো। তবে এটা একটা বিপ্লব যে, যে দেশে ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে কোনো একটা সম্মেলন হয়নি, সেখানে আল্লাহর নাম দিয়ে প্রথমবারের মতো আইডিবি'র সম্মেলন শুরু হয়েছে। তারাও আজ ওআইসির সদস্য। প্রশ্ন হলো, তাদের ভিতর কোনো না কোনো চেতনা কাজ না করলে তারা ওআইসিতে আসবে কেন? তার রেজাল্ট হিসাবে এবারের ২০০৩ সালের আইডিবি সম্মেলন হয়েছে আলমাতিতে এবং প্রত্যেকটি সেশন কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে। গত সত্তর বছর যা হয়নি তাই এবার হয়েছে। আরো লক্ষণীয় ছিল, যিনি সেই দেশের প্রেসিডেন্ট তিনিও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে বক্তৃতা শুরু করেছেন, যিনি একজন প্রাক্তন মার্কসিস্ট এবং প্রাক্তন কমিউনিস্ট। তিনি আগেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এখনও প্রেসিডেন্ট। তিনিও তার বক্তৃতায় মুসলিম উম্মাহর কথা বলেছেন। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরকার বলেছেন।

কাজাকিস্তানের অবস্থা দেখে আমার মন খুব খারাপ ছিল। না খেতে পারছি, না দাঁড়াতে পারছি। পরিস্থিতির এতটা কল্পনা করিনি। মন অস্থির হয়ে আছে। সেখানে একটা কাজাক মেয়েকে পেলাম যে সম্পূর্ণ হিজাবে আবৃত ছিল। ভাগ্যক্রমে আমার পাশেই এসে সেই ইয়ং মেয়েটি বসল। ইনভেস্টমেন্টের উপর সেমিনার হচ্ছিল। আমি সুযোগ পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মতো কয়টা মেয়ে হিজাব পড়ে। সে নিজেই মাত্র এক বছর আগে হিজাব শুরু করেছে বলে জানাল। মেয়েটি ইংরেজি জানে। তবে ভালো ইংরেজি জানে না। সে জানাল আস্তে আস্তে হচ্ছে। সে আরো জানাল সেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। সে দেশে হঠাৎ করে ইসলাম আসবে না, ধীরে ধীরে হবে।

ড. গুলিরা নাজার বায়েক নামে এক মহিলার সাথে দেখা হয়। আমি আমার Social Laws of Islam বইটির পাঁচটি কপি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বইয়ের চারটা কপিই

www.pathagar.com

বিলি হয়ে যায়। পঞ্চম কপিটি সেখানকার এক রিসিপশনিস্ট মেয়েকে দেব বলে ঠিক করেছিলাম, তার নাম নাজ গুল। আমি সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে চা খাচ্ছিলাম। বইটি আমার হাতে দেখে সেই মহিলা ড. গুলিরা সরাসরি বইটি চেয়েই বসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বইটি আমি কোথায় পেয়েছি? আমি যেই বললাম, বইটি আমার লেখা, তখন তিনি বললেন বইটি আমাকে দিয়ে দিন। পঞ্চম কপিটি তাকে দিলাম। চিন্তা অনুযায়ী সেই মেয়েটিকে আর দিতে পারলাম না। সেখানে আমি বই নিয়ে যাওয়ার যে কি বেনিফিট তা বুঝতে পারি।

ইসলামের কাজে দাওয়াতের জন্য প্রচণ্ড মন থাকতে হয়। সেটা আসলে আমাদের অনেকের মধ্যে নেই। আমরা এটা বুঝতে পারি না যে একটা শক্তিশালী বোধ ও কার্যকরী দাওয়াতী মন আমাদের নেই। আমি ইচ্ছা করে পাঁচটি কপি নিয়েছিলাম, বেশি নিলে যদি সেখানকার কাস্টমস ধরে সে ভয় আমার ছিল। যাওয়ার পথে দুবাই এয়ারপোর্টে ১২ ঘন্টা থাকতে হয়। সেখানে এক আফ্রিকান যুবকের সাথে দেখা হয়। সে সোমালিয়ার ছেলে। ইংল্যান্ডে জন্ম হওয়ায় সোমালিয়া সম্পর্কে ভালো করে বলতে পারবে না বলে আমাকে জানালো। তার ঈমান বেশ মজবুত বলে লক্ষ্য করলাম। সে ইসলামকে সাংঘাতিক ভালোবাসে। কিন্তু সে ইসলামের বই পড়েনি। সাইয়্যেদ কুতুব, হাসান আল বান্নার নামও জানে না, যদিও তার জানার কথা ছিল। তাকে আমি ইসলাম, মুসলমান সম্পর্কে বললাম এবং ওয়াদা করালাম ইসলামের উপর পড়াশুনা ও কাজ করার জন্য। তাকে অনুপ্রেরণা দিলাম খুব। সে বলল, ইনশাআল্লাহ আমি করব, আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি। আমি তাকে আমার বইয়ের প্রথম কপিটি দিলাম। এর জন্য আমি আবার বলি আমাদের একটা প্রচণ্ড দাওয়াতী মন থাকতে হবে। সেটা কিন্তু বাস্তবে আমাদের নেই। আমরা ইসলামের জন্য খুব কম কাজ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতকে আমার জীবনের সাথে মিশিয়ে ফেলেছি। ফলে দাওয়াতের জন্য আমাকে আলাদা করে পরিকল্পনা করতে হয় না। এটা আমার জীবনেরই একটা অংশ। আমার সাথে একটা ফাইল সব সময়ই থাকে। যেখানেই সুযোগ পাই তার ভিতর থেকে অবস্থা বুঝে কাগজ-পত্র বিতরণ করি। আমাদের দাওয়াতী মানসিকতা থাকতে হবে। কোনটা ভালো মেটেরিয়াল, কোনটা ভালো নয় সে পার্থক্য করার বোধ আমাদের থাকতে হবে।

মস্কোতে থাকেন এমন একজন আজারবাইজানি মুসলিম ব্যাংক অফিসারও জানালেন সেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ ছিল। অগ্রগতির জন্য সময় লাগবে। কাজাকিস্তান সফরে গিয়ে আমি প্রথমে শক্‌ড হয়েছি। কাজাকিস্তান যে এতটা ডি-ইসলামাইজড তা আগে বুঝিনি। কোনো মুসলিম কান্ট্রি এতটা ডি-ইসলামাইজড তা আগে দেখিনি। আমি

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে ইসলামের আলোকে খারাপ মনে করি। কিন্তু কাজাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশকে জান্নাতুল ফেরদৌস বলতে হবে। এ জন্য পরিপ্রেক্ষিতের (পারসপেকটিভ) বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থান থেকে আমি দেখছি তা গুরুত্বপূর্ণ। কাজাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ দেখলে মনে হবে বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদৌস। আর রাসূলের সময়ের মদিনা থেকে দেখলে মনে হবে এখানে দুষ্টতে ভরা। এজন্য আমরা আমাদের জাজমেন্ট কোত্থেকে করছি তা বুঝার বোধও আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। তাই কাজাকিস্তানে কয়েক পারসেন্ট মেয়ে যদি হিজাব পড়ে তাহলে আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যেন বাস্তববাদী হই। আমরা যেন বুঝতে শিখি। আমরা সব কিছুকে যেন খারাপ না বলি আবার সব কিছুকে যেন ভালো না বলি। বাংলাদেশের সব খারাপ এটা আমাদের বলা উচিত নয়। আবার কাজাকিস্তানের সব খারাপ তাও বলা ঠিক না। আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ঈমান দেখবেন। কমিউনিস্ট ডিক্টেটরের অধীনে তারা যে তাদের ঈমানকে টিকিয়ে রেখেছে তাই তো অনেক। আমরা বাইরের দিক দেখে বিচার করে অভ্যস্ত। আমি তাদের হিজাবকে দেখেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাজমেন্ট অনেক গভীর হতে হবে।

সেজন্য কাজকিস্তানে ইসলামের জন্য কাজ করতে প্রত্যেক মুসলিম দেশের দূতাবাস সেখানে খোলা উচিত। আমি জানি একটা এম্বেসি খোলা যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। কিন্তু সে খরচও খুব বেশি নয়, বড়জোর বছরে দুই কোটি টাকা। সেখানে বাংলাদেশেরও দূতাবাস খোলা উচিত। পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব সেখানে দূতাবাস খুলেছে। সেই সাথে আমাদের ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের বলব তাদের সে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া উচিত। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করা একদম ফ্রি। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ রয়েছে। সেখানে ব্যবসায়ীরা গেলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। আমাদের দেশে যেমন সূফি, ব্যবসায়ীরা ইসলাম প্রচার করেছে সেখানেও সে দেশের ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবসায়ীরা দায়িত্ব নিতে পারে। ব্যবসার জন্য উম্মুক্ত বলে একজন ব্যবসায়ী সেখানে একটা অফিস খুললে সেটা সে দেশের মুসলমান জনগণের অগ্রগতিতে সহায়ক হবে। পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যমেই কাজ আগাবে। সেখানে তাড়াহুড়োর কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশেও আমাদের অধৈর্য হওয়া ঠিক নয়। আমাদের কাজ বেশি করতে হবে এবং হিকমত প্রয়োগ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সব খারাপ হয়ে যাবে। তার মানে এই না যে, অযোগ্যতার কারণে আমরা দেরি করি। তার জন্য যোগ্যতা বৃদ্ধি করে আমাদের আউটপুট বাড়ানোর দরকার।

www.pathagar.com

কাজাকিস্তানে পারমাণবিক প্রকল্প আছে কিন্তু তা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। টুডে অর টুমরো বিশ্বে নিউক্লিয়ার পাওয়ার থাকবে না। সে হিসাবে কাজাকিস্তানে সেই পারমানবিক প্রকল্প তাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও সমস্যা নেই। সেখানে রাশিয়ান এবং কাজাকদের মধ্যে একরকম টেনশন কাজ করে। সরকারি কাজ কাজাকরা পায়, রাশিয়ানরা পায় না। প্রাইভেট সেক্টরে আবার রাশিয়ানরা বেশি যোগ্য হওয়ায় বেশি সুযোগ পায়। আমার যতটুকু মনে হয়েছে, কাজাকরা রাশিয়ানদের সাথে একটা সম্পর্ক রেখেই চলতে চায়। একে তো জনসংখ্যার ৩০ ভাগ রাশিয়ান, আবার রাশিয়া প্রতিবেশি।

সেখানে যে সমস্ত ইসলামিক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়ার সুযোগ আমার হয়নি। কাজাকিস্তানে ইসলামের কাজ এগিয়ে নিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মুসলিম দেশে কাজাক স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দিতে হবে। এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার অনেক সুযোগ আছে।

বৃটেন সফর

আমি যুক্তরাজ্যে চারবার যাই। প্রথমবারের কথা ইতোমধ্যে এসে গেছে অন্য এক অধ্যায়ে। সেটা ১৯৯২ সালের কথা। ১৯৯৬ সালে আমি আবার যাই। সেবার সেখানে তেমন থাকা হয়নি। ১৯৯৮ ও ২০০০ সালের ভ্রমণ আমার জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বৃটেনে Uk Islamic Foundation নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বের যে কয়টি প্রধান ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বা সেন্টার আছে এটা তার মধ্যে অন্যতম। এটি সম্ভবত বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। তিনি এক সময় পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম নেতা এবং বিশ্বের প্রথম সারির একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। এই ফাউন্ডেশন প্রথমে লেস্টার শহরে ছিল। পরবর্তীতে সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্কফিল্ড নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এর পরিবেশ খুব সুন্দর। বহু বিঘা জমির উপরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে এরকম সৌন্দর্য কল্পনাই করা যায় না। ইউকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। পরবর্তীকালে এর মহাপরিচালক হন আমারই আরেক বন্ধু এবং মুরব্বী খুররম জাহ মুরাদ সাহেব। তিনি কয়েক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পাকিস্তান পড়াশুনা করার পর মিনিসোটা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমএস করেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর নেতা ছিলেন। খুররম জাহ মুরাদের পর

www.pathagar.com

বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন মানাজির আহসান। তিনি আমাদের রাজশাহীর ছেলে। বৃটেনে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আছেন।

লেস্টারে একটি সপ্তাহব্যাপী ওয়ার্কশপে অংশ নেয়ার জন্য ড. মানজির আহসানের আমন্ত্রণ পাই। সেই ওয়ার্কশপ অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের উপর ছিল। আমাকে একটি বিষয় দেয়া হয়। আমার বিষয় ছিল Can Islamic Economy Solve the Financial Crisis? অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি কি ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দূর করতে পারে? গত কয়েক বছর ধরে তারা ওয়ার্কশপ নিয়মিতই করে আসছেন। তারই একটা বার্ষিক প্রোগ্রাম ছিল ১৯৯৮ সালেরটি। আমাকে ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারম্যান হিসাবেই দাওয়াত দেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংক সে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য যাওয়া-আসার টিকেট দেয়। বাকি খরচ লেস্টারের কর্তৃপক্ষই বহন করেছে। সেই সাথে আমার বন্ধুরা যারা লন্ডনে আছে তারা অনুষ্ঠানের অন্যান্য দিকগুলো সহযোগিতা করেছিল।

সেমিনার পেপার তৈরি করা সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এই বিষয়টি নির্বাচনের কারণ ছিল। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরাট আকারে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যার ফলে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক আকারে সংকট দেখা দেয়। সেই সময় তাদের অর্থনীতিতে এমন ধ্বস নামে তাতে তাদের মুদ্রামান বিপুলভাবে হ্রাস পায়। তাদের বেকার সংখ্যা বেড়ে যায়, জিডিপি কমে যায়। একই সময় ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য কিছু স্থানেও অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। ঐ সব সংকটের আলোকেই আমাকে বিষয়টি আলোচনা করতে বলা হয়, আবার যেহেতু এককালে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ছিলাম।

আমি লেখাটি লিখব বলে সম্মত হই। মনে করলাম, লেখা খুব সহজ হবে। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম আমি কিছুই লিখতে পারছি না। আমার স্মরণ আছে, এই বিষয়টি লেখার জন্য আমি পুরো ছয় মাস ব্যয় করি। বিভিন্ন আলেমদের সাথে আলাপ করি। অবাক হয়ে গেলাম, কোনো আলেমই ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসই বোঝেন না। তাদের সাথে Inflation, Devaluation, Monitory policy, Monitory crisis প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমার বন্ধু-বান্ধব আলেমদের সাথে আলাপ করে দেখলাম তারা আমাকে কোনো দিক নির্দেশনা দিতে পারছেন না। তারা দিবেনই বা কিভাবে, তারা যে এসব সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না। কেন অর্থনীতিতে ধ্বস নামে সে জিনিসগুলোই জানেন না। এর থেকে আমি চিন্তা করলাম, আধুনিক বিশ্বকে আলেমরা নেতৃত্ব দেবেন কিভাবে যদি তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশোধন না আনেন। বিশেষ করে, অর্থনীতিকে যদি তারা তাদের মাদরাসা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

না করেন। তাহলে কি করে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হবে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের অফিসারদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলাম। আমি কতগুলো বিষয় বোঝার জন্য যাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম তার মধ্যে একজন হলেন জনাব নজরুল হুদার। তিনি তৎকালীন সময়ে আইএমএফ এর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে কাজ করতেন, পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হয়েছিলেন। একজন হলেন, আমার এক বন্ধু ড. কুকসন। আমি তার সাথেও আলাপ করি। সবার সাথে আলাপ আলোচনার উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত আমি নিজের আইডিয়ার আলোকে একটা পেপার খাড়া করি। লেখাটি সেখানে পড়ি এবং তা দেশে রিসার্চ ব্যুরোর ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। আসলে কাজটা আমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল। প্রথমে যতটা সহজ বলে মনে করেছিলাম ততটা সহজ ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে পৌছেছিলাম। ড. বারী আমাকে রিসিভ করলেন। তিনি সেখানে কিছু প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। সেগুলোতে শরিক হই। লেস্টার থেকে আমাকে সেখানকার আয়োজকদের লোকজন নিতে আসলেন। তারা পথে পাকিস্তান জামায়াতের আমীর কাজি হোসাইন আহমদের ছেলে ড. কাজি লোকমানকেও এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করেন। ড. লোকমানের সাথে পথে আমার অনেক কথা হলো। তিনি পাকিস্তান থেকে নয় অন্য কোথাও থেকে এসেছিলেন। তার সাথে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয় ও মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়। লেস্টারের অনুষ্ঠান ছিল তিন দিনব্যাপী। আমি একটি সেশনের চেয়ারম্যান ছিলাম। সেখানে পেপার পড়লেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ। আমি যে সেশনে পেপার পড়লাম তার চেয়ারম্যান ছিলেন ড. ওমর চাপড়া। সেখানে ড. ওমর চাপড়া, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. মুনওয়ার ইকবাল সহ আরো অনেকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। আমন্ত্রিতরা ছিলেন দশ-বারোটি দেশের প্রায় ত্রিশজনের মতো। যারা সবাই ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত। খুব উন্নত পর্যায়ের প্রোগ্রাম ছিল সেটা। আমার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন ইসলামী ব্যাংকের জনাব তাজুল ইসলাম সাহেব।

সেখানে ড. ওমর চাপড়া ও প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সাথে আলোচনার সময় ড. মানাজির আহসান সঙ্গে ছিলেন। সেখানে আমি কতগুলো কথা বলি। বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরি। প্রফেসর খুরশীদ আহমদ গুরুত্ব দিয়েই সেসব বিষয়ের সাথে একমত হন এবং বলেন এ পথেই আমাদের কাজ করতে হবে। তার সাথে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কথা বলি। মেয়েদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া জরুরী। সেটা ইসলামের জন্য

www.pathagar.com

কল্যাণকর হবে। ইসলামেই সে সুযোগ আছে মেয়েদেরকে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে তাকে বলি আমাদের পূর্ববর্তী কোনো কোনো নেতা যেসব বই লিখে গেছেন তার মধ্যে জেন্ডার ইস্যুকে সবক্ষেত্রে তারা যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি বলে আমার মনে হয়। তিনি আমার কথা বুঝতে পারেন। তাকে বললাম, তাদের লেখায় যেসব বিষয় বাদ আছে তার সমালোচনা না করে দরকার সেসব বিষয়ে নতুন বই লিখে ফেলা। তিনি বললেন, এ কাজটি করতে হবে এবং আমি করছি। তিনি জানালেন, খুররম জাহ মুরাদ সাহেব জীবিত থাকাবস্থায় সেই কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সেটা করে যাবেন।

তখনও ১১ সেপ্টেম্বর ঘটেনি। তবু আমি বলেছিলাম, আমাদের জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য পরিষ্কার করতে হবে। সেখানে এক্সট্রিমিজমের কথা বলেছিলাম। এর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে বলেছিলাম। বিশ্বব্যাপী এটা একটা সমস্যা। বোধহয় একথাও বলেছিলাম, ইজতিহাদকে এগিয়ে নিতে হবে। যারা যোগ্য তারাই ইজতিহাদ করবেন। এছাড়া কোনো সমাধান নাই। আমি মনে করি, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাই সেগুলোকে তার সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমার মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালে আমি যখন পাকিস্তানের মনসুরাতে জামায়াতে ইসলামীর হেড কোয়ার্টারে যাই তখনও কাজী হোসাইন আহমদের কাছে একথাগুলো তুলে ধরেছিলাম।

ইউকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি সুন্দর লাইব্রেরি আছে। সেখানে থাকা, খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা আছে। সেখানে সিস্টেমই এমন যে সবাই ফজরের নামাজে উপস্থিত হয়। সেখানে আমি কয়েক ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করি। সবাই কোনো না কোনো ওয়াক্তের নামাজে ইমামতি করে। সেখানে নাইজেরিয়ান এক স্কলারের সাথে আমার দেখা হয়, তাকে খুবই উচ্চ পর্যায়ের স্কলার বলে মনে হয়েছিল। আলজেরিয়ান একজন অর্থনীতিবীদের সাথে দেখা হয়, তাকে খুব সিনসিয়ার ইকোনোমিস্ট বলে মনে হয়েছিল।

আমার এক ছাত্র হাসান শহীদ থাকতো শেফিল্ডে। বর্তমানে ডক্টরেট করে ফেলেছে। তখন সবে মাত্র শেফিল্ডে পিএইচডির জন্য আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপলাইড ফিজিক্সের লেকচারার ছিল। আমি লন্ডনে যাওয়ার আগে তাকে জানালে সে বলল, আপনাকে শেফিল্ডে আসতে হবে এবং শেফিল্ড ইসলামিক সেন্টারের মসজিদে বক্তৃতা দিতে হবে। আরো বলল, আমাকে সেখানে জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাটি দিতে হবে। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমার প্রিয় ছাত্রের আশা আমাকে এমন এক বক্তৃতা দিতে হবে যেটা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে। ফলে বিষয়টি আমার মনে ছিল।

www.pathagar.com

শেফিল্ডে পৌছানোর আগে যখন লন্ডন গেলাম সেখানেই আমি একটা বক্তৃতার খসড়া করে ফেললাম। How to build a strong Muslim Ummah - এই ধরনের একটা বক্তৃতা দেব বলে খসড়াটি ইমেল করে পাঠিয়ে দিলাম আগেই। আর এটা ঠিক হলো যে, সে লেস্টারে এসে সে আমাকে নিয়ে যাবে। সেইভাবে আমার যেদিন প্রোগ্রাম শেষ হলো হাসান শহীদ সেদিন লেস্টারে চলে আসে। লেস্টার থেকে ট্রেনে করে শোফিল্ড গেলাম। সেটা ছিল প্রায় দু'শো মাইল আর দু'তিন ঘন্টার রাস্তার জার্নি। সেটাই আমার বৃটিশ রেলওয়ের প্রথম ভ্রমণ। হাসান শহীদ একটি মসজিদের দোতালায় একটি রুম নিয়ে থাকত। তখনও সে বিয়ে করেনি। ইউরোপের অনেক মসজিদেই মসজিদকে আবাদ রাখার জন্য কিছু রুম তৈরি করে নেয়া হয়। এতে মসজিদের ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। আমরা সেখানেই উঠলাম। আমার সাথে তাজুল ইসলাম থাকায় রাতে সে এবং হাসান শহীদ নিচে এবং আমি উপরে থাকলাম। হাসান শহীদই রান্না করে খাওয়ালো। সেখানে দুই রাত থাকলাম। প্রথম দিন সে তার ইউনিভার্সিটি দেখাতে আমাদেরকে নিয়ে যায়। শেফিল্ডও ঘুরে দেখলাম। এই ঘোরাঘুরির মধ্যেই সে ও তার এক বন্ধু আমাদের সাথে ছিল। দু'জনে শেফিল্ডের কমিউনিটির জন্যে কি করা যায় তার একটা পরিকল্পনা করে নেই। সন্ধ্যার পর আমি আমার বক্তৃতাটি দিলাম। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। সেই বক্তৃতার লিখিতরূপ এখন ইন্টারনেটেও (www.witness-pioneer.org) পাওয়া যায়। সেই বক্তৃতায় আমি মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তার কথা বলেছিলাম। পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংকট ও চ্যালেঞ্জটা কি এবং সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা ও তার চ্যালেঞ্জটা কি সেই বিষয়ে বলেছিলাম। আমাদের যে আবার সামরিক শক্তি গড়ে তোলা দরকার, শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা দরকার, অর্থনীতিকে গড়ে তোলা দরকার, পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার সেসব বিষয়ে আমি সেখানে আমার মতামত ব্যক্ত করি। সেই সাথে জেন্ডার ইস্যুর বিষয়ে নারীদের সম্মান ও গুরুত্ব দেয়ার কথাও আলোচনা করি।

সেখানে কিছু ছাত্রের সাথে আমার যোগাযোগ হলো। তাদেরকে আমি সাধ্যমতো বোঝাবার চেষ্টা করি। তখনকার যে পরিস্থিতি তার আলোকে কিছু প্রশ্ন ছিল। শিয়া-সুন্নীর বিরোধকে বড় করে দেখার বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম, এটা একেবারেই মারাত্মক। সেটা পাকিস্তান থেকে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল। তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ ২০০২ সালে এসে এই বিরোধ অনেক কমে আসে। যেমন পাকিস্তান যে চারটি দল যৌথভাবে তাদের বিগত নির্বাচনে জিতল আর মধ্যে একটি হচ্ছে শিয়া গ্রুপ আর বাকি তিনটি সুন্নী গ্রুপ। আলহামদুলিল্লাহ, এটাও একটা বড় ব্যাপার। তখন তাদের আমি সেই পরিস্থিতির আলোকে বলার চেষ্টা করলাম।

www.pathagar.com

তখনও আমি গণতন্ত্র দিয়ে কিছু হবে না, অস্ত্র নিতে হবে - এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলাম। এর প্রেক্ষিতে আমি খুব বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এটা একেবারেই মারাত্মক পথ। এটা ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস নয়। সন্ত্রাস কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি একটি ইসলামিক পদ্ধতি। জনগণের পছন্দের সরকার - এটা ইসলামের কনসেপ্ট। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা নয়– এটা আমাদের বুঝতে হবে। ইসলামী দেশে যে গণতন্ত্র হবে সেটা আল্লাহর আইনের অধীনেই হবে। আল্লাহর আইনও মানা হবে গণতান্ত্রিক সরকারও হবে। এটাকেই ইসলামিক গণতন্ত্র বলা হয়। আমি এভাবেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা দিলাম। সেখানে উপস্থিত মালয়েশিয়ান ছাত্ররা তাদের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল। তারা তাদের সরকারের নীতির সমালোচনা করল। সেগুলোকে আমি মনে করি যথার্থই ছিল। আনোয়ার ইবরাহীমের প্রতি সরকার সুবিচার করেনি। মাহাথির-আনোয়ারের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তখন তাদের বলেছিলাম, Let us see what happen - বাকি তো আল্লাহর হাতে। এখন তো কিছু করা যাবে না। কিন্তু ultimately Anwar will be victorious and Anwar will one day be the Prime Minister of Malaysia - আজকে তাদের অবস্থা যাই হোক না কেন। আসলে ইতিহাসই প্রমাণ করবে কি হবে আর কি হবে না। এগুলো তো কারোর হাতে নয়।

শেফিল্ড থেকে আমি আর তাজুল ইসলাম বাসে করে লন্ডনে ফিরে আসলাম। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো হাফেজ মুনিরউদ্দিন আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে কয়েক ঘন্টা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আটানব্বইয়ের পর ২০০১ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে এবং ফিরে আসার পথে আবার লন্ডন গেলাম। আমি দু'টি আইডিবি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। একটি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ২০০০ সনে এবং অন্যটি ২০০১ সনে আলজিয়ার্সে। এগুলো ছিল আইডিবির বার্ষিক সম্মেলন। এখানে আইডিবির গভর্নেসরা শরিক হন। আইডিবির গভর্নেসরা হচ্ছেন বিভিন্ন মুসলিম দেশের ফাইন্যান্স মিনিস্টাররা। আর তাদের নাম্বার টু হচ্ছেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নররা।

লেবাননে তিনটি এলাকা। সাউথ হচ্ছে শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা। নর্থ সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। সমুদ্র তীরবর্তী মধ্যবর্তী এলাকা প্রধানত মিশ্রিত জনসংখ্যা। তবে খৃস্টান বেশি। লেবাননে যতটুকু বুঝলাম একটি ইসলামী জাগরণ সেখানে হচ্ছে, সাউথ এবং নর্থ দুইখানেই। কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলে আধুনিকতার

www.pathagar.com

সয়লাব এবং পাশ্চাত্যেরই প্রভাব লক্ষ্য করলাম। এখানকার ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে দেখা হয় লেবাননে ক্রমেই ইসলামের প্রতি সচেতনতা বাড়ছে। আমি সেখানেও বিভিন্ন ডেলিগেটদের মধ্যে আমার নিয়ে যাওয়া বইগুলি বিতরণ করি। কনফারেন্সে আমরা মূলত অবজারভারই ছিলাম। বেশি অংশগ্রহণের সুযোগও নেই। পরের বছর যখন আলজেরিয়া গেলাম সেখানেও একই রকম। কনফারেন্সের নিয়ম হলো প্রথমে একটা বিরাট রিপোর্ট পড়া হয়। সেটা উপস্থাপন করেন আইডিবির প্রেসিডেন্ট। রিপোর্টের উপর আলোচনা হয়। এরপর নির্বাচন হয়। নতুন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। তারপর পরবর্তী কনফারেন্সের স্থান ঠিক করা হয়। ব্যাংকের হিসাব নিকাশ পেশ করা হয়। একই সাথে একটা অনুষ্ঠানে আইডিবি প্রাইজ দেয়া হয়। আরেকটি সেমিনার হয় উচ্চ পর্যায়ের। সেখানেও আলোচনা হয়। আলজেরিয়ার সেমিনার পেপার পড়েছিলেন বিজে হাবিবি, ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। পেপারটি ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রডাক্টিভিটির উপর। পেপারটি খুব উন্নত ও সুন্দর ছিল। এর সমস্যা এবং করণীয় বিষয়গুলো ছিল তার মধ্যে। আইডিবি কনফারেন্সের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কনফারেন্স হয়। সেখানে ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটা আলাদা সংগঠন আছে। তেমনি অডিটিং এন্ড একাউন্টিংয়ের জন্য আলাদা সংগঠন আছে। সেখান তাদেরও আলাদা সম্মেলন হয় এবং তারা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এইগুলো একই সময়ে চলতে থাকে।

বৈরুত সম্মেলনে অতটা না বুঝলেও আলজিয়ার্স সম্মেলনে বুঝলাম আইডিবি সত্যি খুব শক্তিশালী। ওআইসি যদিও একটা বড় সংগঠন, যদিও তার পলিটিক্যাল সফলতা আমরা খুব বড় কিছু দেখি না, সেটাকে দুর্বল বলেই মনে হয়। আর এর কারণ হলো মুসলিম শাসকরা এটাকে শক্তিশালী করছে না। ওআইসি শক্তিশালী হবে না যদি না মুসলিম সরকারগুলো এটাকে শক্তিশালী না করে। সরকারগুলো কেন তা করছে না– হয়তো কারোর ইশারায়। অন্য কোনো বড় শক্তির প্রভাবে এই দিকে নজর দিচ্ছে না যেটা আমরা ভুল করছি বলে আমি মনে করি। কিন্তু সেই তুলনায় আইডিবি শক্তিশালী এবং তার কাজকর্ম ব্যাপক। বিশেষ করে, আফ্রিকায় তা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। এশিয়ার দেশগুলোতেও তাদের ভালো কাজ দেখা যায়। কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক, বাংলাদেশ হয়ত তার বেনিফিট অতটা পাচ্ছে না যেটা পেতে পারে, আমরা যদি সেরকম খুব উঁচু মানের স্কিম নিয়ে যাই এবং সাবমিট করতে পারি– তাতে না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশ সরকার যদি এটাকে গুরুত্ব দেয় তাহলে কেন পাবে না সেটা আমার বুঝে আসে না। কারণ রিপোর্টে দেখলাম, প্রত্যেক আফ্রিকান কান্ট্রিতে তাদের প্রায় তিনটা চারটা করে

www.pathagar.com

প্রজেক্ট আছে। তাহলে আমাদের দেশে এটা হতে পারবে না কেন? আইডিবি তার ক্যাপিটালও (Capital) বাড়িয়ে নিয়েছে। আমার মনে আছে সেখানে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, তাদের ফান্ডের কোনো অভাব নেই। আরব বিশ্বের যে কোনো পরিমাণ ফান্ড আমরা পেতে পারি। কিন্তু প্রজেক্ট মূল্যায়ন (Evaluation) করার মতো আমাদের ভালো ব্যবস্থা নেই। এই কথাগুলো আমার যুক্তরাজ্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে এসে গেল।

যাই হোক, আল জেরিয়া যাওয়ার পথে আমি ইউকে যাই। সেখানে ড. হাসান শহীদ ও আমার আরেক ছাত্র মাহমুদুল হাসান আমাকে রিসিভ করে। হাসান শহীদের ততদিনে পিএইডি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা ছিল। ঠাণ্ডাও ছিল প্রচুর। যেহেতু আমার ঠাণ্ডার রোগ আছে ফলে তাদের বাসাতেই থাকলাম। গল্পগুজব করে কাটালাম। কোথাও আর বের হইনি। তাদের সঙ্গে আমি ইউকে সহ মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। উইটনেস-পাইওনিয়ারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। সামনে কি করা যেতে পারে তাও আলাপ হয়। বিশ্বের বিভিন্নস্থানে টেলিফোনে কথা বলি। পরের দিন তারা আমাকে হিত্রো এয়ারপোর্ট পৌছে দিয়ে যায়। সেখান থেকে আমি আলজিয়ার্স যাই। তখন আমার সাথে ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট আবদুর রকীব সাহেব ছিলেন। আলজিয়ার্স যেতেই এয়ারক্রাফটের মধ্যে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করলাম। সেখানে একটা মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ চলছিল। এখনও যেটা আছে সেটা সামরিক আবরণের অধীনে একটি সরকার, দেখে মনে হবে গণতান্ত্রিক সরকার। এয়ারক্রাফটেই লক্ষ্য করলাম পঞ্চাশ ভাগ মেয়েই সেখানে হিজাব পড়া। এরা লন্ডন থেকে যাচ্ছে। যথেষ্ট আধুনিক ধরনের তারা কিন্তু তাদের মধ্যেই এটা আমি লক্ষ্য করি। আর আলজিয়ার্সে পৌছে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। আলজিয়ার্সের সম্মেলন শেষ করে আমি প্যারিস গেলাম। আলজেরিয়ার সিকিউরিটি খুব শক্ত।

প্যারিস এয়ারপোর্টের লোকজন ফ্রাঞ্চ ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। ফেরার সময় বৃটিশ এয়ারওয়েজে উঠতে হবে। সেটা পেতে আমাক বেশ কষ্ট করতে হয়। আবার আমি লন্ডনে পৌছলাম। এখানে আমাকে মাহমুদের রিসিভ করার কথা। কিন্তু সে তখন এসে পৌছায়নি। আমি এয়ারপোর্টের বাইরে একাই বসেছিলাম। মাহমুদ এলে সেখান থেকে তার সাথে সরাসরি লেস্টারে চলে যাই। একদিন একরাত থাকার কথা। মাহমুদ সে সময় পিএইচডি করার জন্য লেস্টার গেছে। এবার লেস্টার যাওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তার সাথে দেখা করা এবং থাকা। সেখানে আমার ড. মুরাদ হফম্যানের সঙ্গে দেখা হলো। এর আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আমি যখন ওয়াশিংটনে Association for Muslim Social Scientist এর সম্মেলনে

www.pathagar.com

যোগদানের জন্য ২০০০ সালে যাই তখন। এবার তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়। সেখানে আরো অনেক স্কলার ছিলেন, তাদের সাথেও আলাপ আলোচনা হয়।

আমার মনে আছে কিছু স্কলার আমাকে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সেখানে নিরপেক্ষভাবে যেটা সঠিক কথা সেটা বলেছিলাম। অকারণে নিন্দা অকারণে প্রশংসা কোনোটাই গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে করিনি। তাদের প্রাপ্যটুকুই আমি বলেছিলাম। বাইরে অবশ্য গ্রামীণ ব্যাংকের একটা ইমেজ আছে। তারা মনে করে গ্রামীণ ব্যাংক সফল। গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পর্কে তারা অনেক ভালো শুনেছে। কিন্তু তাদের সত্যিকার অগ্রগতি এবং কোনো প্রকার দোষ আছে কি না তা একেবারেই বাইরের মানুষের একেবারেই জানা নেই। আমি তাদের কাছে তাও তুলে ধরলাম। অর্থাৎ আমি ভালোমন্দ দুই দিকই তাদের বলেছিলাম।

সেখানে আমার অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলো। এর মধ্যে এসে যোগ দিল হাসান শহীদ। তারপর ঠিক হলো আমি ও হাসান শহীদ একত্রে লন্ডন ফিরে আসব। কিন্তু এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। অথচ দেখা করার কোনো সময়ই করা গেল না। ফলে ঠিক হলো ম্যানচেস্টার যাওয়ার পথে তার সাথে আমার গাড়িতে আলাপ হবে। অর্থাৎ তিনিও ম্যানচেস্টার যাবেন আমিও যাবো। তাই একত্রেই আমরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই-তিন ঘন্টার জার্নি হবে এবং সেখান থেকে আমরা ট্রেনে করে লন্ডন চলে আসব। হাসান শহীদকেও যেতে হবে। কিন্তু গাড়িতে স্থান সংকুলান খুব টাইট হয়ে যায়। তবুও তিনজন সেভাবেই গেলাম। পথে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রফেসর খুরশীদ আহমদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাকে আগেও যেগুলো বলেছি তা পুনরায় আবার বলি। সেই সাথে আমার মনে হয় আমি উনাকে বলেছিলাম, আপনার আত্মজীবনী লেখা দরকার। সেটা অত্যন্ত জরুরি। আফগানিস্তান পরিস্থিতি তখন খুবই খারাপ ছিল। তা নিয়ে আমাদের কথা হয়। আফগানিস্তানে হামলা যে কোনো অবস্থাতেই সঠিক নয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে আমি তুলে ধরি তালেবানরা যা করছে তা ঠিক না। তারা একটা সমস্যা। তারা আধুনিক বিশ্ব বোঝে না। এইসব বিষয় আমি তুলি। খুরশীদ ভাই আমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে একমত হন আবার কোনো কোনো বিষয়ে বলেন, তোমার আন্ডারস্টান্ডিং ঠিক নয়। এরকমই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সেই সাথে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট সরকার গঠন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তুমি নতুন সরকারের সাথে থাকা জামায়াত ইসলামীকে সাহায্য করবে যাতে সরকারে তারা ভালো করতে পারে। তিনি আমাকে একটা চিঠির কপি দিলেন যেটা তিনি নিজামী সাহেব কে লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

চিঠিতেই আমি জানতে পারি, তিনি তাতে আমাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন, you take his help.

আমাদের আলাপ শেষে ম্যানচেস্টারে তিনি তার গন্তব্যে চলে গেলেন এবং আমরা ট্রেনের টিকিট কেটে লন্ডন আসলাম। টিকেটের সাংঘাতিক দাম। দু'টো টিকিট নিল একশ পাউন্ড। মানে দুশো মাইলের জন্য আট হাজার টাকা প্রায়। সে দিনই সন্ধ্যার আগে এসে পৌঁছলাম। মাগরিবের পর সেখানকার তরুণ ছাত্রনেতৃবৃন্দ একত্রে হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলো। দেশের নতুন সরকার বলে আমাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। কেন তারা শহীদ মিনারে গেল, কেন স্মৃতিসৌধে গেল– এ ধরনের প্রশ্ন। আমি তখন তা. কারযাভীর 'ফিকাহ অব ব্যালান্সে'র কথা বলেছিলাম। তাদের বুঝিয়েছিলাম, একটা বড় কল্যাণের জন্য যদি ছোটখাট অকল্যাণকে সহ্য করতে হয় তাহলে তা করাই হলো ইসলামের বিধান।

তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর আমার মনে হলো বিশ্বব্যাপী যে সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে তরুণ সমাজ খুব চিন্তা করছে। কিন্তু কেন জানি তাদের চিন্তার মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। অনেক উদ্ভট ভাবনা রয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পথে কিছু হবে কি না সেই একই রকম প্রশ্ন। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে ইত্যাদি। তাই আমি তাদেরকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সাবধানে বলি যে, কোনো কিছু যাদু করে করা যাবে না। শক্ত ও কষ্টসাধ্য শ্রমের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেক যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে। কোনো আবেগই আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আবার আমাদের গতানুগতিক পদ্ধতি দ্বারাও চলা যাবে না। একটা সমন্বয় লাগবে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক চাহিদার মধ্যে। এর একটা সমন্বয় ঘটাতে হবে। এটা ছিল একটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব। তার আগে আমি নিজের থেকেই মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে কিছু বলেছি। সে সময় প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে লন্ডনের একটা পত্রিকা আমার এক ইন্টারভিউ নেয়। হয়ত তা প্রকাশিতও হয়েছে। আমি অবশ্য তার কোনো খবর রাখিনি।

সেখানেও আমার সঙ্গে কয়েকজন স্কলারের দেখা হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আটানব্বইয়ের ঘটনা এখানে আবার বলছি যে, সে সময় রশীদ ঘানুশির সাথে আমার দেখা হয়। তিনি হলেন তিউনিশিয়া ইসলামী আন্দোলনের নেতা। ড. বারী আমাকে তার সাথে দেখা করাতে নিয়ে যান। তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। তিনি নির্বাসনে আছেন। তাকে কেউ না কেউ হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। এই জন্যই তার এই সাবধানতা। ফলে আমাকে নানারকম রাস্তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তার সাথে খুব সুন্দর আলাপ হলো এবং আমি লক্ষ্য করলাম তিনি খুব বড়

www.pathagar.com

মাপের একজন মানুষ এবং বুদ্ধিজীবী। তাকে বলা হয় ইখওয়ানের ইকবাল এবং তাকে ইখওয়ানের সার্কেলে খুব বড় শায়েখ বা চিন্তাবিদ মনে করা হয়। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলছেন। তিনি বলছেন, We must accept democracy fully. বহু মতবদাকেও (Pluralism) সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন পার্টি কাজ করবে। আমিও করব অন্যরাও করবে। যদি আমি জিতি আমি ক্ষমতায় যাবো আর আমি হারলে ক্ষমতা থেকে চলে যাবো - এটা আমাদেরকে মানতে হবে। না মানলে পশ্চিমারা আমাদের ভুল বুঝবে আর তারা ভুল বুঝলে তা ইসলামের জন্য সমস্যা হবে। তাই তিনি গণতন্ত্র, প্লুরালিজম, হিউম্যান রাইটস সহ নারীদের কথা বলছেন। সেই সব কারণেই তাকে বলা হয় আজকের যুগের ইকবাল।

এবার যেহেতু সময় [illegible] ছিল বলে হাশিম ফারুকী, একজন পলিটিক্যাল সাইন্টিস্ট, আজজাম তামিমী এবং রশীদ ঘানুশী আমরা একত্রিত হলাম আলাপ করার জন্য ইম্প্যাক্টের অফিসে। সেখানে আমার সঙ্গে ছিল হাসান শহীদ ও মাহমুদ। প্রথমে ইম্প্যাক্ট সম্পাদক হাশিম ফারুকীর সঙ্গে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়। তারপর তরুণ যুবক আজজাম তামিমীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্যালেস্টাইন পরিস্থিতিসহ মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আলাপ হয়। এর মধ্যে রশীদ ঘানুশী ষাট-সত্তর মাইল ড্রাইভ করে চলে আসেন। আমরা আবার সকলে মিলে একত্রে আলাপ করি। মতামত বিনিময় করি। রশীদ ঘানুশীকে আবার সেই আগের কথাই বলি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলি। আজ হোক কাল হোক আমাদের ডিক্টেটরশিপের অবসান ঘটাতে হবে। মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এসব বিষয়ই আমাদের মধ্যে আলাপ হয় এবং আমরা মোটামুটিভাবে এইসব বিষয়ে একমত হই এবং এটাও একমত হই যে, শিক্ষাকে আমাদের সংস্কার করতে হবে। পুরানো যে সমস্ত কোর্স স্কুল বা মাদরাসাগুলোতে আছে সেটা আজকের প্রয়োজন পূরণ করছে না। এসব বিষয় নিয়েও একমত হই।

এটা আমার জন্য একটা বিরাট সম্মান যে, এত বড় বড় মেজর স্কলাররা শুধু আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে চলে আসেন।

হজ্জ পালন

১৯৯২ সালে আমি হজ্জে যাই। ৩রা জুন রওনা হই এবং ২৪শে জুন ফিরে আসি। আমার এমন কোনো সামর্থ্য ছিল না যে নিজের খরচে হজ্জ করি। সে সময় আমার তেমন কোনো সম্পদই ছিল না। রাবেতা আলমে আল ইসলামীর আমন্ত্রণে আমি হজ্জ করি। রাবেতার পরিচালক মীর কাসেম আলী তাদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন নামের

www.pathagar.com

সাথে আমার নামও পাঠান। তাদের আমন্ত্রণের কারণেই তখন আমার পক্ষে হজ্জে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এখানে হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে হজ্জকে কেন আল্লাহ তায়ালা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ করলেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন লেখায় হজ্জের অনেক কারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিশ্ব ধর্ম হিসেবে যেহেতু মনোনীত করেছেন এবং তিনি জানেন এটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হতে পারে একদিন বিশ্বের অধিকাংশের ধর্ম এটাই হবে। অর্থাৎ গোটা মানবজাতির হতে পারে। সেই জন্যে তিনি এমন একটা পদ্ধতি বা ইনিস্টিটিউশনের ব্যবস্থা করেছেন যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী আবশ্যিকভাবে যোগাযোগ (Interact) করতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে বাৎসরিক পারস্পরিক যোগাযোগের চিরন্তন ব্যবস্থা এবং ফরজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেটা অনাবশ্যিক বা অপশনাল নয়, বাধ্যতামূলক, তা তিনি করে দিয়েছেন। এর একটা উদ্দেশ্য এটাই যে, যেখান থেকে ইসলামের বাণী আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বে প্রচার করেন - অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) যে এলাকায় কাজ শুরু করেন তার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত করিয়ে দেয়া। গভীরভাবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়া। এটাও একটা বড় উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। যে কাবাকে কেন্দ্র করে ইসলামের অগ্রগতি বা যাত্রা সেই কাবার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়াও একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটাই বলে মনে হয় যে, ইসলাম মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের কি গুরুত্ব দেয়। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হবে, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী হবে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হবে। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, বিভিন্ন বংশ ও জাতি রয়েছে এবং তারা সবাই ইসলামের অংশীদার হবে বা হয়েছে। তাদেরই পারস্পরিক যোগাযোগের প্রয়োজনকে আল্লাহতায়ালা তার পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছিলেন এবং এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বলেই আমার ধারণা মতে হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, হজ্জের সে ব্যবহার হয়ত বা পুরোপুরি হচ্ছে না, আজ আনুষ্ঠানিকতা গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও প্রত্যেক দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা যে আরো ব্যাপক হতে পারত সেদিকে সে দেশের সরকারের নজর দেয়ার দরকার ছিল। আর নজর দিলে হজ্জের গুরুত্ব বাড়বে। আবার এর মানে এই নয় যে, রাজনীতির চর্চা করতে হবে। মানবজীবনের একটা অংশ রাজনীতি। এর বাইরেও ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিসহ নানা ধরনের চিন্তা-মতামত রয়েছে। এসব কিছু আলোচনা বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো দ্বন্দ্বকে বৃদ্ধি না করে হতে পারে এবং হওয়া উচিত যেটা এখন হচ্ছে না।

www.pathagar.com

অতীতের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি দেখব, ইসলামের শুরুর দিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময় সকল এলাকার কিছু কিছু লোক আসত এবং তারা খোলামেলাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন রাজনৈতিক শক্তি খুব বাধা দিত বলে আমার জানা নেই। তখন সিটিজেনশিপ উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বের যে কোনো স্থানের লোক আসতে পারত। ব্যবসা-বাণিজ্যও সে তুলনায় ফ্রি ছিল। আজকের মতো ট্যারিফ নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার এত ছিল না। আমাদেরকে ভবিষ্যতে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে বলে আমি মনে করি।

আমার হজ্জের সফরসঙ্গী যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একজন ছিলেন আমার মুরব্বী এবং সর্বদিক থেকে মান্যবর বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব জনাব উবায়দুল হক সাহেব। আরেকজন ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও ছোট ভাই অত্যন্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। একজন ছিলেন মরহুম জাস্টিস আবদুর রহমান সাহেব ও তার স্ত্রী। খতীব সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা সউদও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। আমরা দশজনের মতো একটা গ্রুপ ছিলাম।

জেদ্দা এয়ারপোর্টের কাস্টম ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়াকে আমার কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হলো। আমাদের ফ্লাইটে আমরা খুব বেশি যাত্রী ছিলাম তেমনও নয় এবং চেকিং পয়েন্টেও তেমন ভীড় ছিল না। কিন্তু তারপরও আমাদের ক্লিয়ারেন্সে চার-পাঁচ ঘন্টা সময় লেগে যায়। তাদের ধীরগতির পরীক্ষা ও তার পদ্ধতি আমাকে অবাক করে দেয় যেটা অন্য কোনো কোনো দেশে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। বিরানব্বই সালে আমাদের বেলায় এই ঘটেছে, অন্যদের ব্যাপারে কি ঘটে জানি না। তবে আশা করি বর্তমানে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করল রাবেতার এক ছেলে। অল্প বয়স। মনে হলো তার এক হাতে সমস্যা আছে। তাই সে এক হাতে কাজ করত। কিন্তু অত্যন্ত চটপটে ছেলে ছিল। সে আমাদেরকে গাড়ি করে হারাম শরীফের পাশ দিয়ে মিনায় রাবেতার এক রেস্ট হাউসে নিয়ে গেল। সেখানে শ'দুয়েক লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে বলে মনে হলো। সেখানে রুম এলটমেন্ট করতে প্রায় ঘন্টা দু'য়েক সময় পেরিয়ে গেল। আমরা মাগরিবের পরপর পৌঁছেছিলাম। এর আগে জেদ্দায় পৌঁছাই দুপুরের দিকে। জেদ্দা থেকে মিনার দূরত্ব ঘন্টা দেড়েকের। অথচ কাস্টমসে চার-পাঁচ ঘন্টা আর রুম এলোটমেন্টে দু'ঘন্টা অযথাই গেল। আমরা একই রুমে তের-চৌদ্দজন থাকতাম। আমার পাশের সিটেই ছিলেন সাঈদী সাহেব এবং ৭/৮ হাত দূরে থাকতেন খতীব সাহেব। এই রুমটার মধ্যেই আমরা ১৫/১৬ দিনের মতো ছিলাম। সবাই ছিলাম বাংলাদেশী। ফলে

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অনেক গভীর হয়। বাইরের কেবল একজন ইথিওপিয় মুসলিম ছিলেন সে রুমে।

তখনও ইথিওপিয়া থেকে ইরিত্রিয়া আলাদা হয়নি। ইথিওপিয়ার যে হাজী ছিলেন তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমার আরবি খুব সীমাবদ্ধ আর উনি আরবি ছাড়া কিছুই বলতে পারেন না। ইথিওপিয়ার মুসলিমরা প্রধানত আরবিতেই কথা বলে থাকে। তবে তাদের লোকাল ভাষা হয়ত একটা আছে। দশ-বারো দিন আমার পক্ষে যত রকম ভাঙা আরবি সম্ভব তা দিয়ে কোনো রকম কমিউনিকেট করা আর কি, আর খুব বিপদে বা সমস্যায় পড়লে ছবি-টবি একে পরস্পরকে বোঝাতে চেয়েছি। আমি তার কাছে ইথিওপিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। তিনি আমাকে তার দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা যতটুকু বলা সম্ভব বলেছেন। আমার যা স্বভাব সে মোতাবেক তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছি যে আপনারা এই করেন সেই করেন ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম রাতেই একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। আমরা ছিলাম মূল এয়ারকন্ডিশনের পাশে। সেখান থেকে সবখানে শীতল হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদেরকে কম্বল দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ডান পায়ের রগে টান লেগে যায়। ফলে আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। তীব্র ব্যাথা হচ্ছিল। পরদিন সকালে সবার সাথে আমাকেও তাওয়াফ করতে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে করব? হজ্জের জন্য মক্কায় পৌঁছে প্রথম কাজ হলো তাওয়াফ করা। কাজেই আমাকে তাওয়াফ করতেই হবে। কিন্তু আমি কাউকেই আর কিছু বললাম না। ফজরের পর আমি সাঈদী সাহেবের সাথে আলাপ করলাম। এখানে একথা বলে রাখা দরকার, আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তার নিচের তলাতেই নামাযের ব্যবস্থা ছিল। একসাথে প্রায় তিনশ লোক নামাজ পড়তে পারে। আমরা যে রুমে থাকতাম সেখানে সেরকম আরো ত্রিশ-চল্লিশটার মতো রুম আছে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকেরা তাতে আছে। নামাজের আগে ইমাম নিজেই আজান দেন, নিজেই একামত দেন, নিজেই ইমামতি করেন। আমাদের দেশে এটা হয় না। তবে বোঝা গেল অন্যান্য ফিকাহয় এটাও বৈধ। সেখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল যে, সেখানে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে নামাজ আদায় করছে। যেটা আমাদের দেশে হয় না। আমাদের সাথেই প্রায় শ'খানেক নারী সেখানে নামাজ পড়ল। জাস্টিস আবদুর রহমান সাহেবের মতো অনেক হাজীই স্বস্ত্রীক গেছেন। মেয়েদের জন্য কয়েক কাতার রেখে বাকিটা পুরুষের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। হজ্জ তখনও শুরু হয়নি। হজ্জের প্রকৃত শুরু মিনা থেকে। সেটা শুরু হয় জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে। আর আমরা সেখানে পৌঁছেছি তার তিন চার দিন আগে।

www.pathagar.com

মিনা রেস্ট হাউসটা সুন্দর। খাওয়া-দাওয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যারা সেখানে রান্নাবান্না ও খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে মিসরীয় বলে মনে হলো। তারা ইংরেজদের মতোই সাদা বলে মনে হলো। তাদের অন্তত একটা অংশ খুবই ফর্সা হয়। খাবার দাবার ভালো ছিল। ব্যবস্থাপনাও ছিল ভালো।

আমার পায়ের সমস্যার কথা শুনে সাঈদী সাহেব একটু বিচলিত হলেন। বললেন, এতো বিপদের ব্যাপার দেখছি। তবে আল্লাহ যা করেন, আশা করি কিছু হবে না। সমস্যা হলে আপনাকে আমি খাটের উপর করে তাওয়াফ করার ব্যবস্থা করব। সেখানে খুব বেশি খারাপ অবস্থা কারোর হলে তাকে একটা বাহনে করে চারজনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাওয়াফ করিয়ে থাকে। তাতে তিনশ রিয়াল লাগে। কিন্তু আমার কাছে তো কোনো রিয়ালই নেই। সামান্য কিছু বাদে অতিরিক্ত কিছু ছিল না। মনে পড়ে, আমি আসার আগে ২/৩টি রুমাল ও স্কার্ফ কিনতে চাচ্ছিলাম। এর বেশি নয়। কারণ অধিক সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সাঈদী সাহেব নিজে আমাকে ৫/৭টি কিনে দিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বছর চারেক আগে তিনি এক তাফসীর মাহফিলে বলেছিলেন, আমাদের দেশে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এমন লোকও আছেন যাদের কিছু সামান্য জিনিস কিনে দেয়ার জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে হয়। এই কথাটি ক্যাসেটের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সাঈদী সাহেব সেই কথাটি এখনো মনে রেখেছেন।

কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি সাঈদী সাহেব বললেন, আসেন আমরা চেষ্টা করি। আমরা গেলাম। ব্যাপারটা সাঈদী সাহেব ছাড়া আর কেউ জানে না। তখন খুব ভীড়, তাওয়াফ একটা কোণা থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করতে হয়। সাতবার ঘুরতে হয় কাবাকে কেন্দ্র করে। ভয়ে ভয়ে তাওয়াফের জন্য নেমে পড়লাম। শুনেছি পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ মারা যায়। পায়ের অবস্থাও ঠিক হয়নি। সেই ভয় যুক্ত হয়েছে। আবার এমনিই আমার ভিড়কে ভয় পাওয়ার স্বভাব আছে। সাঈদী সাহেব তার সামনে আমাকে নিয়েই তার সম্পূর্ণ নজরদারীতে তাওয়াফ করালেন। নিজের তাওয়াফ নিয়ে চিন্তা না করে আমি যাতে তাওয়াফ করতে পারি সেদিকে খেয়াল রাখতেন। তিনি প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তাওয়াফ করেই সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার ঘুরতে হয়। একে সায়ী বলে। সেখানেও একই ভিড়। সাঈদী সাহেব খুব সিরিয়াস প্রোটেকশন দিয়ে দিয়ে আমাকে এটা করালেন। আমাদের চোখের সামনে আমরা কোনো দুর্ঘটনা দেখিনি। যদিও কালো পাথর স্পর্শের জন্য একদল লোক খুব হুড়োহুড়ি করে। কিন্তু আমরা তার ধারে কাছেও যাবার চেষ্টা করিনি। এটা কিছু লোক খুব বেশি করে। তবে এটা করার

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। এর কোনো অর্থও নেই। তাওয়াফ ও সায়ী করার পর আমার মনে হলো হজ্জে আমি দেখলাম চল্লিশভাগ নারী। অসংখ্য নারী আসে তুর্কী, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে। এর তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, আমি দেখলাম, নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষদের জন্য নারীদেরকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সেরকম তারা করেও না। সেখানে সবাই মোটামুটি একত্রিত হয়ে যায়। সেখানে নারীদের স্থান খুবই উচ্চে। কোনো প্রকার পার্থক্য নেই হজ্জে। নামাজে অবশ্য পুরুষ থেকে আলাদা গ্রুপ করে নেয়। কাবার মধ্যে মহিলা পুরুষ আলাদা আলাদা গ্রুপে নামাজ হয়। আর সেখানে লক্ষ লক্ষ নারীকে আলাদা করাও কষ্টসাধ্য। তাই নারীর স্বাধীনতা, নারী সম-অধিকার যেটা আমি হজ্জে দেখলাম তা আর কোথাও দেখলাম না। তারও কাবার অধিকার সমান এবং একই। এতে কোনো পার্থক্য নেই। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হজ্জ ইসলামের একটি পিলার। এখানে বিশ্বব্যাপী যে সংযোগ হবে তার স্থান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একদম সমান।

সায়ী করতে গিয়ে আমার যে কথা মনে হলো তা হলো আমি কেন সায়ী করছি? এই হাঁটা বা দৌড়ানোই বা কেন? এই সায়ীটা কি? আসলে এটা হলো, হযরত ইসমাইল (আ) ও হযরত হাজেরাকে (রা) রেখে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন চলে গেলেন তখন হাজেরা (রা) পানি পাচ্ছিলেন না, সেই পানির খোঁজে তিনি দৌড়াদৌড়ি করছিলেন সাফামারওয়ার মধ্যে, তারই ঘটনা। আমরা জানি যে, সেখানে জমজম কূপ হয়ে গেল। হযরত হাজেরা (রা) যে পথে দৌড়েছিলেন সেই পথে সকল হাজীকে দৌড়ানোটাই হলো সায়ী। তার মানেও আমাদেরকে বুঝতে হবে। হযরত হাজেরা বা মা-এর তার সন্তানের জন্য এই দৌড়ানো আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় হয়েছিল যে তিনি এটাকে হজ্জের অংশ করে দিয়েছেন। এটা একটা দিক। দ্বিতীয়ত, তিনি চিরতরে মানুষকে বাধ্য করে দিয়েছেন যে হাজেরা যে পথে দৌড়েছিলেন সকল নারী-পুরুষকে সেই পথে দৌড়াতে হবে। তার মানে অন্যভাবে বলা যায়, এই নারীর পিছনে সকল মানবতা দৌড়াচ্ছে। এখানে দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা, গরীব-ফকির সকলে অর্থাৎ আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি তার পিছনে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয়। আমারও মনে হলো, আমি হাজেরার নেতৃত্বে তাকে অনুসরণ করেই দৌড়াচ্ছি। এই সায়ী প্রমাণ করে, নারীর আমলকে আল্লাহ তায়ালা কি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায়, আরাফাত থেকে মক্কা পর্যন্ত যে আসা যাওয়া সেটাকে ঐতিহাসিকভাবে বলা হয়ে থাকে হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) দু' জন এই পথে এসেছিলেন। অর্থাৎ মক্কা থেকে আরাফার যে পথ তাতেও নারী ও পুরুষের উভয়ের অবদানই সমান। এইগুলো থেকে মনে হয় হজ্জ এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে নারীর গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

যাই হোক, আমরা হজ্জ করলাম। হজ্জের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সৌদি সরকার ভালোভাবেই করেছে। সব ধরনের সুবিধা সেখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মনে হলো, আমরা যখন মিনা থেকে আরাফাতে গেলাম, ৯ই জিলহজ্জ সেখানে অবস্থান করে আমরা যখন মুজদালিফায় ফিরে আসলাম সন্ধ্যার পর, সেখানে আমি দেখলাম, একটা বিরাট মাঠে প্রায় বিশ লক্ষ লোক অবস্থান করছে। কিন্তু টয়লেট সুবিধা খুব সীমিত। আমার মনে আছে আমাকে টয়লেটের জন্য প্রায় দুই মাইলের মতো হাঁটতে হয়েছিল। এই অবস্থার ফলে নারী-পুরুষের খুব অসুবিধা হয়। এই বিষয়টি সৌদি সরকারে নজরে দেয়া উচিত। সে যুগে ছিল না বলে এখন থাকবে না এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। কেন তারা এটা করছেন না, আমি তা বুঝতে পারি না। এ প্রসঙ্গে একথাও বলব যে, আমি যখন এই কথাটি তৎকালীন রাবেতার সেক্রেটারি জেনারেলকে বলেছিলাম তিনি তাতে ঠিক সন্তুষ্ট হননি। এটা আমাকে খুব অবাক করেছিল। তারা তাদের কোনো ত্রুটি শুনতে প্রস্তুত হন না। সব সৌদিই যে এমন তাও বলা যাবে না। রাবেতার সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে হজ্জের পর দেখা করি। তিনি আমাদেরকে কেমন হলো জিজ্ঞাসা করলে আমরা যা বলার বললাম। কিন্তু ভালো বলার পর আমি যখন এই বিষয়টা উল্লেখ করলাম তার চেহারায়, কপালে বিরক্তির ভাঁজ দেখলাম। এটা আমি নিজেও পছন্দ করিনি যে, যদি উন্নয়ন চায় তাহলে কেন তারা শুনবে না?

হজ্জে পাথর মারা হয়। শয়তানকে পাথর মারা মানে হলো নিজের শয়তানকে পাথর মারা। এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার। যদিও এই প্রতীকী বিষয়টি হজ্জের একটা আবশ্যক অঙ্গ। এখানেও আমি খুব ভালো ব্যবস্থাপনা দেখলাম না। সেখানে ওভারব্রিজ আছে। ব্রিজের উপর নিচ উভয় জায়গা থেকে পাথর মারা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, যদি যাওয়া আর আসার ব্যবস্থা আলাদা করে দেয়া হয় তাহলে সেখানে দুর্ঘটনা অনেক কমে যায়। এখানে বিভিন্ন সময় বহু হাজী মারা যায় শুধুমাত্র পদতলে পিষ্ট হয়ে। কিন্তু যদি সিস্টেমেটিক রাস্তা করে দেয়া যেত যে, একদিক দিয়ে যাবে আর একদিক দিয়ে আসবে তাহলে সমস্যা কমে যেত। এটা কেন তাদের মাথায় ঢোকে না তা আমার বুঝে আসে না। এখন কেমন হয়েছে জানি না তবে আমার সময় আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। তারা বলতে পারে যে তারা এত কিছু করেছে। তাই যদি হয় তাহলে এতকিছুই যখন করেছেন এটা করবেন না কেন? আল্লাহর তরফ থেকে এতবড় একটা দায়িত্ব আপনারা পেয়েছেন তা আপনাদেরকে পালন করতেই হবে।

www.pathagar.com

যাই হোক, আমরাও পাথর মারব। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি এই ভিড়ের মধ্যে কি করে পাথর মারব। আমার জন্য অন্যান্যরা ঠিক করলেন যে পাথর মারতে বিকালে যাবেন। তখন ভীড় কমে আসবে। কিন্তু আমরা যখন গেলাম তখনও অনেক ভীড় ছিল। তাই ঠিক হলো যে, আমাদের লাইনে সামনে দাঁড়াবেন খতীব সাহেব, উনার বিরাট শরীর। মধ্যে ছোট আমি, সেখানে সামনে উনার মতো পাহাড়ের প্রাচীর থাকবে। আর পিছনে সাঈদী সাহেবের বিরাট শরীর। এই দুই জন তাদের মাঝখানে নিয়ে তারা আমাকে পাথর মারালেন। পাথর তিন দিন মারতে হয়। সেই তিন দিন আমরা এভাবেই গেলাম। খতীব সাহেবের আমার প্রতি এই যে বিরাট অনুগ্রহ আর সাঈদী সাহেবের ভালোবাসা তা আমি ভুলতে পারব না। সাঈদী সাহেবের কাজই ছিল শুধু আমাকে দেখা - আমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। সাঈদী সাহেবকে মানুষ ভালোই জানেন। কিন্তু আমি দেখেছি, তিনি যাকে ভালোবাসেন তিনি তার কত খেদমত করেন। আমার একথাও বলা উচিত যে, হজ্জের সময় আমার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত তিনিই জোর করে ধুয়ে দিয়েছেন। আমাকে কোনো কিছু ধুতে দেননি। এটাকেও তার মহৎ গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনেক পুরস্কার দান করুন এই দোয়াই করি।

একই বছর ড. আবদুল হামিদ হজ্জে যান। তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন এবং পরবর্তীতে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভিসি থাকাবস্থায় বছর কয়েক আগে (১৯৯৯ সনে) ক্যান্সারে আমেরিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আমি মনে করি, তিনি ইসলামের এক মহৎ সন্তান এবং বড় অর্থনীতিবীদ ছিলেন। তিনি আমার থেকে একটু ছোট ছিলেন। তার কাছে আমাদের অনেক কিছু আশা ছিল। তিনি আমাদের মিনা রেস্ট হাউজের অন্য রুমে থাকতেন। সেখানে আমাদের মধ্যে নানা ধরনের আলোচনা হয়। বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থাসহ এখনকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেসব পরিকল্পনা করি। সেই সাথে দেশের এবং ইসলামের জন্য কি করতে পারি, কিভাবে অগ্রসর হতে পারি সেসব বিষয়ে আলোচনা করি।

ড. হামিদের সাথে এই দিক থেকে আমি ঐতিহাসিকভাবে জড়িত যে তার ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার পিছনে আমার একটা ভূমিকা ছিল। কারণ সরকার একজন ভিসি খুঁজছিলেন। একটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নাম দেওয়ার জন্য। তার প্রধান আবার আমার বন্ধু হওয়ায় তিনি আমার কাছে নাম চাওয়ায় আমি তাকে ড. আবদুল হামিদ এবং ড. মুস্তাফিজের নাম দিয়েছিলাম। আশ্চর্যের কথা যে, তখন তিনি ভিসি হলেন আর পরে ড. মুস্তাফিজ হয়েছেন। এটা একটা উল্লেখ করার

www.pathagar.com

মতো দিক। পরবর্তীতে যখন দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি নাম চাইল তখন আবার ড. হামিদের নাম দেই এবং তিনি ভিসি নিযুক্ত হন। আজকে তিনি দুনিয়াতে নেই। তার নিজের যোগ্যতার কারণেই আমি তার নাম দিয়েছিলাম।

হজ্জের সময় বিভিন্ন দেশের লোকজনের সাথে আমি আলাদা আলাদাভাবে বসেছি। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি। যেমন এমএনএলএফ (MNLF) যেটা ফিলিপাইনের মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট - এর নেতৃবৃন্দ যে দু' একজন এসেছিলেন তাদের সাথে আমার আলাপ হয়। তাদের পরিস্থিতি শুনি। তাদেরকে আমি উপদেশ দেই। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লোকদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলি। তাদেরকে আমি যে সমস্ত কথা বলেছিলাম আমার মনে পড়ে তার মধ্য একটা ছিল শিক্ষার উপর। আমি শিক্ষার উপর, বিশেষ করে নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে বলেছিলাম। আধুনিক ও ইসলামিক উভয় শিক্ষার উপরই গুরুত্বের কথা বলেছিলাম। মনে পড়ে, নাইজেরিয়ানদেরকে বলেছিলাম পশ্চিম আফ্রিকার ইসলামের নেতৃত্ব তাদেরকে দিতে হবে। তানজানিয়ানদেরকে বলেছিলাম পূর্ব আফ্রিকার দিকে নজর দিতে। অর্থাৎ তাদেরকেও নেতৃত্ব দেবার কথা বলেছিলাম। মানে আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাকে যে পরামর্শ দেবার দরকার তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছি। সবাই দেখত আমি ঘুরে ঘুরে এগুলো করছি। ফলে সেখানে সবার আমি ইনডাইরেক্ট নেতা হয়ে যাই। তারাও আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

বম্বের ডা. নায়েক নামে একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি বম্বের অন্যতম প্রধান একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। তার দুই ছেলের একজন জাকির নায়েক অন্যজনের নাম ভুলে গেছি। তাদের একজন ডাক্তার ও একজন ইঞ্জিনিয়ার। এই তিনজনের সাথে আমার পরিচয় ও আলাপ হয়। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, দুই ছেলেই ইসলামের অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েক ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হয়ে গেছেন। তিনি একজন ডিবেটর, দক্ষিণ আফ্রিকার আহমদ দিদাতের মতো। যদিও আমি ডিবেটকে ইসলামের জন্য খুব ভালো পদ্ধতি বলে মনে করি না। ডিবেটের মাধ্যমে সব সময় সব কল্যাণ হয় না। তবে হতে পারে কিছু কল্যাণ হয়। ডা. জাকির নায়েক ভালো বক্তা। বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। তার বেশ কিছু ক্যাসেট আছে। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি ওয়েবসাইট গড়ে তুলেছেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। যখন ১৯৯২ সালে প্রথম দেখা হয় তখন তাদের বয়স ছিল পঁচিশের মতো। তাদের মাধ্যমে আমি একটা জিনিস প্রথম পেলাম। ড. জামাল বাদাবীর লেকচার বুক। এর আগে ড. বাদাবীর ক্যাসেটগুলোই আমি আমার উইটনেস এবং পাইওনিয়রের ক্লাসে ব্যবহার করছিলাম। কিন্তু নায়েকই প্রথম

www.pathagar.com

জানালো এগুলো ইংরেজিতে বই আকারে বেরিয়ে গেছে এবং দেশে গিয়েই তা আমার জন্য পাঠিয়ে দেবে। দেশে ফিরেই সে আমাকে বইগুলো পাঠিয়ে দেয়। তারই বাংলা অনুবাদ ভলিউম ১, ২, ৩ আলাদাভাবে এবং তিন খণ্ড একত্রে বেরিয়েছে।

যাই হোক, আমি হজ্জ শেষ করে দেশে ফিরে আসলাম। দেশে আসলাম প্যান্ট-সার্ট পড়ে। সে সময় এয়ারপোর্টে কাস্টমসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন জনাব ফকির আশরাফ। তার কয়েকটি বই আছে। এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রেস সেক্রেটারিও ছিলেন। তার স্ত্রী এমপি ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে বললেন, স্যার আমি অবাক হলাম আপনি প্যান্ট-সার্ট পড়ে হজ্জ থেকে ফিরেছেন অথচ হাজি মানেই হলো লম্বাকোর্তা। উত্তরে বললাম, আমি বেঠিক কিছু করিনি। সুন্দর এবং সতর ঢাকে এমন সব পোষাকই ইসলামিক পোশাক। লম্বাকোর্তা পড়ে হজ্জ থেকে ফিরে আসা আর এই পোশাকে আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই আমি মনে করি, এটা পড়ে ফিরে আসা ভালোই হয়েছিল। যা করতে হবে তা করতে হবে, আর যা করতে হবে না তা করতে হবে না।

যাই হোক, হজ্জ আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। খতীব সাহেব ও সাঈদী সাহেবকে আমার খুব গভীরভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। ডা. হামিদসহ বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে দেখার ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। সৌদি সোসাইটিকে দেখার সুযোগ হয়েছে। যেগুলো পরবর্তীতে আমার ইসলামিক কাজে ব্যবহার করতে সুবিধা হয়েছে।

www.pathagar.com

উইটনেস-পাইওনিয়ার

আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি কাজ হচ্ছে উইটনেস নামে একটি সংগঠন করা। পরবর্তীকালে পাইওনিয়ার নামে আরেকটি সংগঠন করা এবং তারপরে এ দু'য়ের সমন্বয়ে উইটনেস-পাইওনিয়ার নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তৈরি হওয়া।

এর পটভূমি হচ্ছে, সত্তরের দিকে আমি বুঝতে পারছিলাম বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করছিল। আমি লক্ষ্য করছিলাম ইসলাম সম্পর্কে নারীদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে। আল্লাহর অস্তিত্ব বা তৌহিদ নিয়ে তাদের মধ্যে যে কোনো মৌল বিষয়ে প্রশ্ন ছিল তা নয়। আখেরাত, রিসালাত নিয়ে বা রাসূল নিয়ে তাও নয়। কিন্তু তাদের মনের যেসব প্রশ্ন ছিল তা প্রধানত তাদের অধিকার সংক্রান্ত। সম্পত্তির অধিকার, বহুবিবাহ সহ তখন পর্যন্ত মেয়েদের কর্মসংস্থানে এরকম বাঁধা ছিল যে, প্রয়োজন হলেও কেন তারা শ্রমিকের কাজ করতে পারবে না? অফিস আদালতে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার কম কেন? অথচ তাদের কাজের দরকার। ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন ছিল। পর্দা বা হিজাবের বিষয়েও তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। তাদের শিক্ষার সম্পর্কে একটা অস্পষ্টতা ছিল। রাজনৈতিক অধিকার বিষয়েও অস্পষ্টতা ছিল। কেন তাদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হয়? কিংবা কেন তাদের কবরস্থানে যেতে দিতে বাধা দেয়া হয়? কিছু লোক বলে মেয়েরা পার্লামেন্টে যেতে পারবে না, মন্ত্রী হতে পারবে না। কেউ কেউ বলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না বা তাদের রাজনৈতিক অধিকার কতটুকু এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন তাদের ছিল।

এসব কারণে নারীদের মধ্যে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ছিল। তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে ইসলামী আন্দোলনের মেইন স্ট্রিমে নারীদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। সেই সময় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের কাজ অনেক কম ছিল। যদি গোটা ছাত্র সমাজের মধ্যে ১০-১৫% হয় ছাত্রীর হার, সেখানে তারা ১-২% বা তার চেয়েও কম জড়িত ছিল ইসলামের কাজে। এরকম ব্যাপক হারগত পার্থক্য রয়েছে। আমি আরো লক্ষ্য করেছি, এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে থেকে কিছু না কিছু পুরুষ লেখক, স্কলার বেরিয়েছে যারা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জকে বুঝতে ও মোকাবিলা করতে যেভাবে অগ্রসর হওয়ার দরকার হতে পারে, কিন্তু নারীদের মধ্যে

www.pathagar.com

সে সময় আশানুরূপ লোক তৈরি হচ্ছিল না।

এ সার্বিক বিবেচনায় আমি প্রথমত মনে করলাম, মেয়েদের মধ্যে একদল অগ্রসর ধার্মিক গ্রুপ তৈরি করা প্রয়োজন। আর সেটা শুরু করতে হবে তাদের মধ্যে যাদের বয়স এখনও অল্প। যাদের মন-মানসিকতা এখনও গঠিত হয়নি। যারা বিভিন্ন আইডিয়া ধারণ করতে পারবে। যারা নতুন চিন্তাধারা ধারণ করতে পারবে। এই নতুন চিন্তাধারা হলো ইসলামের ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তাধারা, নতুন উপলব্ধি, নতুন বক্তব্য। সেগুলো তারা বুঝতে পারবে। এ রকম পরিস্থিতিতে মেয়েদের মধ্যে আমি একদল অগ্রসর লোক তৈরির কথা উপলব্ধি করলাম যারা ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে যে গবেষণা হচ্ছে তা আত্মস্থ করতে পারবে।

সেটা করার জন্য আমি মনে করলাম, তরুণীদের মধ্যে কাজ করতে হবে। আল্লাহতায়ালাই তখন আমাকে সুযোগ করে দিলেন। কিছু মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তখন আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য। সেসব মেয়েদের নিয়ে আমি আমার বাসায় একটা ক্লাস শুরু করলাম। এই ক্লাসেরও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। কিছু মহিলা এবং মেয়ে একত্র হতো জাস্টিস আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সাহেবের বাসায়। সেটা ছিল মিন্টু রোডে। সেটা ছিল উইটনেসের বর্তমান সভানেত্রী নাসিমা হাসানদের বাসা। কিছু দিন পর আমি উপলব্ধি করলাম বয়স্ক মহিলাদের ততটা প্রভাবিত করা যাবে না বা ততটা দ্রুত গড়ে তোলা যাবে না। ফলে যদি তরুণী মেয়েদের আলাদা করে ক্লাস নিতে পারি তাহলে সেটা ভালো হবে। ফলে আমি আলাদা করে তাদেরকে একত্র করলাম এবং আমার বাসায় সে ক্লাসটা শুরু করলাম। সেই ক্লাসের প্রথম দিককার ছাত্রীদের মধ্যে ছিল জাস্টিস আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সাহেবের পুত্রবধু নাসিমা হাসান, বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা, ডাঃ মীরা মমতাজ সাবেকা, সাবেক জাস্টিস মোস্তফা কামালের মেয়ে নাজিফা কামাল সহ, ড. নাজমুন নাহার পারবিন ইসলাম আরো ১০/১২ জন। এ সময়ের একটু আগে পরে নাজমুন নাহার, আলিফ রুদাবা' সুমাইয়া সহ আরো কয়েকজন একত্রিত হলো। তাতে ব্যারিস্টার কোরবান আলী সাহেবের মেয়ে ছিল। এদের নিয়েই উইটনেসের প্রথম দিককার ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস বিভিন্ন সময় বিভিন্নখানে হতো। আমার বাসায় হয়েছে। পরে নাসিমা হাসানের বাসায় হয়। সেখান থেকে আবার বিভিন্ন জায়গায় সিফট করেছি। বর্তমানে তা ধানমন্ডির ২ নম্বর রোড়ের ২৪ নং বাড়িতে ফেরদৌস খান সাহেবের বাসায় হচ্ছে।

আশির অবস্থাকে সামনে রেখে আমি এই কাজ শুরু করি। আমার এটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি কিছু মেধাবী মেয়ে তৈরি করব। যারা প্রথমে এসেছিল তারা মেডিকেল, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল। এরা ছাত্রী হিসেবে প্রায় সবাই মেধাবী ছিল। তাদের

www.pathagar.com

বোঝার ক্যাপাসিটি ভালো ছিল। উইটনেসের ক্লাস আমি ড. জামাল বাদাবীর Islamic Teaching Course এর ২০০ লেকচার সিরিজ দিয়ে শুরু করলাম। তখনও তার এই লেকচার সিরিজের বই বের হয়নি। কিন্তু আমি তার অডিও ক্যাসেটগুলো পেয়েছিলাম। সেগুলোকে আমি রাতে শুনতাম, হাতে নোট করে পরের দিন পর পর একেকটা করে লেকচার আমি দিতাম। তার ক্যাসেটের জি-সিরিজ আমি প্রথমে ব্যবহার করি। জি-সিরিজে Social system of Islam নামক বক্তব্য ছিল। প্রায় ৪৬টি বক্তৃতা আমি ৪৬টি পাক্ষিক ক্লাসে ব্যবহার করি। এতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। এরপর সেই ক্যাসেটের A, B, C যাতে ঈমানের উপর আলোচনা আছে সেগুলো ব্যবহার করি। সেটাও দুই বছর ধরেই চলতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তারা উন্নতির দিকে আগাতে থাকে। সেসব ক্লাসগুলোতে প্রায় ১০ থেকে ৩০ জন ছাত্রী উপস্থিত হতো।

এরপর তাদের ক্লাসগুলোতে নূরুল আনোয়ারকে ভিত্তি করে উসূল পড়াই। আরো অনেক পরে গিয়ে হাশিম কামালীর Islamic Jurisprudence এর উপর ভিত্তি করে উসূল পড়াই। সেই সাথে ইসলামিক ল' আমি তাদের পড়াই। এটার ভিত্তি করি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামিক আইন' বইটি। মাওলানা মওদূদীর রাসায়েল ও মাসায়েল থেকে আজকের জন্য যেসব বেশি প্রয়োজন সেসব বিষয়ে আলোচনা করি। এই ক্লাসে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর ইসলামের হালাল-হারামের বিধান, ইসলামী পূণর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা, প্রাওরিটিস ও ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দ্যা কামিং ফেস বইগুলো পড়িয়েছি। তাদের ক্লাসে বিভিন্ন বই ভিত্তিক আলোচনা করেছি। আরো পড়ে ড. আবদুল হামিদ আবু সুলেমানের দি ক্রাইসিস অব দি মুসলিম মাইন্ড, ইসলামিক থিওরি অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বইও আমি পড়িয়েছি। থিওরি অব ইন্টারন্যাশনল রিলেশন বইতে ভবিষ্যতে আন্তজাতিক সম্পর্ক কি হবে, আন্তঃদেশ সম্পর্ক কি হবে - এসব বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা আছে। ক্রাইসিস ইন দ্যা মুসলিম মাইন্ড বইতে ইসলামের একটা মেনিফেস্টো আছে যে ভবিষ্যতে আমাদের কি করতে হবে এবং আমাদের ক্রাইসিসটা কি হয়েছে এবং এর উত্তরণটা কিভাবে হবে?

এইভাবে ১৯৮৯ সাল থেকে ছাত্রীদের আমি ক্লাস নিচ্ছি। প্রত্যেক ক্লাসেই আবার প্রশ্ন উত্তর থাকত। এ পদ্ধতিতে আমি তাদেরকে তৈরি করা শুরু করি। এই সব মেয়েরা কেউ মাস্টার্স করেছে, কেউ পিএইচডি করেছে এবং কেউ করছে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছে। তাদের অনেকে লেখিকা হয়েছে, অনেকে বক্তা হয়েছে। কেউ কেউ টিভি প্রোগ্রামগুলোতে পারফর্ম করে। এভাবে একটা গ্রুপ তৈরি হয়।

উইটনেস শুরুতে উইটনেস নামে ছিল না। শুরুতে ক্লাস মাত্র ছিল। কিন্তু বছর খানিক পরে মনে করা হলো এর নামকরণ করা দরকার। তখন সেই ক্লাসেরই এক ছাত্রী

www.pathagar.com

তাহমিনা উইটনেস নামটি প্রস্তাব করে। উইটনেস হচ্ছে 'আশশাহাদাহ' - কোরআনে যেটাকে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। সেই শব্দ থেকে এটাকে নেয়া হয়েছে। এই নামকরণের আরো ৭/৮ বছর পরে তার সংবিধান তৈরি করা হয়। সেই ভিত্তিতে এটা আজ একটি ছোট্ট ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

উইটনেস সংগঠন শুরু করার বছর খানিক পরই আমি মনে করলাম, ছেলেদের মধ্যেও একই উদ্দেশ্যে একদল ইন্টেলেকচুয়াল স্কলার তৈরি করা দরকার। যেটা আমার ধারণা মতে বাংলাদেশে হচ্ছিল না। এ ধারণা ভুলও হতে পারে। বাংলাদেশে সিরিয়াস স্কলার তৈরির প্রচেষ্টার অভাব অনুভব করায় আমি মনে করলাম এ কাজটাও আমি হাতে নিতে পারি। ফলে আমি আমার ছেলে শাহ মোস্তফা ফয়সাল, তার যে হাউস টিউটর ছিল তুষার এবং তার কয়েকজন বন্ধু হাসান শহীদ, শহীদুল ইসলাম প্রামানিক, আবুদল মজিদ প্রমুখদেরকে নিয়ে পাইওনিয়ার নামে ছেলেদের সংগঠনের ক্লাস শুরু করি। ১৯৯০ সালে পাইওনিয়ারের শুরু হয়। এর সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। পাইওনিয়ারের জন্যও আমি দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর ধরে উইটনেসের মতো প্রায় একই কোর্স ফলো করেছি। পার্থক্য হলো শুধু ক্লাসের ক্ষেত্রে, পাইওনিয়ারের প্রতি সপ্তাহে ক্লাস হয় আর উইটনেসে দুই সপ্তাহে একটি ক্লাস হয়।

উইটনেস-পাইওনিয়ারের সামনে আমি আধুনিক বিশ্বের কারেন্ট ইস্যুগুলো নিয়ে আসি। আমরা এখানে কট্টরপন্থা ব এক্সট্রিমিজম ইস্যুকে সামনে আনি। এটা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোনো কল্যাণ করবে না। ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা। মুসলিম বিশ্বের জন্য একটা সংকট হচ্ছে এক্সট্রিমিজম, সেটা ধার্মিক বা পলিটিক্যাল যেটাই হোক না কেন। তেমনিভাবে আমি মেয়েদের মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসি। তাদের যে মৌলিক মানবিকতা, তাদের যে ত্যাগ সেটাকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। তাদেরকে সমাজে, ইসলামিক কর্মকাণ্ডে একত্রে সমন্বিত করতে হবে। তাদের মর্যাদা দিতে হবে যাতে তারা ইসলামকে আপন মনে করতে পারে। এই জেন্ডার ইস্যুতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, আল্লামা জামাল আল বাদাবী, ড. হাসান তুরাবী, ড. আহমদ আবদুল আতি, তাহা জাবির আল আলওয়ালী প্রমুখ স্কলারদের আমরা ফলো করি। উসূলের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কেননা উসূল সম্পর্কে না জানলে কোরআন-সুন্নাহ ভালো করে জানা যায় না। এর অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে। ভুল ব্যাখ্যা বাড়ে।

আমরা ক্লাসে ইসলামিক এডুকেশনের উপরে গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা একটা আধুনিক ইসলামিক এডুকেশন দরকার বলে মনে করি। তার জন্য আমরা মালয়েশিয়ার

www.pathagar.com

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির যে বৈশিষ্ট্য, সেখানে আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার যে সমন্বয়, তাকে ভিত্তি করার কথা আমরা বলেছি। পলিটিকসের ক্ষেত্রে আমরা হিউম্যান রাইটসের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে গণতন্ত্রের কথা বলেছি। যে গণতন্ত্রকে মাওলানা মওদূদী, ড. কারযাভী সহ পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ সমর্থন করেছেন। ইখওয়ান, জামায়াতের ইসলামী পাকিস্তানের এমএমএ যে গণতন্ত্রকে সমর্থন করছে সেই গণতন্ত্রকে আমাদের সমর্থন করতে হবে। বুঝতে হবে, ইসলামের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। শুধু মূল আইন হবে আল্লাহর - এই শর্ত সাপেক্ষে তা হতে হবে। সে গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার হতে হবে। এই কয়েকটি বিষয়েকে আমরা হাইলাইট করেছি।

পাইওনিয়ারেরও একই ভাবে পরবর্তীতে নামকরণ করা হয়। এদের থেকে লেখক, স্কলার বেরিয়ে আসছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার কিছু ছাত্র ১৯৯৬ সালের আগেই আমেরিকা চলে যায়। এদের মধ্যে আছে মঈনুল হক, সারা আহমদ, সিলভিয়া রহমান ববি, নাজমুন নাহার, ইমরান চৌধুরী প্রমুখ। এরা বাহিরে গেলেও তাদের সাথে আমার ইমেল ও টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। আমিই তাদেরকে বলি দেশে তোমরা উইটনেস-পাইওনিয়ারে ছিলে। বাহিরে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের একত্রে কাজ করতে হবে। যেহেতু সেখানে দুটি সংগঠন করা সম্ভব নয় তাই তোমাদেরকে একটি সংগঠন করতে হবে। কিন্তু তারা কেমনে করবে? তাই তাদেরকে বললাম, তারা বছরে একবার অন্তত একত্রিত হবার চেষ্টা করতে পারে। এদের পরে বাহিরে যায় সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা। সে যাওয়ার পর আমার আবেদন একটি গতি পায়। তখন সবাই পরামর্শ করে ডব্লিউপি (WP : Witness-Pioneer) নামে একটা সংগঠন দাঁড় করায়। তারও একটি সংবিধান হয়। আবদুর রহমান বাকি বিল্লাহ নামে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এক টিচার সেখানে গিয়ে প্রথম সভাপতি হয়। আর সেক্রেটারি জেনারেল হয় ইমরান চৌধুরী। ডব্লিউপি নিজেরাই ঠিক করল তারা কি কি কাজ করবে। তারাও সেই একই ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। তারা একটি ছোট নিউক্লিয়াস হবে এবং বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী ছড়াবে। আমি তাদের এরিয়া স্পেশালিস্ট হতে বলি। অর্থাৎ তাদের কেউ আফ্রিকা, কেউ এশিয়া, কেউ ইউরোপ কিংবা কেউ আমেরিকার বিশেষজ্ঞ হবে। কিংবা তাদের কান্ট্রি স্পেলালিস্ট হতে হবে অর্থাৎ একেকটি দেশের উপর বিশেষজ্ঞ হবে। একই সাথে তাদের আবার সাবজেক্ট স্পেশালিস্টও হতে বলি। তারা এর কিছুটা কার্যকর করতে পেরেছে আর কিছুটা পারেনি। ইতোমধ্যে তারা ইন্টারনেটে একটি ওয়েব লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে ইসলামের উপর যেসব গুরুত্বপূর্ণ বই বের হচ্ছে তারা সেখানে তা রাখছে। যে কোনো ব্যক্তি তাদের

www.pathagar.com

ওয়েব সাইট www.witness-pioneer.org থেকে নিজেদের পছন্দ মতো ডকুমেন্ট ডাউন লোড করে নিতে পারবে। এরপর তারা একটা স্কুল করে, তার মাধ্যমে তারা নানারকম কোর্স চালু করে। এর প্রথম কোর্স আমিই করালাম উসূল আল ফিকহের উপর। প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্র নিয়ে ইন্টারনেটে এই কোর্স করা হয়। এদের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, মিসর সহ মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রও ছিল। এই কোর্স ইন্টারনেট চ্যাটের (chat) মাধ্যমে করা হয়। সেই কোর্সের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে উসূল আল ফিকহের উপর আমার বইটি ৬ মাসে ১৪টি লেকচারের মাধ্যমে শেষ করা হয়। এতে মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষার পদ্ধতিও ছিল। এর পরিচালনায় আমাকে দেশে সফিকুর রহমান ও বিদেশী হার্ভার্ডের ল' স্টুডেন্ট রফিকুল ইসলাম দুই জনে সাহায্য করে। পরবর্তীতে আমি ইকোনোমিকসের উপরে আরেকটি কোর্স ডিজাইন করি।

উইটনেস-পাইওনিয়ারে প্রায় সবাই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। আশা করা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছু ভালো স্কলার বেরিয়ে আসবে। লেখক বেরিয়ে আসবে। আমার ধারণা মতে বিভিন্ন দেশে নেতৃত্বে তারা থাকবে। দেশে ফিরে এসে নেতৃত্বের পর্যায়ে যেতে পারবে। এটা ইসলামের কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করছে।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ব্যক্তি

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

ইবরাহীম খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় ও আলোচনা হয় ১৯৬৭ সনে। তিনি তাঁর এক নাতির বিবাহ উপলক্ষে আমার চট্টগ্রামের বাসায় আসেন। তাঁর অন্যতম নাতি ছিলেন ড. শামসুল আলম। তিনি তখন চট্টগ্রাম মিউজিয়ামের দায়িত্বে ছিলেন এবং মিউজিয়ামটি গড়ে তুলছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইতালি থেকে তার ডক্টরেট করেন এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক হয়েছিলেন। সে পদ থেকেই তাঁকে অবসর দেওয়া হয়। তিনিও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন বলে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর প্রতি যে সুবিচার হয় সে জন্য আমি বেশ কিছু চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারিনি।

এই ড. শামসুল আলমের বরযাত্রা আমার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের বাসা থেকে হয়েছিল। কেননা যুবক শামসুল আলম আমার বন্ধু ছিলেন। এ বন্ধুত্ব চট্টগ্রামেই হয়েছিল। একজন তরুণ অফিসার হিসেবে চট্টগ্রামের আমার পোস্টিং হয়। কনের বাসাও ছিল চট্টগ্রামের একই কলোনীতে। জনাব ইবরাহীম খাঁ সে বিবাহে যোগ দিতে চট্টগ্রামে আমার বাসাতে আসেন।

ইবরাহীম খাঁকে যারা দেখেছেন তারা জানেন যে তিনি আচকান পাজামা পরতেন। তাতে তাঁকে অত্যন্ত মানাতো। তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন। লাঠিটি খুবই মানানসই সাইজের ছিল এবং তাঁর হাতে সেটি খুবই মানাত। তিনি চট্টগ্রামে কয়েকদিন ছিলেন এবং সে সময় নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হতো। আলাপ হতো দেশ ও ইসলাম নিয়ে। কেননা তিনি ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। সে সময়ে গুটি কয়েক ইসলামী চিন্তাবিদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

আমাদের কলেজ সিলেবাসে তখন তাঁর 'ইসলামের মর্মকথা' নামে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেখাটি অত্যন্ত সুলিখিত। এর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করেছিলাম। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন ধর্ম হচ্ছে সেই আদর্শ ও বিধান যা গোটা

www.pathagar.com

জীবনকে ধরে রাখে। ইসলাম একটি জীবনবাদী ধর্ম, এখানে fatalism এর কোনো স্থান নেই। তিনি ইকবালের কবিতা তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে বলেন, 'খোদা পুছতা হ্যায়, হর তকদীর, বননেছে পাহলে, বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যায়' (খোদা তাকদীর নির্ধারণের পূর্বে বান্দাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কী চাও?) অর্থাৎ রূপকভাবে ইকবাল বুঝাতে চেয়েছিলে যে, তকদীর কর্মবাদের বিরুদ্ধে নয়।

আমাদের শিক্ষাজীবনে (সম্ভবত ইন্টারমিডিয়েট) আমরা ইবরাহীম খাঁ সাহেবের 'কাফেলা' নামে একটি নাটিকা পড়েছিলাম। তাতে তিনি ইসলামের নামে যে কূপমণ্ডুকতা, নারী শিক্ষার বিরোধিতা সে সময়ে ছিল তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলান। তিনি ইসলামের যথাযথ সেবক ও অনুরাগী ছিলেন। তিনি মুসলিম জাগরণের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন। কেউ কেউ এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলতে চাইবেন। এটা ভুল। নিজের জাতিকে অনগ্রসর দেখতে পেয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা মহৎ কাজ ও গৌরবজনক। অন্যের উপর অবিচার না করলেই হলো।

ইবরাহীম খাঁ বড় মাপের শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের জনগণ তাকে চিরদিন স্মরণ রাখবে। তবে এজন্য তাঁর পূর্ণ পরিচয় আমাদের তুলে ধরতে হবে।

আমার শিক্ষক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন

আমি ১৯৫৫ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। তখন মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন সাহেব ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সে সময়ই প্রথম মনসুরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। তিনি আমাদেরকে বাংলা গদ্য পড়াতেন। শিক্ষায় তিনি ছিলেন যথেষ্ট কঠোর। কোনো ছাত্র পড়াশুনার অবহেলা করুক এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

১৯৫৭ সনে আইএসসি পাস করে আমি ঢাকা কলেজ থেকে বের হয়ে যাই। ১৯৫৮ সনের শেষ দিকে আমার পিতা শান্তিনগরে বাসা নেন। সে পাড়াতেই মনসুরউদ্দিন সাহেব নিজের বাড়িতে থাকতেন। সে সময়ে আমাদের গৃহশিক্ষকতা করার জন্যও বলেছিলেন। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে তা আর করা হয়ে ওঠেনি।

চাকরি জীবনে সব সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯৮০ সন থেকে পুনরায় আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি। তিনি প্রায়ই আমার বিজয়নগরস্থ বাসায়

www.pathagar.com

আসতেন। তখন তিনি একা চলাফেরা করতে পারতেন না। তাই তার সঙ্গে কোনো না কোনো কন্যা বা আত্মীয় থাকত। তিনি আমাকে একেবারে নিজের ছেলের মতো জানতেন এবং পরিবারের নানা সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন। এসব সমস্যা সমাধানে আমার মতামতও নিতেন।

তিনি আমার বাসায় বসে সবসময় আমার বইপত্রগুলো দেখতেন। যদিও আমার বইগুলো অগোছালোভাবে রাখা ছিল তবুও তিনি সেগুলো খুটে খুটে দেখতেন। তিনি আমাকে ইউরোপীয় লেখকদের লেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। প্রায়ই দেখা যেতো সেগুলো আমার পড়া ছিল না। তিনি সেসব বই পড়ার জন্য আমাকে বলতেন। তাঁর সাহচর্যে এসে আমি জানতি পারি যে, পারসীকে সুফীদের ও ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের ইসলাম সম্পর্কিত অনেক বই তাঁর পড়া ছিল। তাঁর ওপর সুফিবাদের অত্যন্ত গভীর প্রভাব ছিল বলে আমার ধারণা।

ইসলাম সম্পর্কে আমি তাঁর মতামত বিভিন্ন সময়ে জানতে চেয়েছি। তিনি গভীর বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। ইসলামের মধ্যেই মানবতার মুক্তি এসব বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁকে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা লিখে যেতে বলেছিলাম। তিনি লিখবেন বলেও আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং শারীরিক কারণে তিনি তা বোধহয় লিখে যেতে পারেননি।

তিনি আমার ছেলে-মেয়েকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বাসায় আসলেই তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সঙ্গে অনেক কথা বলতেন। তিনি আমার কন্যাকে বলতেন একই সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে। তিনি খাওয়া-দাওয়া ভালো করার ওপর জোর দিতেন। তিনি তাকে লোকসাহিত্য পড়তে ও বানানের ব্যাপারে সতর্ক হতে বলতেন। তিনি ব্যাকরণ পড়তে ও বিশুদ্ধ বানানের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতেন।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন সাহেবের মৃত্যুতে আমি কেবল আমার এক শিক্ষককেই হারাইনি, আমার পরিবার এক মুরুব্বিকেও হারিয়েছে।

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুর রহীম
বাংলাদেশের এক বিশাল ইসলামী ব্যক্তিত্ব

১৯৫৭ সালে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক ওঠা-বসা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে একত্রে অনেক কাজ করেছি। যেমন ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো নামে সংগঠনটির যে কয়েকজনের হাতে গোড়াপত্তন হয় তার মধ্যে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব একজন। আমিও প্রথম দিন থেকেই ছিলাম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জহুরুল ইসলাম। জহুরুল ইসলাম একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট, তার অবদান এখানে অনেক। রহীম সাহেব এর প্রথম চেয়ারম্যান ও আমি প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। ব্যুরোর যে ক্ষুদ্র সংবিধান হয়েছিল তা আমি নিজের হাতে করি। পরবর্তীকালে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে সংবিধানটি বড় করা হয়।

আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে আমরা দুজন জড়িত ছিলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' প্রকল্পে আমরা দুজনই সদস্য ছিলাম। এর দায়িত্বে ছিলেন এম আযিযুল হক সাহেব যিনি পরে ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এ কাজটি শেষ করতে আমাদের প্রায় ৪/৫ বছর লেগে যায়। এখানে কোরআনের যে সমস্ত আয়াতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে বলে আমরা মনে করি সেগুলোকে চিহ্নিত করি এবং তার উপর বিস্তৃত অথবা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করি। এ কাজে আমি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। মরহুম রায়হান শরীফ সাহেব ছিলেন কমিটির একজন সদস্য। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যিক ও অর্থনীতিবিদ ছিলেন। নিয়ম ছিল কোরআনের আয়াত ও শব্দের অর্থগুলো নিয়ে বিভিন্ন তাফসীরে কি কি অর্থ আছে সেসব মিলিয়ে একটি নোট তৈরি করা হতো। আমাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আয়াতগুলো ভাগ করে দেয়া হতো। তার উপরই নির্বাচিত ব্যক্তি লিখতেন। সেগুলো আবার কমিটিতে আলোচনা হতো। আমরা প্রায় ক্ষেত্রে সহজেই একমত হয়ে যেতাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি ও আবদুর রহীম সাহেব সহজে একমত হতে পারছিলাম না। আমরা দুজনের কেউই সে বিষয়ে ছাড় দিচ্ছিলাম না। ইস্যুটি হচ্ছে নারীর দীয়াত সম্পর্কে। নারী যদি নিহত হয় তাহলে তার রক্তমূল্য কি হবে। ট্রাডিশনাল ফিকাহতে মত রয়েছে যে, নারীর রক্তমূল্য পুরুষের অর্ধেক হবে। একজন জেন্ডার সচেতন লোক স্বাভাবিকভাবে এ কথাটি বুঝতে পারে না। একজন পুরুষ নিহত হলে তার রক্তমূল্য যা নির্ধারিত হবে তার অর্ধেক মূল্য কেন নারীর ক্ষেত্রে হবে। এখানে কোরআনের বক্তব্য হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক যে হত্যা হয় তার শাস্তি হচ্ছে

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ড। আর উদ্দেশ্যমূলক নয় এমন হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বদলে রক্তমূল্য বা দীয়াত। দীয়াত মানে ক্ষতিপূরণ। কোরআনে এক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু ফিকাহবিদদের অধিকাংশ অর্ধেকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন। কেন জানি এ লেখাটির দায়িত্ব আমাদের দুজনকেই দেয়া হয়েছিল। দুজনেই লিখবো, পরে সমন্বয় করা হবে। আবদুর রহীম সাহেব ট্রাডিশনাল মত লিখলেন আর আমি এর উপর পড়াশুনা করলাম। পড়াশুনা করে দেখলাম, পুরানো ফিকাহবিদদের মধ্যে দুজনের মত হচ্ছে, যে হাদিসের ভিত্তিতে এটি বলা হচ্ছে তা জয়ীফ হাদিস। এর ভিত্তিতে নারী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তমূল্যের পার্থক্য করা যাবে না।

আধুনিককালের অর্থাৎ আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে দুজন ফিকাহবিদ বলেছেন এটি অর্ধেক হবে না। সুতরাং ইজমা বলে এখানে কিছু নেই। ফলে আমি মেজরিটির মত গ্রহণ না করে মাইনরিটির মত গ্রহণ করে লিখলাম। কারণ যেহেতু মূল পার্থক্যটি কোরআনে নেই। হাদিসটিও দুর্বল এবং যুক্তিও তা গ্রহণ করে না। তদুপরি সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের মতে অন্তত চারটি ভিন্নমত আছে। আবার অন্যান্য মতের সবগুলোই যে পক্ষে তাও নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, এ বিষয়ে যখন আমি ২০০২ সালে আরো পড়াশুনা করলাম তাতে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর Status of Woman in Islam বইতে দেখলাম, তিনি দেখিয়েছেন, নারীর দীয়াতের ব্যাপারে প্রাচীন ফিকাহবিদগণ যে পার্থক্য করেছেন তা ভুল ছিল। কারণ নারী বা কারোর অধিকারই কোনো জয়ীফ হাদিসের ভিত্তিতে সীমিত করা সংগত নয়। তিনি তার আরেকটি বই 'ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন'-এ বলেছেন, কোনো জয়ীফ বা দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে কোনো আইন বা আহকাম রচিত হতে পারে না। কাজেই আমার মত যে নতুন কিছু ছিল তাও নয়। আমি ও আবদুর রহীম সাহেব উভয়ই নিজেদের মতে অটল থাকায় দু'সেশনে যখন বিষয়টির মীমাংসা হলো না তখন আমি মত দিলাম, দুটি পেপারই যাবে এবং ভূমিকায় থাকবে এ ব্যাপারে কমিটি একমত হতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুটা ছাড় দিয়ে যখন বললেন আমার মতটি তিনি তার লেখায় সংযুক্ত করে দেবেন তখন আমি তাঁর বক্তব্যটি মেনে নিলাম। কিন্তু শেষে হলো যা তা হচ্ছে তিনি তাঁর কথাই নব্বই ভাগ রেখে আমার কথা মাত্র দশ ভাগ যুক্ত করলেন।

আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত ও বন্ধুত্বপূর্ণ থাকার পরও আমাদের মধ্যে ইল্‌মের ব্যাপারে বিতর্ক হয়েছে, সে রকম বিতর্ক হয়ত তার সাথে অনেকে করেইনি। এ দীয়াত নিয়ে পাকিস্তানেও প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে, যখন তাদের ফিকাহ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছিল। সেখানেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত দীয়াত সংক্রান্ত ধারাটিতে উল্লেখ করা হয়, দীয়াত নির্ধারিত হবে কোরআন-সুন্নাহ এবং প্রত্যেক মামলার পরিস্থিতির আলোকে। তবে তা কোনো অংশে ত্রিশ হাজার ছয়শত

www.pathagar.com

ত্রিশ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের কম হবে না। [Section 323 of Criminal Law for (Fourth Amendment) Ordinance 1991 (of Pakistan), গাজী শামসুর রহমান রচিত ইসলামের দণ্ডবিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত, পৃ- ৫২২]।

যাহোক আমরা পরস্পর যেসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছি তা অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে থেকেই করেছি।

তিনি যেসব বই লিখেছেন তার সাহিত্যিক মানের বিচার সাহিত্যিকরাই ভালো করতে পারবে। তিনি সাধু ভাষাতেই লিখেছেন। তিনি যখন লেখালেখি শুরু করেন তখন সাধু ভাষাতেই লেখা হতো। পরে চলতির দিকে চলে আসে। তাঁর ভাষা অত্যন্ত উন্নত, এটি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি মাদরাসায় উর্দু মিডিয়ামেই পড়াশুনা করেছেন। সে যুগে মাদরাসায় উর্দুতেই পড়াশুনা হতো। তিনি যেসব গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তা অত্যন্ত উঁচুমানের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হয়েছে। আরবি ও উর্দু ভালোভাবে জানার ফলেই তার অনুবাদ প্রকৃত অনুবাদই হয়েছে।

তিনি আমার বন্ধুই ছিলেন না, তিনি আমার ওস্তাদও ছিলেন। আমি তাঁর অনুবাদ পড়েছি। তাঁর অনুবাদ পড়তে আমার কষ্ট হয়নি। তাঁর অনুবাদ পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি, প্রভাবিত হয়েছি। ঋদ্ধ হয়েছি। এটি আমার কাছে তাঁর অনুবাদের সফলতাই প্রমাণ করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের জেনারেশনে আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনে এসেছি তারা তাঁর অনুবাদ পড়েই এসেছি। তাঁর অনুবাদের লেভেল কী তা যারা অনুবাদ ভালো বোঝে তারাই বিচার করবে। আমি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ধরনের অনুবাদই পড়েছি। কিন্তু আবদুর রহীম সাহেবের অনুবাদে ত্রুটি বা কমতি আছে বলে আমার মনে হয়নি। আমি যেহেতু উর্দু জানি, কাজেই বলব, ভাবের ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি সফল হয়েছেন।

মাওলানা আবদুর রহীমের কোনো আত্মজীবনী বের হয়েছে কিনা জানি না। আসলে তাঁর জীবনী কারোর লিখে ফেলা দরকার। এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। তিনি ছিলেন এদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন - এ বিষয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও আলেম হিসেবে সার্বিক অবদানের জন্য আকরম খাঁ ও আবদুর রহীম সাহেবের পরে তেমন আর কাউকে দেখি না। অন্যান্যদেরকে আমার এ পর্যায়ের মনে হয় না।

আমি যতদূর জানি তিনি ১৯৪৭-৪৮ সালের দিকে জামায়াতে ইসলামীতে আসেন। তিনি কলকাতা আলিয়ার ছাত্র ছিলেন। তিনি তরজমানুল কোরআন পান। মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন লেখা আমি উর্দুতে পড়েছি। তার ভাষা খুবই আবেদনময়ী ও শক্তিশালী। মাওলানা মওদূদী সাহিত্যিক হিসেবে অনেক বড় এবং তার উর্দু খুবই উচ্চ

www.pathagar.com

পর্যায়ের। আবার বিষয়বস্তুও ভালো ও শক্তিশালী। বিশ্লেষণও শক্তিশালী। সব কিছুই একত্রে ঘটেছে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যে। স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো বিপ্লবী মানুষ যার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক কিছু করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে - এরকম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তিনি প্রভাবিত করবেন - এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। ফলে আমার মনে হয় মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব মাওলানা মওদূদীর এসব ধ্যান ধারণা বা আইডিয়া গ্রহণ করতে পারার মতো যথার্থ পাত্রই ছিলেন। তিনি তার তরজমানুল কোরআন পড়েন। তিনি জামায়াতে যোগ দেন এবং এক পর্যায়ে এ দলের আমীর হন।

এ এলাকায় একজন সংগঠক হিসেবে আধুনিক স্টাইলের ইসলামী মুভমেন্টকে তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি টিম এসে সাহায্য করলেও দেশের ভিতর তিনিই সে ব্যক্তি যিনি তা গড়ে তোলেন এবং সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড় করান। সে সময়গুলো আবার অনেক রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। সে সময় মাওলানা মওদূদীর ফাঁসির আদেশ হয় এবং এর বিরুদ্ধে এদেশে আন্দোলন করতে হয়। মার্শাল ল' আসে। সে সময়ে দেশে বিভিন্ন ইস্যুতে যথেষ্ট উত্তেজনা বিরাজমান ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল যুক্ত বনাম পৃথক নির্বাচন ইস্যু। এ প্রসঙ্গে আমাদের লোকদের একটি ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, মাওলানা মওদূদী যে যুক্ত নির্বাচনের বিরোধীতা করেছিলেন, আমি বহু সাহিত্য পড়ে দেখেছি সেখানে তিনি একথা বলেননি যে তা ইসলামের মত অনুযায়ী অবৈধ। তিনি তা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কল্যাণকর মনে করেননি। তিনি কোথাও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হারাম বা অবৈধ বলে উল্লেখ করেননি। যেই তার 'ইসলামিক ল এন্ড কনস্টিটিউশন' বই খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে দেখবে, তিনি তা একজন চিন্তাশীল আলেম হিসেবেই এড়িয়ে গেছেন। তিনি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেটি সঠিক মনে করেননি। এটি এখনো ভুল বোঝাবুঝির পর্যায়ে থাকলে তাদের শক্তিই বাড়াবে যাদের শক্তি বৃদ্ধি বর্তমানে কোনো দিক দিয়েই কল্যাণকর নয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব অনেক উচ্চ লেভেলের লোক। তৎকালীন বড় বড় রাজনীতিবিদদের সাথে তিনি রাজনীতি করেছেন। তাদের ম্যানেজ করে চলতে হয়েছে। আসলে তিনি খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন, শেখ মুজিব, ভাসানীর মতো নেতাদের পর্যায়ের রাজনীতিবিদ। তাঁর ভূমিকা ছিল ক্রুশিয়াল। তিনি বাংলাদেশ হওয়ার পর আইডিএল গঠন করেন। সেটি আমার কাছে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সঠিক ছিল বলে মনে হয়। তিনি তা গঠনে অনেক ভূমিকাও রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে সংসদের ছয়টি আসন তারা পেয়েছিল। সেখানেও তাঁর ভূমিকা অনেক গঠনমূলক ছিল। তিনি নিজে ব্যক্তিত্বশালী লোক ছিলেন। দেখতেও সেরকম

www.pathagar.com

ছিলেন। ফলে তাঁকে হালকাভাবে কেউ কখনো গ্রহণ করেনি। জামায়াতে ইসলামী নতুন করে সরাসরি রাজনীতিতে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে আইডিএল যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

একজন দায়ী নানা পদ্ধতিতে ইসলামের কাজকে ছড়িয়ে দিতে পারে। তাঁর পদ্ধতি ছিল দেশে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করবেন এবং তার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করবেন। এ কাজটি তিনি করেছেন। আরেকটি পদ্ধতি ছিল লেখা। তিনি নিজে লিখেছেন। অন্যের বই অনুবাদ করেছেন। তিনি এ দুটো কাজই উন্নত পর্যায়ে করেছেন। তিনি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা সব দিকেই গুরুত্বের সাথে কাজ করেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনে চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অনেক বড় চিন্তাবিদ ছিলেন।

এদেশের ইসলামী আন্দোলন খুব একটি কুসুমাস্তীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলেনি। এখানে অনেক নেতা কর্মী নির্যাতিত হয়েছে। জেল খেটেছে। শহীদ হয়েছে। ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে। এ দেশে ইসলামী আন্দোলন মিসর, ইরান, সিরিয়ার মতো পর্যায় অতিক্রম করেছে। শুধু নেচার একটু আলাদা। তাঁর সময় তিনি সামগ্রিক বিচারে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই ছিলেন। তাঁর আবেগও ছিল। তাঁকে আবেগপ্রবণ হতেও দেখেছি। সামগ্রিক বিচারে তিনি রাজনীতিতে খুবই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : আমি যেভাবে পেয়েছি

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ছিলেন এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্বনামে এবং বেনামে লিখতেন। এসব সংবাদপত্রের মধ্যে দি অবজারভার, দৈনিক সংগ্রাম এবং লন্ডনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম।

আমি তাঁকে চিনি যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত Formal ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলত। তিনি সবসময় স্যুট-টাই পরতেন এবং পোশাক-আশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট কেতাদুরস্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজি প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং কারো কোনো ত্রুটি এ ব্যাপারে সহ্য করতে পারতেন না। উচ্চারণের ব্যাপারেও

www.pathagar.com

তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং কোনো ধরনের ভুল উচ্চারণ তাঁর সামনে কেউ করলে তিনি বেশ কঠোরভাবে আমার উচ্চারণের ভুল দেখিয়ে দিতেন।

পরবর্তীকালে দেখেছি তিনি আরবী ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ বেশ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আমি আমার এক বন্ধু জয়নাল আবেদীনকে 'জয়নাল' বলে ডাকতাম। একদিন তিনি আমাকে কঠোরভাবে বলেন, 'তোমার কাছে আমি এ রকম ভুল আশা করি না। তোমার আরবী ব্যবহার ভুল হয়েছে। এটি হবে জাইন অথবা জাইনুল আবেদীন।' এরপর থেকে আমি ঐ বন্ধুকে জাইনুল আবেদীন বলেই ডেকেছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরবী ভাষার দৃষ্টিতে 'নজরুল' ব্যবহার সঠিক নয়। এটি হবে 'নজর' অথবা 'নজরুল ইসলাম'। এখন আমরা নজরুল ইসলাম-ই বলে থাকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি তখন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন না। ইসলামের ওপর তখন তেমন কিছু লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার মনে পড়ে, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) একবার কার্জন হলে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। তাতে ড. হোসায়েন Tradition (হাদীস)-এর ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সেমিনারে কার্জন হল কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। কারণ, সে সময় ইসলামী বিষয়ের ওপর খুব কমই সেমিনার হতো। আজকের মতো এত সেমিনার তখন হতো না। তদুপরি ওটা ছিল ইসলামিক একাডেমী আয়োজিত প্রথম কি দ্বিতীয় ইসলামী সেমিনার।

প্রবন্ধে ড. হোসায়েন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তার সঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদদের মূল ধারার অনেক অমিল ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাদীসবিরোধী যুক্তিধারার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর প্রবন্ধে। আমি নিজেই প্রবন্ধের বক্তব্যের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। প্রবন্ধটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ড. হোসায়েন সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন এবং একজন যথার্থ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আরও অনেক পরে, ড. হোসায়েনের সঙ্গে আমার গভীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা কয়েক বন্ধু 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট' (BIIT) নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। ড. হোসায়েনকে আমরা এ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হওয়ার জন্য অনুরোধ করি এবং এতে তিনি সদয় সম্মতি দেন। (BIIT) এর চিন্তা আমাদের আসে যুক্তরাষ্ট্রের International Institute of Islamic Thought প্রকাশিত Islamization of knowledge বইটি পরার পর। আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন সচিব জনাব আহমদ ফরিদ এ বইটিকে ভবিষ্যতের 'ইসলামী মেনিফেস্টো' বলে উল্লেখ করেছিলেন, যাহোক, BIIT ঐ বইয়ে দেওয়া 'ইসলামিক সিভিলাইজেশন কোর্স'

www.pathagar.com

শীর্ষক বিষয়ের ওপর পুস্তক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমার ড. হোসায়েনকে পুস্তকটি রচনা করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং কাজ শুরু করেন। এ কাজ উপলক্ষে ড. হোসায়েনের সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। লেখার খসড়াটি তিনি আমার দেখতে দিয়েছিলেন। আমি বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তনের জন্যে কিছু সুপারিশ করি। তিনি আমার অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই লেখাটি BIIT কর্তৃক A Young Muslims Guide to Religions of the World নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. হোসায়েন BIIT-এর পাক্ষিক সভায় ইতিহাসের ওপর একটি সিরিজ আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের ক্যাসেটগুলো BIIT-তে সংরক্ষিত আছে। এই বক্তব্যগুলো একটি প্রবন্ধ পুস্তক আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে অবশ্য উপযুক্ত সম্পাদনার প্রয়োজন হবে। ড. হোসায়েনের আলোচনায় আমি প্রায় সবদিনই উপস্থিত ছিলাম। বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর পড়াশোনা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাস ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তিনি চাইতেন, মুসলমানরা ইতিহাস সচেতন হোক। তিনি মনে করতেন যে, এ এলাকার মুসলমানরা যদি উপমহাদেশে ইসলামের আগমন থেকে শুরু করে তাদের ইতিহাস জানতে পারে তাহলেই কেবল তারা মুসলমান হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমানদের যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে তা বুঝতে পারবে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক The Wastes of Time বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ড. হোসায়েন একজন সত্যনিষ্ঠ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির জন্য তাঁর খেদমত অপরিসীম। সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে তাঁকে মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। তাঁর সামগ্রিক অবদানের ভিত্তিতেই তাঁকে বিচার করতে হবে।

গাজী শামসুর রহমান

গাজী শামসুর রহমান এদেশের একজন বড় আইনবিদ ছিলেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি বড় লেখক ছিলেন। বাংলাদেশে যাদের বই অনেক বেশি তাদের মধ্যে তিনি একজন। তার একটি বই আছে যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। আবার প্রায় পনের'শ পৃষ্ঠা করে বইই আছে তিন-চারটি। যদি পৃষ্ঠা সংখ্যা হিসাব করা হয় তাহলে আমার মনে হয় তার লেখা পৃষ্ঠার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি হতে পারে। ইসলামী

www.pathagar.com

আইনের ভাষ্য নামে তার লিখিত দু'হাজার পৃষ্ঠার একটি বই আমার ও আমার দুই বন্ধুর নামে তিনি উৎসর্গ করেছেন। আমার মনে হয় তার সমান কেউ লেখেননি। মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব অনেক লিখেছেন, তবু তার সমান হবে না। The Criminal Procedure Code, দু'খণ্ডের ২৪৪০ পৃষ্ঠার একটি বিরাট বই। তার ইসলামের উপর বইসহ আরো অন্যান্য অনেক বই আছে।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমি যখন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ডিজি ছিলাম। তখন এটি ছিল কেবিনেট ডিভিশনের আওতায়। কেবিনেট সেক্রেটারি নিজে এন্টিকরাপশন কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। তখন কেবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন মাহাবুবুজ্জামান সাহেব এবং এরপরে ছিলেন মুজিবুল হক সাহেব। এটি আমার সময়ের কথা। এর দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ছিলেন মুসলেহউদ্দিন আহমদ সাহেব। তিনি ইসলামপন্থী এবং তাবলীগ জামাতের প্রতি আকর্ষিত ছিলেন। এক সময়ে আমরা বন্ধু হয়ে যাই। তার রুমে বসেই আমরা দুনিয়ার আলোচনা করতাম। মার্শাল ল' থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়। তার রুমেই গাজী শামসুর রহমানের সাথে আমার প্রথম সরাসরি পরিচয় ও কথাবার্তা হয়। তবে এর আগেই গাজী শামসুর রহমানকে আমি জানতাম। তিনি খুব কথা বলতেন। সমানে কথা বলে যেতে পারতেন এবং তার কথা শেষ হতো না। সেদিন মুসলেহউদ্দিন সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। কী একটি ইসলামী বিষয় প্রসঙ্গত এসে যায়। তিনি একজন ইসলামী পণ্ডিত বলেও গণ্য। কিন্তু আমি তার বক্তব্যে বললাম, আপনি বিষয়টি ঠিক বলেননি, আসল বিষয়টি হলো এরকম। আমি তা ব্যাখ্যা করলাম। তা শুনে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। তাতে তিনি উপলব্ধি করলেন যে এ বিষয়গুলো আমি ভালো করে জানি।

পরবর্তীকালে আমি মনে করলাম ইসলামের স্বার্থে গাজী শামসুর রহমানের সাথে আমার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা দরকার। ফলে তার বাসার ঠিকানায় আমি যাওয়া শুরু করলাম। মাসে কিংবা দু'মাসে একবার করে যেতাম। খুব দ্রুত অবস্থা এমন হলো যে, তিনি ইসলামের ব্যাপারে আমার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া শুরু করলেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি তার অনেক মতামত আমার কারণেই আস্তে আস্তে পরিবর্তন করলেন। যেমন- সিভিল কোর্ট হওয়ার দরকার বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু আমার সাথে আলাপের পর তিনি মত পরিবর্তন করলেন। তাকে আমি অনেক মেটেরিয়াল দিলাম। ইন্ডিয়া থেকেও কিছু পেয়েছিলাম। তাও দিলাম। সেগুলো এতটাই গ্রহণ করলেন যে তিনি তার এক বইয়ের পরিশিষ্ট হিসেবে এসব ঢুকিয়ে দিলেন। আমার মনে আছে ইন্ডিয়ান লেখাটি সে দেশের একজন বড় আলেমের লেখা বাংলায় পেয়েছিলাম। সেটি আমিও কাজে লাগিয়েছি। বিষয়টি ছিল, কেন ইসলামী ব্যক্তিগত আইন ও হিন্দু ব্যক্তিগত আইন একত্র করে সিভিল কোড তৈরি করা সম্ভব নয়। তাতে

www.pathagar.com

তিনি কনভিন্সড হয়ে গেলেন। তেমনিভাবে তিনি পশ্চিমা এডপশন আইন গ্রহণ করা যায় বলে মনে করতেন। আমি তাকে তা বোঝালাম। আমি নিজে একটি আর্টিকেলও লিখে ফেললাম 'শিশু গ্রহণ ও পালন আইন' নামে, যা আমার একটি বইয়ে আছে। তখন এডপশনের পক্ষে একটি মত গড়ে উঠছিল যে, শিশু পালন করা তো কত ভালো কাজ। ইসলামিক ল'তে এর ইমপ্লিকেশন কি, ইসলাম এটিকে কীভাবে দেখছে বা কোন পদ্ধতিতে আমরা শিশু পালন করতে পারব - এটি বোঝার ব্যর্থতা ছিল। সব ধরনের এডপশন ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু শিশু পালনে কোনো বাধা নেই। যাহোক, তিনি এ বিষয়ে তার মত পরিবর্তন করলেন। পরবর্তীতে তিনি এর পক্ষে আর কথা বলেননি। আমার জানামতে অসংখ্য বিষয়ে তিনি তার মত পরিবর্তন করেন আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে। তেমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তার ভিতর কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। সেগুলো আল্লাহর মেহেরবানীতে দূর হয়ে যায়।

১৯৮৬ সাল থেকে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের গভীর সম্পর্ক বজায় ছিল। তার মৃত্যুর পর শুধু যে জানাযা পড়েছি তা নয়, মহাবৃষ্টির মধ্যে কবর দেয়ার সময় আমরা দশ বারো জন মাত্র উপস্থিত ছিলাম এবং আমিই তার সম্পর্কে সেখানে বলি। দোয়া করেন আমার বন্ধু মোহাম্মদ মুসা, যিনি ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন গ্রন্থে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। সেদিন খুবই বৃষ্টি ছিল।

ইসলামী আইনকে বিধিবদ্ধ করতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ কাজের উদ্যোগ নেয়। সেটি করার জন্য গাজী শামসুর রহমানকে সভাপতি করে একটি কমিটি করা হয়। সে কমিটিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক, আমি সহ অনেকেই ছিলাম। তার নেতৃত্বে এ কাজ হয় এবং তিনি প্রায় দশ বছর ধরে অবিরাম খেটে যান। এ কাজ তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে। তখন নতুন করে আর সভাপতি নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু আমি তার পরিবর্তে কাজ করে শেষ করি। তখন আমাকে কমিটির সদস্যরা বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। আমরা এ কাজের ফাইনাল ক্লিয়ারেন্স খতীব সাহেবের কাছ থেকে নিতাম এ জন্যে যে সত্যিকারভাবে কোনো কিছু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আছে কি না। আমরা অনেক এডভান্স কথা বলতাম। কিন্তু এজন্য সর্বশেষ বর্ডার ঠিক করেছিলাম এ পর্যন্ত যে, খতীব সাহেব যদি কোনো বিষয়ে না করে দেন তাহলে সেটি আমরা লিখব না। এমনকি মন যদি বলেও যে আমরা ঠিক, তবুও নয়। সেভাবেই আমরা কাজটি শেষ করি।

দশ বছরের এ প্রজেক্টে প্রতি সপ্তাহে মিটিং হতো। মিটিংগুলো হতো ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। পরের দিকে আমি অনেক সময় শরিক হতে পারতাম না বলে আমার অফিসেই মিটিং হতো। আমি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে। মূলত গাজী শামসুর রহমান, খতীব সাহেব এবং আমি মিটিং করতাম। অন্য সদস্যরাও আসত। এ কাজ করতে

www.pathagar.com

গিয়ে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি ইসলামের আইনের ক্ষেত্রে যে এডভান্স রিসার্চ হয়েছে তা সংগ্রহ করতে এবং তার ভিত্তিতেই খসড়া করা হতো। আমরা যতটুকু সম্ভব এডভান্স আইডিয়া নেয়ার চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এডভান্স আইডিয়া গ্রহণে বাঁধা দিতেন। কিন্তু গাজী সাহেব সব সময় সেগুলো গ্রহণ করতে তৈরি ছিলেন। আমরা শুধু একটি বর্ডারই মানতাম - যেটি ফাইনালি খতীব সাহেব না করে দিবেন সেটিই শুধু বাদ দিতাম। তিনি অনেক বড় আলেম। তার অনেক বিবেচনাবোধ আছে। আমরা সে হিসেবে তার মতটিই মেনে নিতাম। প্রসঙ্গত বলা যায়, খতীব সাহেবও এডভান্স আইডিয়ার পক্ষে। সব মিলিয়ে আমরা এখানে অনেক ক্ষেত্রে এডভান্স কাজ করতে পেরেছি, আবার অনেক ক্ষেত্রে পারিনি। যেমন রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হবে কি না? প্রথমে আমরা খসড়া দাঁড় করলাম যে হবে না, যেহেতু অধিকাংশ আলেমদের এটিই মত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা লিখলাম, হবে না তবে হানাফীদের মতে হবে। এটি ছিল খতীব সাহেবের মত। তবে আমরা অন্যধারাগুলোতে এভাবে দু'মতই ব্যক্ত করিনি। এখানে রাগের মাথায় তালাক সুস্পষ্ট অন্যায় বলেই আমাদের কাছে মনে হয়। তবু স্পর্শকাতর বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন ও বিতর্ক এড়ানোর জন্যেই আমরা এরকম করেছি। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে।

একাজে আমাদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হতো। আমি সব সময় এডভান্স চিন্তার পক্ষে। তবে গাজী সাহেব খতীব সাহেবকে সাংঘাতিক সম্মান করতেন। ফলে খতীব সাহেব না বলে দিলে তিনি এগুতেন না। তিন খণ্ডের এ কাজটি একটি বড় কাজ বলেই আমি মনে করি। গাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর প্রথম দু'খণ্ড আমি, মাওলানা মুসা ও ড. হারুন আবার রিভিউ করি। মাত্র পাঁচ-ছয় জায়গায় পেলাম যেখানে আমি মনে করলাম খতীব সাহেবের আবার দেখা দরকার। সেগুলোর জন্য আবার বিকল্প দেয়া হয়েছিল। খতীব সাহেব সবগুলোকেই মেনে নিয়েছিলেন। এর থেকে আমরা এ জিনিসটিও বুঝতে পারি যে খতীব সাহেব প্রগ্রেসের পক্ষে, ইসলামের বিকাশের পক্ষে।

যাহোক, গাজী সাহেব প্রসঙ্গে আসি। গাজী সাহেবের স্ত্রী আমার খুব সম্মানের পাত্রী হয়ে যান। তার বাসায় আমার যাওয়া আসা ছিল। এ প্রজেক্টের কাজেও মিটিং হতো। উনার স্ত্রী অনেক মেহমানদারী করেছেন। গাজী সাহেবের সাথে প্রজেক্টের কাজ ছাড়াও মানবাধিকার বিষয়সহ অন্যান্য আরো অনেক কাজে জড়িয়ে যাই। তিনি বহু জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতেন, বিশেষ করে যেখানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা দরকার হতো।

আমি তাকে একটি কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি তা করে যেতে পারেননি। আমি তাকে তার বইগুলোকে নতুন করে রিভিউ করে যাবার কথা বলেছিলাম। কারণ ইতোমধ্যে তার অনেক আইডিয়ার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে সেগুলো যদি

www.pathagar.com

পরিবর্তন না করা হয় তাহলে লোকে পূর্বের মতকেই গাজী সাহেবের মত বলে মনে করবে। কিন্তু তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেননি। করলে ভালো হতো। তার সংশোধিত মতগুলো মানুষ জানতে পারত।

এটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, এত বড় একজন ব্যক্তির সাথে আমার গভীর সম্পর্ক এবং পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে তার মৃত্যুর পরে তার শোকসভাতে বক্তৃতা দিতে বলেছিলেন। সেটি আমি কবরস্থানে করেছিলাম। আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে লিখেছিলাম তার মৃত্যুবার্ষিকী যেন প্রতি বছর পালন করা হয়। কিন্তু তারা সেটি করল না। আমি তার ডিজি জনাব আবদুল আউয়ালকে লিখেছিলাম। তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা মানে সেখানে ইসলামের কথা চলে আসা। এটি বাংলা একাডেমীরও করা উচিত। তিনি বাংলা একাডেমীর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তার সভাপতি ছিলেন।

এ বড় মাপের মানুষটি আজকে যে সামনে আসছে না তার কারণ ইসলাম। ইসলামে যেহেতু তিনি বড় ছিলেন সেজন্য তাকে কেউ স্মরণ করতে চায় না। কারণ তাকে পালন করলে তো ইসলামের কথা চলে আসবে। তাই বলা যায়, আসল কারণ ইসলাম, গাজী শামসুর রহমান নয়। আর আমরা তো দেখতেই পাই যাদের ভিতর ইসলাম নেই তাদেরকে নিয়েই আজ আমরা বেশি আলোচনা করি। তাতে ইসলামের কোনো বিষয়ই আসে না।

একজন চিন্তাবিদ শাহেদ আলী

শাহেদ আলী সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই আমি তার সাথে আমার পরিচয়, ব্যক্তিগত জানাশোনার কথা বলব। এ প্রসঙ্গে তার সাথে আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তাগুলোও চলে আসে।

শাহেদ আলী সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয়কাল এ মুহূর্তে একদম সঠিকভাবে না বলতে পারলেও বলা যায় ১৯৬২ সালের দিকে কিংবা তার কিছু আগে। সেটি কোথায়, কখন, কিভাবে তাও মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে পড়ে তৎকালীন ইসলামিক একাডেমীতে প্রথম পরিচয় হয়। সে সময় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের কাছে একটি দালানে ইসলামিক একাডেমীর অফিস ছিল। এখন যেটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে পরিচিত। সে দালানের বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি বসতেন। এর মধ্যে একটি কক্ষে মরহুম আবুল হাশিম সাহেব, যিনি ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন, বসতেন। একটি কক্ষে মরহুম ফারুক মাহমুদ বসতেন। এরকমই একটি কক্ষে আমাদের প্রিয় ভাই শাহেদ আলী বসতেন। সে কক্ষে আমি অসংখ্যবার গিয়েছি।

www.pathagar.com

তখন শাহেদ আলী সাহেব ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন সময় দেশে যে তিন চারটি প্রধান পত্রিকা বের হতো তার মধ্যে সেটি অন্যতম ছিল। সেটি ছিল চিন্তামূলক, গবেষণাধর্মী পত্রিকা। আমার ব্যক্তিগত মতে সেটি ছিল সে সময় এক নম্বর। তার পৃষ্ঠার সংখ্যাও ছিল দু'শর মতো। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ছিল। তাতে দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা স্থান পেতো। দেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবীদগণ থেকে শুরু করে যারা অন্তত ইসলাম বিরোধী ছিলেন না তাদের লেখা স্থান পেতো। তারাও লেখা দিতেন। এটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত ছিল। ছাপার মানও ভালো ছিল। আমারও চার পাঁচটি লেখা সে পত্রিকায় পয়ষট্টি থেকে সত্তর সালের মধ্যে ছাপা হয়।

আমি সে সময় থেকে শাহেদ আলী সাহেবের সাথে মিশেছি। এতে তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানার সুযোগও আমার হয়েছিল। তখন থেকেই আমি তার ব্যক্তিগত চরিত্রও লক্ষ্য করি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত ব্যক্তি। তিনি আস্তে আস্তে কথা বলতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে Soft speaker। তিনি শান্তভাবে কথা বলতেন। চড়াগলায় কথা বলতেন না। আমি তাকে কখনো চড়াগলায় কথা বলতে দেখিনি। সকল মানুষের সাথে তার একটি সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। বোধহয় তিনি সবার সাথে সহৃদয় সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি খুব নরম প্রকৃতির এবং উপলব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

সে সময় আমি তার যে বড় পরিচয়টি পাই সেটি হলো, তিনি একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতেন। আমাদের জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়েও ভাবতেন। তার ভিতর এসব চিন্তার জন্যে গভীর একটি ভাবনার বিশ্লেষণ শক্তি দিল।

যদিও তার প্রবন্ধ সংখ্যা আমার জানা নেই, তারপরও যতটুকু আমি জানি তার যে সমস্ত প্রবন্ধ রয়েছে তাতে তার যে অন্তর্দৃষ্টি বা বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি প্রবন্ধের কথা বলতে পারি 'সাম্প্রদায়িকতা'। ইসলামের উপর একটি অভিযোগ হলো ইসলাম সাম্প্রদায়িক, যেটি প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। ইসলাম যে সাম্প্রদায়িক নয় তিনি সে প্রবন্ধে তা প্রমাণ করেন। তার এরকম প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যায় তিনি কত বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার প্রবন্ধ ও চিন্তার দিকগুলো আমাদের জানা দরকার। তবে তিনি তার কোনো জীবন কাহিনী লিখে যাননি যার মাধ্যমে তার চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্তারগুলো আমরা জানতে পারব। কিন্তু তার সম্পর্কে লেখাগুলো তার বন্ধুবান্ধব থেকে আমরা কিছুটা পাব। যেমন, গফুর সাহেবের লেখা নিজের আত্মজীবনী ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে। সেখান থেকেও আমরা শাহেদ আলী সম্পর্কে জানতে পারি।

তবে শাহেদ আলী সাহেব যে একজন বড় চিন্তাবিদ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা বাংলাদেশে ফেলাফতে রব্বানী পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দল। এর একটি তমুদ্দুনিক বা

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক শাখা ছিল, তা তমুদ্দুন মজলিশ নামে পরিচিত। এ দু'সংগঠনেরই তিনি প্রথম সারির ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নামে যে পলিটিক্যাল এলায়েন্স হয়েছিল সে এলায়েন্সে রব্বানী পার্টি একটি অংশ ছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন কি দু'জন তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। তার মধ্যে শাহেদ আলী সাহেবও ছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত আমি রব্বানী পার্টি ও তমুদ্দুন মজলিশ সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলতে চাই। ইসলামের যে ইতিহাস তার গতিধারায় নানা চিন্তার বাঁক (turn) রয়েছে, বা এর গতিধারায় নানা আন্দোলন উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। এর মধ্যে খেলাফতে রব্বানী পার্টি এবং তমুদ্দুন মজলিশও এ ইতিহাসের গতিধারায় সময়ের প্রয়োজনেই দেখা দিয়েছিল। এখানে বলতে হয়, সমাজতন্ত্র যখন বিশ্বব্যাপী একটি ব্যাপক আন্দোলন হিসেবে দেখা দেয় তখন তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে প্রভাব মুসলিম বিশ্বে যেমন পড়েছিল, মুসলিম মনন ও মানসেও তেমনি পড়েছিল। তারই একটি রূপ ছিল রব্বানী পার্টি। সেখানে রব্বানী দর্শন ছিল আল্লাহ পালনকর্তা (রব শব্দ থেকে রব্বানী)। যেখানে আল্লাহ পালনকর্তা, সেখানে বিশ্বের মানুষকে তা পালন করতে হবে। কাজেই এ দর্শন পালন করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেরকম করার দরকার সেরকম করতে হবে। তাতে যদি ব্যক্তিগত সম্পদকে বিলুপ্ত করতে হয় এবং সকল কিছু যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিতে হয় তাও করতে হবে। যতটুকু আমি বুঝি তাতে এ হলো রব্বানী দর্শনের সারমর্ম।

এর পিছনে সবাই ইসলাম মনা লোক ছিলেন। তারা সবাই ইসলামকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা অস্বীকার করা ঐতিহাসিক বিচারে ঠিক হবে না যে, সমাজতন্ত্রের ইসলামী চিন্তার উপর বা ইসলামী উম্মাহর উপর প্রভাবেরই একটি প্রকাশ ছিল এ রব্বানী দর্শন, রব্বানী পার্টি এবং তমুদ্দুন মজলিশ। এ প্রভাব বিশ-ত্রিশ বছরের মতো ছিল। কিন্তু ক্রমেই এটি থিতিয়ে আসে। আর এদিকে সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলো ধরা পড়তে থাকে। ইতোমধ্যে সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাগুলো ধরা পড়ে গেছে। ফলে এ প্রভাব একটি সময় এসে ক্ষীণ হয়ে যায়, থিতিয়ে যায়। বলা যায়, এ চিন্তাধারার অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার যে প্রভাব ইসলামের উপর তা প্রায় চলে গেছে। ফলে বর্তমানে তমুদ্দুন মজলিশের উপর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার আর কোনো প্রভাব অবশিষ্ট নেই। এটি একটি ইসলামিক সাংস্কৃতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

শাহেদ আলী সাহেবের সঙ্গে এখানে আমি প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরে কিছু কথা বললাম। দ্বিতীয়বার যখন তার সাথে খুব বেশি মিশতে সুযোগ পাই তখন আমি সরকারি দায়িত্ব পালন উপলক্ষে খুলনায় থাকি। সেখানেই আমার কর্মস্থল। তার পূর্বে

www.pathagar.com

আমি ঢাকায় ছিলাম। আমার খুলনায় যাওয়ার আগেই তিনি তার বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ 'মক্কার পথ' – যেটি মুহাম্মদ আসাদের Road to Macca থেকে অনূদিত, তার কাজ শুরু করেন। Road to Macca আমি ১৯৬২-৬৩ সালের দিকে প্রথম পড়ি এবং সে বই দ্বারা আমি খুব প্রভাবিত ছিলাম। কারণ 'রোড টু মক্কা' শুধু মক্কার পথে নয়, এটি হলো মুহাম্মদ আসাদের জার্নি টু ইসলাম। ইসলামের পথে তার যে ভ্রমণ বা তার যে অগ্রগমন, যে যাত্রা তারই বর্ণনা। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ আসাদ ইসলামের সম্পূর্ণ দর্শন, ইসলামের লক্ষ্য, ইসলামের ঐতিহাসিক অবস্থান এবং ভবিষ্যতের অবস্থা সবই তিনি এখানে তুলে ধরেন। এটি তার অর্টোবায়োগ্রাফি, তার আত্মজীবনী।

আমি সব সময় ব্যক্তিগতভাবে বইটির অনুবাদ হবার কথা ভাবতাম। শাহেদ আলী সাহেবকে এ বইটি অনুবাদ করার কথা বলি। অন্যেরাও হয়তো বা বলেন, কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলি। বইটি যখন অনুবাদ শুরু হলো তিনি খুব আস্তে আস্তে এগুচ্ছিলেন। অনেক সময় থেমে যেতেন, অনুবাদ প্রকাশ হতো না। সেটি ধারাবাহিকভাবে একটি পত্রিকায় প্রকাশও হচ্ছিল। কিন্তু যখন দেখতাম একটি সংখ্যা বের হলো কিন্তু অনুবাদটি নেই তখনই আমি অনুভব করতাম তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার। ফলে আমি খুলনা থেকে প্রতি সপ্তাহে দু'বার তাকে টেলিফোন করতাম রিমাইন্ড করার জন্য যে আপনি এটি নিয়মিত করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না। এটি আপনি করে যান। আল্লাহর রহমতে আমার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তবে নিশ্চয়ই অন্যেরাও চাপ দিয়েছে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত বইটির সফল অনুবাদ হয় এবং বাংলা সাহিত্যে এর সুবাধে একটি অমূল্য এবং অনন্য গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে। বাংলা ভাষার সাথে সাথে ইসলাম এতে বেনিফিটেড হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি জনাব শাহেদ আলী এ অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় আমার সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার ছোট ভাই শাহ আবদুল হান্নান যখনই আমি থেমে গেছি তখনই খুলনা থেকে আমাকে টেলিফোনে স্মরণ করিয়ে দিতো'। এজন্যও আমি কৃতজ্ঞ যে উনার সাথে আমার যে একটি সম্পর্ক ছিল সেটি ইতিহাসে থেকে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা এতবড় একটি মূল্যবান কাজে আমার যে অংশগ্রহণ তা আমাকে খুব আনন্দ দেয়।

কথাশিল্পী ও মানবতাবাদী শাহেদ আলী

শাহেদ আলী একজন কথা সাহিত্যিক। অনুবাদ সাহিত্যেও তার হাত ছিল অসামান্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি যা রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে তা অমূল্য সম্পদ। গল্প, অনুবাদ, সম্পাদনা, সংগঠন সব কিছুতেই তিনি তার দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি ছিলেন অমায়িক। এর আগের লেখায় আমি

www.pathagar.com

শাহেদ আলী সম্পর্কে কিছু বলেছি। এখানে দু'একটি কথাই শুধু বলব।

যদিও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা খুব একটি এখানে আসবে না, কিন্তু একটি দিক উল্লেখ করা দরকার। একটি ক্ষেত্রে তিনি সবার কাছেই সুনাম অর্জন করেছেন - সেটি হলো তার গল্প, কথাশিল্পী হিসেবে তার অবদান। তার অনেক গল্প রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গল্প 'জিবরাইলের ডানা'–যেটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় স্থান পেয়েছে।

শাহেদ আলীর 'জিবরাইলের ডানা' গল্প নিয়ে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যা লিখেছেন তাকে কেউ কেউ ইসলাম বিরোধী বলে হইচই বাঁধিয়েছিল। তিনি যা লিখেছেন তা ইসলাম বিরোধী ছিল কি না, এ প্রশ্নটিও বিভিন্ন সময়ে এসেছে। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝি এ সমস্যাটি আমাদের বারবার হতে পারে যদি আমরা রূপকের বিষয়টি ভালো করে না বুঝি। প্রতিটি কথা যদি আমরা শাব্দিক অর্থে নেই তা হলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি আমরা রূপকের বিষয়টি ভালো করে বুঝি যে রূপকের কথাকে শাব্দিক অর্থে নিলে চলবে না, রূপককে রূপক হিসেবেই নিতে হবে এবং আমরা যদি রূপক বুঝতে ভুল বা বাড়াবাড়ি না করি তাহলে ভালো হবে। এটি এ জন্যেই বলা যে এটি না হলে সাহিত্যিকদের যে স্বাধীনতা তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। সেটি যদি ক্ষুণ্ন হয় তাহলে তা পরিণামে ইসলামী সাহিত্যেরই ক্ষতি হবে। আর ইসলামী সাহিত্যের ক্ষতি হওয়া মানে পরোক্ষভাবে ইসলামেরই ক্ষতি হওয়া। ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রারই ক্ষতি হওয়া।

শাহেদ আলী সাহেব একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার গল্পগুলোও সে চিন্তারই প্রতিফলন। তার চিন্তার গভীরতা ছিল। তিনি অনেক ভালো ভালো গল্প লিখেছেন । তার গল্পগুলো আমাদের ভালোভাবে পড়ে উপলব্ধি করা দরকার।

আমি শাহেদ আলী সাহেবকে আমার একজন বন্ধু জানতাম। তিনি সৎ ছিলেন। ভদ্র, মার্জিত স্বভাবের ছিলেন। তাকে বন্ধুর চেয়েও বড় মনে করে আমার একজন সিনিয়র মুরব্বি জানতাম। যদিও শেষ জীবনে তার সাথে খুব বেশি যোগাযোগের সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু আমি অনুভব করি, ইসলামের মানবতাবাদী যে ধারা তিনি তার প্রতিনিধি ছিলেন। এটি তো স্বাভাবিক, এতো বড় বিশ্ব আন্দোলন (ইসলাম), বিশ্ব সভ্যতা তার তো বিভিন্ন ধারা থাকবেই। সে ধারারই একটি হলো মানবতাবাদী ধারা। যেখানে কুপমণ্ডুকতা কম, গোঁড়ামি কম, বাড়াবাড়ি কম। শাহেদ আলী সহেব সে মানবতাবাদী ধারার, কিন্তু তা সর্বাংশে ইসলামিক। ইসলামী সীমার মধ্যে তিনি মানবতাবাদী। ইসলামের অন্তর্গত যে মানবতাবাদ তিনি তার প্রতিনিধি ছিলেন।

তার মৃত্যুতে বাংলাদেশে চিন্তা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা অন্যকে পূরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মুক্ত মনের সাধক আবদুল মান্নান তালিব

আবদুল মান্নান তালিব সাহেব আমার খুব নিকট বন্ধুদের একজন। কলেজে পড়ার সময় থেকে তার সাথে আমার পরিচয়। আমি ছাত্রজীবনেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আবদুল মান্নান তালিব সাহেবও ইসলামী আন্দোলনেরই কর্মী। তার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে। সেটি একটি মুসলিম এলাকা। ঢাকার নবাবপুরে জামায়াতে ইসলামীর অফিসের নিচেই তিনি থাকতেন। তার সাথে আমার সেখানেই পরিচয় হয়। আমি যখনই জামায়াতের অফিসে যেতাম তখনই তার সাথে দেখা করতাম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে তো আলাপ হতোই। আলোচনায় আরো থাকত এ এলাকার ভবিষ্যৎ কি, আমাদের করণীয় কি, ইসলামের অবস্থা কি ইত্যাদি নানা বিষয়।

আমি তার সাথে বিভিন্নভাবে একত্রে কাজ করেছি। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল 'পাক সাহিত্য সংঘ' গঠন। যদিও এসব বিষয় সম্পর্কে ইতিহাস ভালো করে লেখা হয়নি। আমার বন্ধু, ছোট ভাই অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান অবশ্য কিছুটা লিখেছেন। তালিব সাহেবেরও এ বিষয়টি নিয়ে লেখা উচিত। 'পাক সহিত্য সংঘ' নামে সাহিত্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম আমরা পাঁচজন, তার মধ্যে তালিব সাহেব একজন, তাকে আমরা এর সভাপতি করেছিলাম। মুহম্মদ মতিউর রহমান ছিলেন, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লোক, অধ্যাপনা করতেন। একজন ছিলেন নূরুল আলম রইসী। তিনি এখন আমেরিকা থাকেন। তিনিও বাংলা সাহিত্যের লোক। আরেকজন ছিলেন সালেহ উদ্দিন জহুরী। তিনি পত্রিকায় কলাম লিখতেন। আর ছিলাম আমি।

'পাক সাহিত্য সংঘ' মূলত পাঁচ জনের প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। তখন আমার কিছু লেখা হতো না যদি 'পাক সাহিত্য সংঘ' না হতো। এ সংগঠন থেকে তখন ঢাকায় বেশ কয়েকটি সেমিনার করা হয়। ষাট দশকই ছিল মোটামুটিভাবে এ সংগঠনের আয়ুষ্কাল। সে সময়ের অনেকের হয়ত মনে হতে পারে এটি তেমন ভালো কিছু করতে পারেনি। কিন্তু আমরা যদি মুসলিম প্রেক্ষিত বিবেচনা করি তাহলে দেখব তখনকার তিন চারটি প্রধান সাহিত্য সংগঠনের মধ্যে এটি ছিল একটি। তালিব সাহেব এখানে অনেক কাজ করেন। এ সংগঠনের ফলেই আমরা তৈরি হই।

আমি সরকারি চাকরিতে যাওয়ার আগে 'নিউ এরা পাবলিকেশন্স' নামে একটি ছোট্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কয়েকজন মিলে গড়ে তুলি। তালিব সাহেব 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' নামে একটি বই লিখেন। মেয়েদের সমস্যা, দাবিদাওয়া, অধিকার ইত্যাদি ছিল বইটির বিষয়। সে বই প্রকাশ করার চিন্তা করেই আমরা এ 'নিউ এরা পাবিলিকেশন্স' করেছিলাম। অবশ্য নানা কারণে এ 'নিউ এরা পাবলিকেশন্স' টেকেনি। অবরুদ্ধ

www.pathagar.com

জীবনের কথা বইটিই ছিল এখান থেকে প্রকাশিত একমাত্র বই। তালিব সাহেবের কাছে এ বইয়ের কপি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এর কোনো কপি নেই। এ বইটি ছিল নারীদের পক্ষে কথা বলা এ দেশে প্রথম সাহসী গ্রন্থ। এখন নারীদের উপর অনেক বই বেরিয়েছে। সে সময় নারীদের পক্ষে যেসব উদ্যোগের কথা বলা প্রয়োজন ছিল, তিনি সে পরিপ্রেক্ষিতে যতটি বলা সম্ভব বলেছিলেন।

আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাদ দিয়ে আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তিনি শুরুতে কবিতা লিখতেন। তবে এ পর্যন্ত তার কোনো কবিতার বই বের হয়নি। সেসব কবিতা আজ একত্রিত করে অন্তত একটি বই হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন কবি। কবিত্বশক্তি তার মধ্যে গভীরভাবে রয়েছে। একে তিনি কেন লালন করেননি সেটি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ১৯৬৩ সালের পর থেকে বেশ কিছু সময় আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম।

তালিব সাহেব ইকবাল গবেষক ও অনুবাদক। ইকবালের বেশ কিছু গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করেছেন। সেগুলো পাকিস্তান আমলেই করেছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে বেশিরভাগ তিনি ছন্দে অনুবাদ করেছেন। এটি স্বাভাবিক যে ইকবালের কবিতাকে তো কবিতায় অনুবাদ করতে হবে। সেটিই তিনি করেছেন। তার অনুবাদ খুব সফল অনুবাদ এবং অনুবাদে তিনি মূল কবিতার স্পিরিটকে ট্রান্সফার করতে পারতেন। ইকবালের কবিতার মূল স্পিরিটকে যারা অনুবাদে সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। তিনি আরবি জানেন বলেই সব মিলিয়ে তার পক্ষে এ কাজ করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। আর যাদের এরকম সুবিধা ছিল না তাদের পক্ষে অনুবাদ করলেও সে অনুবাদ অতটা সফল হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মূলভাবের রূপান্তর সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। ইকবালের উপর তার বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধও আছে।

আবদুল মান্নান তালিব উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ লিখেছেন। এর মধ্যে একটি হলো 'বাংলাদেশে ইসলাম'। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইসলামের উপর তার মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থ তাকে একজন মৌলিক লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার বেশিরভাগ গ্রন্থই গবেষণামূলক। প্রচুর পড়াশুনা করে তিনি এসব গ্রন্থ লিখেছেন, সেটি আমি দেখেছি।

আবদুল মান্নান তালিব একজন মুক্ত মনের মানুষ। আমি তার মধ্যে কখনোই কোনো গোঁড়ামি লক্ষ্য করিনি। তাকে উদারচিত্তের একজন মানুষ হিসেবে পেয়েছি। তার মধ্যে উদারচিন্তা দেখেছি। তিনি কোনো মত বা মাযহাবের অন্ধ অনুসারী নন। তিনি

www.pathagar.com

ইজতেহাদে বিশ্বাস করেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ইজতেহাদ যাতে বেশি হয় এবং এগিয়ে যায় সে জন্য তিনি লিখেছেন। তিনি নিজেও একজন ফিকাহবিদ। এক্ষেত্রে তিনি এতই জ্ঞান রাখেন যে ইসলামের বহু বিষয়ে মতামত দিতে পারেন। আইনের ক্ষেত্রে যারা মতামত দিতে পারেন তাদেরকেই আমরা ফিকাহবিদ বলি। আবদুল মান্নান তালিবের এ যোগ্যতা অবশ্যই আছে যে তাকে ফিকাহবিদ বলে গণ্য করা যায়। কেননা এক্ষেত্রে তার পড়াশুনা ব্যাপক। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মতামত দিয়েছেন সেগুলোকে এভাবেই দেখতে হবে বলে আমি মনে করি।

আবদুল মান্নান তালিবকে আমি নারীর একজন বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। এ অর্থে যে, তিনি প্রথম যে বই লিখেছেন 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' নামে তা নারী বিষয়ক। পরবর্তী সময়ে আমরা দু'জনেই জড়িত হয়ে যাই 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহর 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি যখন আমার হাতে ড. আহমদ ততুনজি (ছয়টি খণ্ড) তুলে দেন তখন এ বইটি প্রকাশের জন্য আমি তালিব সাহেবকে নিয়ে একটি গ্রুপ করে আলোচনা করি। ড. আহমদ ততুনজি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ এবং সংগঠক। তিনি এক সময় 'আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন'-এর (এএমএসএ) সভাপতি ছিলেন। তার দেয়া বইটি সে গ্রুপকে অনুবাদ করতে দিই। তালিব সাহেব তার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। বইটির ৩য় খণ্ড প্রথম বের হয়। যে কোনো কারণেই হোক বইটির ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড আগে বের হয়নি। ১ম খণ্ডের বিষয়বস্তু মূলত কোরআনে নারীর অবস্থা এবং ২য় খণ্ডে ইসলামে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহয় নারীর কি কি অধিকার আছে সেসব বিষয়ে। ৩য় খণ্ডে ১ম ও ২য় খণ্ডের যেসব বিষয় সমালোচনা বা প্রশ্ন ওঠে বা উঠতে পারে সেসব প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন। অর্থাৎ ৩য় খণ্ড ১ম ও ২য় খণ্ডের ব্যাখ্যা। এ অর্থে এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড। ৩য় খণ্ড বের হওয়ার পর বেশ কিছু কপি আমরা বিক্রি করলেও এর বিরুদ্ধে একদল লোক দাঁড়িয়ে যায়। তারাও ইসলামের কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা আমার ও তালিব সাহেবের সমালোচনা করে বইটি যাতে সার্কুলেট না হয় সে চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা সে বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হই। এরপর ১ম খণ্ড বের হয়।

২য় খণ্ডটি প্রিন্টের উপযোগী হয়ে ট্রেসিং অবস্থায় ছিল। ট্রেসিং থেকেই আমি ফটোকপি করে কয়েকশ কপি ছড়িয়ে দেই। আস্তে আস্তে এ আপত্তি থিতিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত (৭/৮ বছর ট্রেসিং অবস্থায় থাকার পর) বইটি BIIT বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট) প্রকাশ করে। ৩য় খণ্ডের ভূমিকায় তালিব সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন তাতে সাহসিকতা ছিল। কথাগুলো নারীর পক্ষে ছিল, যার জন্য তাকে নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি তিনি সেসব কথাই

www.pathagar.com

লিখেছেন যা তিনি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন এবং তিনি সে কথা আমাকে বলেছেনও। তিনি এগুলো সহ্য করেই একাজটি করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব আমার বন্ধু। আমরা প্রায় একই বয়সের। ব্যক্তি হিসেবে খুবই চুপচাপ থাকেন। নিরহংকারী মানুষ। খুব বেশি কথা বলেন না। এজন্যই তাকে আমি নীরব কর্মী বলব। আসলে তিনি একজন নীরব নেতা। তার চেয়ে হয়ত অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে দেশের অনেকেই চেনে। কিন্তু সে তুলনায় তাকে চিনতে পারেনি। এটি আমাদের ব্যর্থতা। যারা তার বন্ধুবান্ধব তাদেরও ব্যর্থতা। তরুণদেরও ব্যর্থতা যে তারা এরকম একজন মানুষকে উপরে তুলে আনতে পারেনি। হয়ত তারা এখন এ কাজটি ধীরে ধীরে করতে শুরু করেছে এবং এটি করাই উচিত।

মোহাম্মদ ইউনুছ ছিলেন ইসলামের এক সম্পদ

প্রায় চল্লিশ বছরের পরিচয় মোহাম্মদ ইউনুছের সঙ্গে আমার। আমি যখন প্রথম সার্ভিসে যোগ দেই তখন আমার পোস্টিং হয় চট্টগ্রামে কাস্টমস কালেক্টরেটে। এর আগে লাহোরে ট্রেনিং হয়। চট্টগ্রামে আমি তিন বছরের মতো ছিলাম। মোহাম্মদ ইউনুছ তখনও বোধহয় ছাত্র। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সংঘ করতেন। আমিও ছাত্র সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সেটিই ছিল তখন আমাদের পরিচয়ের ভিত্তি।

আমরা জানি মোহাম্মদ ইউনুছ ছাত্র রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছিলেন। তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সময় সারা দেশের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব যখন কেন্দ্রীয় সভাপতি হন তখন তিনি সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। যার ফলে ছাত্র রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে তার যা করণীয় তা তিনি করেছেন।

ছোট ভাই ইউনুছ ও আমার মধ্যে সব সময় যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। তাকে আমি বিভিন্ন কাজে অগ্রগামী পেয়েছি। ইসলামী ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন উঠল তখন যারা ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তখন ইন্টেলেকচুয়াল পর্যায়ে একটি কাজ হচ্ছিল ইসলামী ব্যাংক করার জন্যে। সেটি ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো করছিল। এর ভিতরে ও বাইরে জনাব আযিযুল হক সাহেব কাজ করছিলেন। কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক ও ট্রেনিং ওয়ার্ক যতই করা হোক, যদি উদ্যোক্তা প্রস্তুত না করা যেত তাহলে আর ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। সে সময় তাই প্রত্যেকটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক, ট্রেনিং ওয়ার্ক ও উদ্যোক্তা সংগ্রহ তিনটিই তখন গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইসলামী ব্যাংক যখন গঠন

www.pathagar.com

করার প্রশ্ন উঠল তখন বিদেশী উদ্যোক্তা গ্রহণ ও দেশী উদ্যোক্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে যারা সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে মোহাম্মদ ইউনুছ দেশী উদ্যোক্তাদের সিলেকশনের ক্ষেত্রে যারা প্রধান প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন। বিদেশী উদ্যোক্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে মরহুম ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীব ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, ইসলামী ব্যাংক গঠনে ফুয়াদ আল খতীবের ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। তার যে সাপোর্ট, পরামর্শ, সাহায্য সেটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এ কথাও বলা উচিত, বাংলাদেশে অনেক ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে জনাব খতীবের বড় ভূমিকা ছিল।

ইসলামী ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন মোহাম্মদ ইউনুছ তার বোর্ড অব ডিরেক্টরসে চলে আসেন। প্রথম বোর্ড থেকেই তিনি ছিলেন। তিনি এ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত। মৃত্যুর সময় তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ইসলামী ব্যাংক এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তার সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করেছেন। অর্থাৎ তিনি যতটুকু উপলব্ধি করেছিলেন, যতটুকু বুঝেছিলেন, যেভাবে বুঝেছিলেন তার উপলব্ধি মোতাবেক তিনি সর্বোচ্চ খেদমত দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সবারই উপলব্ধি একই রকম হয় না, কিন্তু তিনি তার উপলব্ধি মোতাবেকই খেদমত করেছেন এবং এক্ষেত্রে তার খেদমত অতুলনীয়। যারা এ ব্যাংকের জন্য অনেক বেশি খেদমত করেছেন, তার মধ্যে তিনি একজন।

মোহাম্মদ ইউনুছ ব্যাংকসহ সব প্রোগ্রামেই অগ্রণী ছিলেন। 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম'–এর যে প্রোগ্রাম তাতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ স্কিমের মাধ্যমে তার লক্ষ্য ছিল, যদি বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে এ প্রোগ্রাম পৌঁছানো যায় তাহলে ইসলামের পদ্ধতিতে গ্রাম উন্নয়ন সম্ভব হবে, উন্নয়ন দেখানো যাবে। আমি একে সঠিক চিন্তাই বলে মনে করি। যদিও এ মতও আছে, এটিকে এমনভাবে করতে হবে যাতে এটি দৃঢ়ভাবে সংঘটিত হয়, শক্তিশালী হয়। দুর্বলভাবে এটি করলে হবে না। এ দু'মতই এখানে আছে, কিন্তু মোহাম্মদ ইউনুছ ভাবতেন যে আটষট্টি হাজার গ্রামে এটিকে নিয়ে যেতে হবে পনের থেকে বিশ বছরের মধ্যে। আমি এ মতকেই সমর্থন করি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যে 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম'-এর আওতায় এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তাকে আগে সুসংহত করতে হবে। প্রত্যেক স্তরে সুসংহত হওয়ার পরে দ্বিতীয় স্তরে যেতে হবে। এজন্য যদি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে নতুন সংগঠনের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাও গড়ে তুলতে হবে। যদি ইসলামী ব্যাংকের আওতায় বা বাইরে নতুন কাঠামো গড়তে হয় তা করার উদ্যোগ নিতে হবে। যাহোক, আমার মনে পড়ে 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের' জন্য মোহাম্মদ ইউনুছের কী ব্যাপক আগ্রহ এবং পরিশ্রম ছিল।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ইউনুছ প্রথম দিন থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দান করেন সে থেকেই অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। তার পরিশ্রম, দরদ ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা তিনি এ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কাজ করে গেছেন। এ আন্দোলনের ফাইন্যান্স জোগাড় করার জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। তিনি সব জায়গায় গিয়েছেন ফাইন্যান্সের জন্য। হয়ত নিজেকে অনেক জায়গায় ছোট করেছেন তবু সেটিকে তিনি পরোয়া করতেন না। নিজেকে ছোট করেও যদি ইসলামী আন্দোলনের অর্থ সংগ্রহ করা যায় তার জন্যে তিনি তা করার চেষ্টা করেছেন।

মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটির সাথে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন এবং এ সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। তার একটি উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে মুসলিম উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং এদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে নিয়ে আসা। এর সাথে সাথে ইসলামী মনা ব্যবসায়ীদেরকেও সংগঠিত করা তার লক্ষ্য ছিল। যদিও এ সংগঠনটির যতটুকু অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। আমার মনে হয় তা করতে হবে। এটিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ সবারই নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

যতটুকু জানি, তিনি আন্তর্জাতিকভাবেও মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজের ব্যবসার কাজে যখনই বিদেশ যেতেন তাতে সেসব দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন যাতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইসলামের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়। আমার মনে পড়ে তুরস্কের 'মোসাইদ' নামে একটি শক্তিশালী ব্যবসায়িক গ্রুপ আছে, তিনি তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। 'মোসাইদ' নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে আসলে আমার সঙ্গেও তারা সাক্ষাৎ করেন। একটি কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে আমিও বক্তা ছিলাম। মোহাম্মদ ইউনুছ এ সমস্ত কাজ করতেন।

তিনি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল বিতরণ করতেন। তিনি ইসলামের জন্য লিফলেট, বইপত্র, পেপার কাটিং ব্যাপকভাবে বিলি করতে পছন্দ করতেন। আমিও এটি করি। যারা আমাকে চেনেন, জানেন তারা এটি ভালো করেই জানেন। এমনও হয়েছে, তখন আমার ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেশন থাকার কারণে আমি উনাকে বলেছি, আমাকে কিছু বই কিনে দিতে, তিনি বিভিন্ন সময় আমাকে কিছু কিছু বই কিনে দিয়েছেন, সেগুলো আমি বিলি করেছি। বহুলোকই আমাকে আমার এ কাজে সাহায্য করেছে, মোহাম্মদ ইউনুছের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

আমি শেষে এ কথাই বলব যে, মোহাম্মদ ইউনুছ ইসলামের, ইসলামী আন্দোলনের এক সম্পদ ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক সুসন্তান, ইসলামের এক সুসন্তান।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
একজন আল্লাহতে সমর্পিত ব্যক্তি

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বয়স আমার কাছাকাছি ছিল। আমি ১৯৬১ সালে মাস্টার্স পাস করি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আর তিনি আমার দুই কি তিন বছর পর অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং উচ্চ পর্যায়ে নানা দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে আমরা নানাভাবে জড়িত ছিলাম। আমরা একত্রে অনেক কাজ করেছি। তবে পরবর্তী সময়গুলোতে তার সাথে আমার যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে কম হতো।

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর উঠতি জীবনে বা গঠন পর্যায়ে আমার সঙ্গে তার অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা দু'জনেই ফজলুল হক হলে থাকতাম। সে সময় আমি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের একজন সিনিয়র ব্যক্তি ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরে ছাত্র সংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলাম। সে সময় আমি যাদেরকে ছাত্র সংঘে নিয়ে আসি তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। একই সময় আমার প্রচেষ্টায় আরো যারা আসেন তাদের মধ্যে এ. কে. এম. নাজির আহমদ সাহেবের কথা মনে পড়ছে। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক হন এবং বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। এক সময় তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

ইউসুফ আলী সাহেব তার নিজের ইসলামী আন্দোলনে জড়িত হবার কাহিনী সমপর্কে কি বলে গেছেন তা আমার অবশ্য জানা নেই। তবে যতটুকু আমার মনে পড়ে তাকে আমি ইসলামী সাহিত্যের বইপত্র দেই। তার উপর প্রায় বছর খানেক কাজ করি। তারপর তিনি ছাত্র সংঘে যোগদান করেন।

সে সময়ের দিনগুলোতে তার সঙ্গে আমার গভীর পর্যায়ের সম্পর্ক ছিল। তিনি তার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। স্বাভাবিকভাবে সিনিয়র হিসেবেও পরামর্শ চাইতেন। এক সময় তিনি মীরহাজিরবাগ এলাকায় থাকতেন। তার জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব আসে। আমার মনে আছে, কার্জন হলের সামনের মাঠটি তখন ঘাসে ভরা। এক সন্ধ্যায় আমরা দু'জন অন্ধকারে সেখানে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি তার এ বিয়ের কথাটি তোলেন। সব শুনে আমি তাকে বললাম যে আপনি বিয়েটা করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি মনে করেছিলাম আপনি এর বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আপনি ঠিক এর উল্টোটি করলেন। তিনি নীরব স্বভাবের লোক ছিলেন। যারা তার পাশাপাশি থাকত তারা হয়ত বা সবই জানে তিনি কি করতেন না করতেন। তবে

www.pathagar.com

তিনি যা করতেন তা খুব কম লোককে বলতেন। আমি বলব যে তিনি আল্লাহতে সমর্পিত ছিলেন। ইসলামের প্রতি সমর্পিত ছিলেন। কোনো প্রকার প্রচারপন্থি ছিলেন না। নীরবে কাজ করতে ভালোবাসতেন। কাজেই শেষ দিকে কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ জনেরাই বলতে পারবেন।

ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো গঠন করার সময়ও আমরা এক সাথে জড়িত ছিলাম। রিসার্চ ব্যুরো গঠনে সক্রিয় ছিলেন তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের বড় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি জহুরুল ইসলাম। পরবর্তীতে তিনি সিএ করেন। তিনি দীর্ঘদিন এর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একটি বড় ভূমিকা পালন করেন। এর পিছনে সবচেয়ে বড় ও গাইডের ভূমিকা পালন করেন মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। তিনি জামায়াতের আমীর ছিলেন। এ দু'জনই রিসার্চ ব্যুরোর মূল উদ্যোক্তা। ফকিরাপুল পানির ট্যাঙ্কির আশপাশে কোনো এক বাসায় এ রিসার্চ ব্যুরো গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং তা গঠন করা হয়। এ রিসার্চ ব্যুরো গঠনের পিছনে অন্যান্যদের মধ্যে যারা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আমি ও ইউসুফ আলী সাহেব ছিলাম অন্যতম। রিসার্চ ব্যুরোর সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বলতে পারি, ছোট আকারে প্রথম যে সংবিধান হয়েছিল সেটি চেয়ারম্যানের অনুরোধে আমি তৈরি করি।

ইউসুফ আলী সাহেব এ রিসার্চ ব্যুরোতে কয়েক বছর সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য দায়দায়িত্বের কারণে তিনি এর সাথে সদস্য ব্যতীত তেমনভাবে জড়িত থাকতে পারেননি। আমি লক্ষ্য করেছি তার একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল অর্থনীতির উপর কাজ হোক এবং তিনি নিজে কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি রিসার্চ ব্যুরো গঠনের পর আমাকে বারবার বলতেন, হান্নান ভাই, আমি এ বিষয়ে অনেক কাজ করতে চাই, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না। আমি তাকে বলতাম এর জন্য আপনাকে অনেক পড়তে হবে। সংগঠন যতই করেন না কেন আপনাকে একটি সময় বের করে নিতে হবে পড়ার জন্য। আর যদি না পড়েন তাহলে অর্থনীতি বা অন্যান্য কোনো বিষয়ের উপর বড় কিছু করতে পারবেন না। অবশ্য এ ধরনের উপদেশ আমি প্রায় লোককেই দেই। ইসলামী মুভমেন্টের সকল নেতৃবৃন্দকেও আমি এ ধরনের কথা বলে থাকি। আর আমি আশা করি এর সুফল আজ হোক কাল হোক হবে।

যাহোক, অর্থনীতির উপর তার কিছু প্রবন্ধ আছে। তবে অর্থনীতির উপর বেশি কিছু লিখে গেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন। স্ট্যান্ড করা ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

শেষে বলতে হয়, তার মৃত্যুর জন্য আমি অন্তত তৈরি ছিলাম না একেবারেই। অবশ্য মৃত্যুর জন্য কেই বা তৈরি থাকে আর মৃত্যুর কথা কেই বা নিশ্চিত করে বলতে পারে। ইউসুফ আলী সাহেবের কোনো বড় ধরনের অসুখ ছিল বলে আমার জানাই ছিল না। আমি তার কাছ থেকে কোনো সময়ই শুনিনি বা কেউ কোনো সময় আমাকে উনার হার্টের সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলেনি। তিনি হঠাৎ করে মারা গেলেন, তাও এক সাংগঠনিক সফরে। তিনি সফরে গেলেন এবং সেখান থেকে আসার পথে মারা গেলেন এতে আমি একটু অবাক হয়েছি। কারণ দুনিয়ার হিসেবে মানুষ যেভাবে হিসাব করে তাতে অবাক হয়েছি। কিন্তু আল্লাহর নিয়ম অন্যরকম এবং সে নিয়মে কিছুই অবাক হবার নেই।

আমি তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করি। তার আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি। তিনি সব সময় নেক খেদমত করে গেছেন। এমন একজন নেককার নেতার প্রাথমিক জীবনের গঠন পর্যায়ে আমি যে ভূমিকা রাখতে পেরেছিলাম তার জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

একজন তৌহিদবাদী মানুষ আ. ফ. ম. ইয়াহিয়া

আ.ফ.ম. ইয়াহিয়া বা আবুল ফায়েজ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান খাদেম ছিলেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি উনার সাথে ১৯৭৬ সালের দিকে পরিচিত হই। তার সাথে আমার পরিচয় হয় দু'ভাবে। তার মামা জিয়াউল হক কুতুবুদ্দীন সাহেব ১৯৬৩ সনের ব্যাচে ফাইন্যান্স সার্ভিসে আমার ব্যাচমেট ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন। তিনি প্রথম তার ভাগ্নে ইয়াহিয়া সাহেবের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। এরা খুব বড় ফ্যামিলি থেকে এসেছেন আমরা যাকে প্রতিষ্ঠিত বা খান্দানি ফ্যামিলি বলে থাকি।

কুতুবুদ্দীন সাহেবের পিতা ছিলেন বিখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা সফিউল্লাহ সাহেব। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। সফিউল্লাহ সাহেবের মেয়ের ছেলে হলেন ইয়াহিয়া সাহেব। ইয়াহিয়া সাহেব নিজেরাও খুব বড় পরিবারের ছিলেন। তার পিতা ছিলেন ডাঃ আবুল খায়ের - যিনি ছিলেন সে যুগে প্রথম কয়েকজন মুসলিম ডাক্তারদের মধ্যে একজন।

কুতুবুদ্দীন সাহেব নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী ও নিবেদিত। ইয়াহিয়া সাহেবও ছিলেন তেমনি একজন। আর আমি নিজেও ইসলামের জন্য কাজ করে থাকি। ফলে তিনজনের পরিচয় আমাদের জন্য ভালোই হয়। আমরা

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজগুলো একত্রে করার সুযোগ পাই। যেভাবেই হোক ভাগ্যক্রমে আমরা তিনজনই ছিলাম সরকারি কর্মচারী। আমাদের পক্ষে এ বিষয়গুলো বাদে কোনো রাজনৈতিক কাজ করা সম্ভব ছিল না। আমরা নিজেদের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সেটি একজন নাগরিক হিসাবেই করতে পারি।

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত নূরুজ্জামান ফারুকী ছিলেন আমাদের পরিচয়ের আরেকটি মাধ্যম। নূরুজ্জামান ফারুকী তখন কোথায় ছিলেন ঠিক মনে নেই তবে মাঝখানে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে বিটিভিতে 'জীবনের আলো' নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করেন।

ইয়াহিয়া সাহেবের সাথে আমার পরিচয়ের ভিত্তি ছিল ইসলাম। তিনি স্বনির্ভর আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তার প্রধান ছিলেন চাষী সাহেব, চট্টগ্রামের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। সৌদি আরব যাওয়ার পথে গাড়িতে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। গাড়ি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। সম্ভবত এয়ারকন্ডিশন সমস্যায় কার্বন-মনো-অক্সাইড দ্বারা বিষক্রিয়ায় মারা যান। চাষী সাহেব ও ইয়াহিয়া সাহেব বন্ধু ছিলেন এবং তারা স্বনির্ভর আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ফারুকীও সে রকম। আমিও ব্যক্তিগতভাবে গ্রাম বাংলার উন্নয়নের কাজের সাথে জড়িত। দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কে সব সময় চিন্তাভাবনা করতাম। এ দু'টিই ছিল আমাদের ভিত্তি, যে কারণে ইয়াহিয়া সাহেবের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

এখানে চাষী সাহেব সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। চাষী সাহেবের ইসলামের প্রতি অনুরাগ আগে কতটা ছিল জানি না। কিন্তু আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমার মনে হয় তিনি ইসলামের আরো কাছে চলে এসেছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাকে নিয়ে যান, বেঁচে থাকলে তার দ্বারা আরো কাজ হতো। আমার মনে আছে, আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি এদেশের উন্নয়নের আন্দোলনকে বা স্বনির্ভর আন্দোলনকে ইসলামের উপর ভিত্তি করেন। ইসলামের অসংখ্য মেটেরিয়াল রয়েছে যেটিকে ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া যায়। এজন্য পশ্চিমা পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। পশ্চিমা পদ্ধতি ইসলামের সাথে মিলবে না বলে সেটি পুরোপুরি ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু ইসলাম যেহেতু জীবন সংস্কৃতির অংশ, সে জন্য এটি আমাদের জাতীয়তার সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্য হবে। এসব কথা আমি তাকে বলার পর তিনি আমাকে একটি দায়িত্ব দেন। কোরআনের ঐসব আয়াতের একটি তালিকা করে দিতে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি সমাজ সেবাকে এগিয়ে নিতে পারেন। আমার মনে আছে আমি শুধু এ উদ্দেশ্যেই পনের বিশ দিনের মধ্যে কোরআনের সম্পূর্ণ অর্থ একবার

www.pathagar.com

পড়ি। আমি তাকে আয়াতসমূহের একটি লিস্ট করে দেই। কিন্তু এর বছর খানিকের মধ্য আল্লাহতায়ালার কি ইচ্ছে - তিনি মারা যান। ফলে সে কাজ আর তিনি করতে পারেননি।

ইয়াহিয়া সাহেবের বাসায় আমরা একটি ইসলামিক ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নেই। এটি চালাবার দায়িত্ব নেন জিয়াউল হক কুতুবুদ্দীন সাহেব। তিনি ক্লাসে কোরআনের উপর আলোচনা করবেন এবং আমি অন্য কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা করব। এভাবে তার বাসায় দীর্ঘ ছয়-সাত বছর ক্লাস চলতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এ ক্লাসে তার ভাই ভাতিজাদের কেউ কেউ শরিক হতেন। তার স্ত্রী কন্যাসহ ভাতিজিদেরও কেউ কেউ শরিক হতেন। সেখানে নারীরা হিজাবধারী ছিলেন।

এ ক্লাসের মাধ্যমে ইয়াহিয়া সাহেবের মানসিক বিবর্তন হয় এবং আরো অগ্রগতি হয়। তিনি ইসলামী আন্দোলন, ইসলামের বিশ্বব্যাপী কাজ, পুনর্জাগরণের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তার গভীরতা বুঝতে পারেন। সরকারি কর্মচারী থাকার কারণে তার পক্ষে সরাসরি কোনো কাজ করা সম্ভব ছিল না। এভাবেই তিনি গড়ে উঠছিলেন।

১৯৮০ সালের দিকে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়থ (WAMY) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় একটি ইয়থ ক্যাম্প করার পরিকল্পনা করা হয়। প্রস্তাবটি দেয় ওয়ামি। ইয়াহিয়া সাহেব তখন জয়েন্ট সেক্রেটারি ও মহাপরিচালক, জনশক্তি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর। ওয়ামি একটি আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন। সৌদি আরব কেন্দ্রিক এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামিক মূল্যবোধে যুবকদেরকে গড়ে তোলা। বাংলাদেশ সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে ম্যান পাওয়ারের ডিজি হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক ইয়াহিয়া সাহেবের উপর এটি সংগঠিত করার দায়িত্ব পড়ে। তিনি এজন্য তার সরকারি বন্ধু-বান্ধবকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ক্যাম্পের মূল দায়িত্ব ছিল কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান সাহেবের। আমাকেও তিনি সেন্ট্রাল কমিটিতে রাখেন। পনের দিন ব্যাপী এ ক্যাম্প সফলভাবেই শেষ হয়। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, যিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং যিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকের প্রতিষ্ঠাতা। মালয়েশিয়ার সাবেক উপপ্রধান মন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম ছাত্রনেতা হিসেবে এসেছিলেন। আনোয়ার ইব্রাহীম পূর্বানী হোটেলে ছিলেন। আমার সাথে তার তখন বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব সে ক্যাম্প ভিজিট করে খুব খুশি হন এবং ওয়ামির স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একটি জমি দান করেন। মৌচাক

www.pathagar.com

এলাকায় জমি একুয়ার করে কমোডর সাহেব, ইয়াহিয়া সাহেব এবং আমার - এই তিনজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে জমি এখনো ওয়ামির দখলে রয়েছে এবং তারা নানা ধরনের প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছে।

মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ব্রুনাই, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, ভারত, নেপালসহ বিশ্বের প্রায় পনেরটি দেশের ছেলেরা এ ইয়থ ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ত্রিশ জনের মতো ছাত্র উপস্থিত ছিল। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে দেশ ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এ জেড এম শামসুল আলম সাহেবের পর ইয়াহিয়া সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। শামসুল আলম সাহেব খুবই ত্বরিৎকর্মা ব্যক্তি। তার সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাবলিকেশন, লাইব্রেরি, গবেষণাতে বিরাট বিকাশ হয়। ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তার সময়ই শুরু হয়। এ কার্যক্রম এখনো চলছে। সারাদেশের বহু ইমাম ইতোমধ্যে এর ট্রেনিং পেয়েছে। আমি নিজে তাতে প্রায় একশ কোর্সে বক্তৃতা দিয়েছি। এ প্রজেক্টে আমি প্রায় দশ বছর যাবৎ জড়িত ছিলাম।

শামসুল আলম সাহেবের কাজগুলো ইয়াহিয়া সাহেব ধরে রাখেন। তিনি এর আরো বিস্তার ঘটান। তিনি যোগ দেয়ার প্রথম বছরেই ব্যাপকভাবে সীরাতুন্নবী (স) পালন করার উদ্যোগ নেন। বিশাল প্যান্ডেল করে পল্টন ময়দানে তিনি প্রথম অনুষ্ঠানটি করেছিলেন। সাতদিন ধরে চলা এ অনুষ্ঠানে আমি নিজেও একটি সেশনে সভাপতিত্ব করি এবং আলোচনা করি। ইয়াহিয়া সাহেবও খুব ত্বরিৎকর্মা লোক। যেটি তিনি পছন্দ করতেন তার জন্য তিনি জান দিয়ে খাটতেন। আবার পছন্দ না করলে তার পিছনে খাটতে পারতেন না। তিনি ফাউন্ডেশনের রিসার্চ প্রোগ্রামকে অনেক এগিয়ে নেন। সে সাথে পাবলিকেশনসে ব্যাপকতা দেন। আমাকে তিনি বিভিন্ন কমিটিতে নিয়ে আসেন।

ইয়াহিয়া সাহেব বিভিন্ন সময় সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের সাথে তার কী কারণে যেন মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন। পরে তিনি প্রাইভেট সেক্টরে কাজ শুরু করেন। তিনি ইবনে সিনা ট্রাস্টের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ইবনে সিনা গড়ে তোলার পিছনে যে সাত-আটজন ব্যক্তি জড়িত তার মধ্যে তিনি একজন। মানারাত ট্রাস্টেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি তার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

ইয়াহিয়া সাহেব কাজি অফিসের কাছাকাছি যে বাসায় থাকতেন সেখানে গিয়ে আমরা ক্লাস করতাম। পরবর্তীতে তিনি বনানীতে গেলে আমরা সেখানে ক্লাস করতাম। পরবর্তীতে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আরো দূরে বাসা নেন বলে আমরা

www.pathagar.com

সেখানে যেতে পারতাম না। তবে তিনি নিজে ক্লাস অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

যদিও তিনি পীর ফ্যামিলি থেকে আসেন তবুও ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন নিরেট তৌহিদবাদী লোক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তৌহিদ বিরোধী কোনো ধারণা গ্রহণ করতেন না। সে হিসেবে তিনি একজন খালেস মুসলিম এবং বিদয়াত বিরোধী ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি আহলে হাদিস বা সৌদিদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন।

ইয়াহিয়া সাহেব সত্যিকার অর্থে দেশের একজন সুসন্তান ছিলেন। খাদেম ছিলেন। ত্বরিৎকর্মা এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ভালো প্রশাসন চালাতে পারতেন। প্রয়োজনে ডিকটেট করতে পারতেন, বাধ্য করতে পারতেন।

আমি তার ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। আমি আল্লাহর কাছে তার উত্তম পুরস্কারের জন্য দোয়া করি।

আমার দেখা শহীদ আবুল কাশেম

১৯৭৮ সালে আবুল কাশেমের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে সময় খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাফসীর মাহফিল হতো। জনাব মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাফসীর করতেন। মাহফিলে হাজার হাজার লোক সমাগত হতো। ১৯৭৮ সালের মাহফিলের পর হতে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর আমরা একত্রে সমাজকল্যাণমূলক অনেক কাজ করতে শুরু করি। আমার দীর্ঘদিনের চিন্তা ছিল সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আশ্রয়হারা মেয়েদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। রেল স্টেশন, বাস স্টেশন বা লঞ্চ ঘাটে কোনো মেয়ে বিপদে পড়তে পারে। তাদের বিশেষ করে আশ্রয় দরকার।

আমি আমার চিন্তার কথা আবুল কাশেমকে বলি। সে মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিকল্পনা মাফিক মেয়েদের সাময়িক আশ্রয় দেওয়া, চাকরি দেওয়া বা ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। এই আশ্রয় কেন্দ্রে আগত প্রতিটি অসহায় মহিলার ব্যাপারে থানায় জিডি করা হতো, যাতে পরে পুলিশের মনে ভুল বুঝাবুঝি না হয়। একজন শিক্ষিতা মহিলা সুপারের তত্ত্বাবধানে এদের রাখা হতো।

আবুল কাশেম এই আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে। যেহেতু এর কোনো নিজস্ব আয় ছিল না তাই তাকে বহু লোকের কাছে যেতে হতো। সমাজে এই ধরনের উদ্যোগে অনেকেরই সাহায্য পাওয়া যায় না বা এগিয়ে আসেন না। তবুও যাদের সাহায্য পাওয়া গেছে তাদের স্মরণ করি। জীবনের একটি বিরাট সময় আবুল

www.pathagar.com

কাশেম এই ব্যাপারে শ্রম দিয়েছে। শবমেহের নামের একটি নিষ্পাপ মেয়ে ১৯৮৫ সালে পতিতালয়ে নির্মম নির্যাতনে মারা যায়। এ ঘটনাটি মানবতাকে স্তম্ভিত করে দেয়। শবমেহের নারীর ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার একটি উজ্জ্বল প্রতীক। তাকে স্মরণ রাখা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আবুল কাশেমকে প্রতি বছর শবমেহের দিবস পালন করার জন্য অনুরোধ করি। সে মোতাবেক প্রতি বছর শবমেহের দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সেভাবে গত ১৪ বছর ধরে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ দিবসটি পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এ পরিক্রমায় দিনাজপুরে ইয়াসমিন মারা যাওয়ার পর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ দিবসটিকে 'ইয়াসমিন দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য আবুল কাশেম সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবস পালনের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা উদ্দেশ্য ছিল। গত কয়েক বছর এ দিবসটি পালন করার জন্য আবুল কাশেম সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

মুসলিম নারীদের শালীনতা ও ইসলামের মূল বিধানকে ধরে রাখার জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। কাশেম এই প্রবন্ধটিকে বই আকারে লক্ষ কপি ছড়িয়ে দেয়। হিজাব হিসেবে প্রচলিত কুরআনে উল্লিখিত চাদর ও এর ব্যবহার সমাজে বৃদ্ধি করার জন্য আবুল কাশেম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সে এ ব্যাপারেও আমার লিখিত প্রবন্ধ, লিফলেট সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়। সে অনেক চাদর ও বিলি করে, যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মহিলারা এখন চাদর পড়ছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল ধারণা তুলে ধরা এবং নারী অধিকার সম্পর্কে আমি একটি ট্রেনিং একাডেমীতে একবার বক্তব্য দেই; যাতে আবুল কাশেম উপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে জনাব সফিউদ্দিন সাহেবের সহায়তায় আবুল কাশেম, খোরশেদ আলম বাবু, বাকের মোর্শেদ, হাজী বেলায়েত হোসেন ও সাহাব উদ্দিন প্রমুখ এ বক্তব্যটি অডিও ভিডিও ক্যাসেট আকারে বের করে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

আবুল কাশেমের শখ ছিল বই বিলি করা। সে হাজার হাজার কপি পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও ধর্মীয় বই বিতরণ করে গেছে। আবুল কাশেম ছিল চলন্ত ইসলাম (Moving Islam)। সে যেখানেই গেছে ইসলামের কথা বলেছে। আমার দৃষ্টিতে তার মতো সৎ, ভালো মানুষ অনেক কম দেখেছি। কাশেম সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক উঁচু ছিল। সে ছিল ঢাকা শহরে ইসলামের একটি স্তম্ভ।

পরিশেষে আমি বলব, আবুল কাশেমের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা ও তার কাজগুলোকে অব্যাহত রাখার জন্য তার সকল বন্ধুকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
আহমদ হোসেন মানিক ও ওমর বিশ্বাস
[প্রয়াস, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪]

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: ভারত বিভক্তির সময় আপনি তো কিশোর। সে সময়ের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে কি?

উত্তর: যতটুকু মনে পড়ে ঐ সময় আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। সে সময় মুসলিম জনগণ খুব উজ্জীবিত ছিল বলে মনে পড়ে। আমাদের নিকটবর্তী সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশন এবং তার আশপাশের সমস্ত জায়গা দড়িতে কাগজের পাকিস্তানী পতাকা বানিয়ে সাজানো হয়েছিল। এটি ছিল ৪৭-এর ১৪ আগস্টের স্মৃতি। এর বেশি কিছু আমার মনে পড়ে না।

৪৭-এর পরও এদেশের গোটা জনগণকে খুবই উজ্জীবিত দেখেছি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন। সে সময় আমার আব্বার পোস্টিং ছিল নারায়ণগঞ্জে। আমি সেখানেই পড়তাম। শহর থেকে সেদিন বাসায় ফিরছিলাম। এমন সময় রেডিওতে জিন্নাহ সাহেবের ইন্তেকালের ঘোষণা দেয়া হয়। লক্ষ্য করলাম এ সংবাদে সারা শহর কাঁদছে। সমস্ত লোক কাঁদছে। এটি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি হেঁটে আসছিলাম। যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম সেটি ছিল পাকা রাস্তা। এক-দেড় মাইলের পথ। কায়েদে আযমের মৃত্যুর সময় জনগণের কোনো ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে ছিল এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারব না। তার আগে ১৯৪৮ সালের মার্চে যে ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন তাতে মানুষের মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে এটি বলা যায় না।

প্রশ্ন: সেসব মানুষই বা কেন আবার পাকিস্তান বিরোধী হলো?

উত্তর : সত্যিকার অর্থেই এটি একটি বড় প্রশ্ন। এর উপরই হয়ত বা অনেক বই হতে পারে। আলটিমেটলি প্রশ্নটি দাঁড়ালো পাকিস্তান ভেঙে গেল কেন? প্রথমেই আমি

www.pathagar.com

স্বীকার করি এ বিষয়টি বিতর্কমূলক। এটিও স্বীকার করি যে এ বিষয়ে কথা বলা কঠিন ব্যাপার এবং কথা বললে ভুল বোঝাবুঝির ভয় থাকে। কেননা মানুষের স্বভাব হচ্ছে, যে স্পিরিটে বলা হয় সে স্পিরিট না দেখে বরং সব কিছুতেই একটি উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা। তা সত্ত্বেও কেন পাকিস্তান ভেঙে গেল সে বিষয় ঐতিহাসিকভাবে এসেসমেন্ট করা হয়। আমাদের দেশেও আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখ ব্যক্তি, পাকিস্তানের চিন্তাবিদ, নেতৃবৃন্দও এরকম এসেসমেন্ট করেছেন। এ ব্যাপারে আমার নিজের আন্ডারস্টান্ডিং ভুলও হতে পারে।

৪৯-এ আওয়ামী লীগ হলো। তারা ৫২'র পরে ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিরোধী অবস্থান নেয় এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করে। সরকারে থাকাকালীন ৫৬-৫৭ সালের সময়টুকু ছাড়া ৭০ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ একটি বিরোধী দল ছিল। আমাদের দেশে বিরোধী দল স্বাভাবিকভাবে যেটি করে থাকে তারাও সেভাবেই সরকারের সকল পলিসির বিরোধিতা করতে থাকে এবং সে সাথে জনমতকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করাতে চেষ্টা করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। এ বৈষম্যটিকে রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদরা যে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক না কেন, আওয়ামী লীগ জনগণকে বোঝালো একটি বৈষম্য রয়েছে। ফলে এদেশের জনগণ মানসিকভাবে তৈরি হলো - not for separation, তবে এজন্য যে এ বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার।

এর মধ্যে আরেকটি দিক লক্ষণীয় ছিল। এ বৈষম্যের অনুভূতি আরো বৃদ্ধি পেল আইয়ুব খানের মার্শাল ল'র কারণে। মার্শাল ল'তে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সব সময় একদিকেই থাকে। আর সে হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানই হলো সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি নিজেও পশ্চিম পাকিস্তানের। একদিকে যেহেতু অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে এর সাথে এসে আবার যোগ হলো রাজনীতিক কর্তৃত্বের বৈষম্য। আইয়ুব খান যদি ইস্ট পাকিস্তানের হতেন তাহলেও কিছুটা ব্যালান্সড হতো এজন্য যে অর্থনীতিটা গেছে ওদের দিকে আর রাজনীতিটা এসেছে এদিকে। যাহোক মার্শাল ল' বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আমার উপলব্ধি হলো ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রেট মেজরিটি কখনো পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি। এখানকার জনগণ বৈষম্যের অবসান চাচ্ছিল, সত্যিকার গণতন্ত্র চাচ্ছিল। এ অঞ্চলের লোকেরা সমতা চাচ্ছিল। সেটি কতটা প্র্যাকটিক্যাল ছিল বা কতটা ছিল, না আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না, সেটি অন্য প্রশ্ন। সেটি কতটা সময়ের ব্যাপার ছিল তা আমি বলছি না। তবে ৭১-এর মার্চ থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এখানে সে সময় পাকিস্তানী মিলিটারি মিশন যে

www.pathagar.com

ভূমিকা নেয় তাতে মানুষ নির্যাতিত হয়। নানাভাবে তারা অসন্তুষ্ট হয়। ফলে তাদের মূল্যায়নও নতুন হয়ে যায়। কাজেই আমি বলবো পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ করেই এক বছর সময়ের মধ্যে।

এটি ঠিক যে এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিছুটা বিভেদ, বিদ্বেষ, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি, কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। এটি ছিল ৭০ পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই ৭১ এর মার্চে এসে যে ঘটনা ঘটলো সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে।

প্রশ্নঃ আপনার আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা এসেছে। সে সময় ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে ভারত একটি বিশেষ ফ্যাক্টর হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সেটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তরঃ এসব ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি যদি ভেতরে ভেতরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে আমি থাকব না, বেরিয়ে যাব - তাহলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কিভাবে সাহায্য করতে পারে? একটি পর্যায় গিয়ে আন্তর্জাতিক ফোর্স আর এটিকে সাহায্য করতে পারে না।

৭১-এর মার্চের পর কয়েক মাসের মধ্যে জনগণের মত যে অবস্থানে চলে যায় তাতে আন্তর্জাতিকভাবে কিছু করার ছিল বলে আমার মনে হয় না। তবে দুটি কথা। মোটামুটি বলা যায় আমেরিকা অবশ্যই চেয়েছিল অন ব্যালান্স, পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকুক। কেবল পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরাই নয় বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরাও এ মতের পক্ষে লিখছেন বা বলছেন যে ভারত তার স্বার্থেই এটি করেছে। কিন্তু আজকে যখন ভারত-বাংলাদেশ বিতর্ক আসে এবং ভারতের মন্ত্রীরা যখন স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা তোমাদের জন্য এটি করেছিলাম, আমরা তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছি অথবা তোমাদের জন্য এই এই করেছি তখন বাংলাদেশের পক্ষে এ জবাবটা দেয়া হয় যে আপনারা নিঃশর্তে বা বিনা শর্তে কোনো কিছু করেননি - আপনারাও আপনাদের স্বার্থেই করেছেন। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে পাকিস্তান-ভারত যে সম্পর্ক ৪৭ থেকে চলছিল সেখানে ভারত যে কোনো সুযোগের অপেক্ষা করবে। এমনকি এটি খুবই পরিষ্কার যে ভারত সুযোগের অপেক্ষাই শুধু করবে না সুযোগ সৃষ্টি করবে, সুযোগও কাজে লাগাবে। ভারত দুটি কাজই করেছে। এ অঞ্চলের সাথে ঐ অঞ্চলের বিরোধ বাঁধুক এটি চেয়েছে এবং তার সুযোগ সে কাজে লাগিয়েছে। এ কথা কোনোভাবেই বলা ঠিক হবে না যে শুধু কিছু বামরাই বাংলাদেশ করার পেছনে ভারতের সম্পৃক্ততার কথা বলে। ভারতের উদ্যোগ আর যোগসাজশের কথা ইসলামিস্টরাও বলে। অন্যারাও একই কথা বলছেন।

www.pathagar.com

আবুল হাসান চৌধুরী মন্ত্রী থাকাকালে আমরা একবার তার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা দুজনেই বন্ধু। তিনি মাত্র দিল্লী থেকে পাকিস্তান হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এর কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া নিউক্লিয়ার বোম ব্লাস্ট করে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তান যদি বোমা বিস্ফোরণ না করতো তাহলে ভারতের ঐ সমস্ত উগ্র লোকদের পাল্লা থেকে আমাদের কারোর নিস্তার থাকতো না। সে সাথে তিনি তার প্রচণ্ড খুশি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আমাকে ভারতীয়দের উদ্ধৃতি কোট করে পড়ে শুনিয়েছেন, ভারতের লোকেরা বলেছে এককালে লংকা বিজয় করে বিজয় সিং যেমন কাজ করেছে তেমনি অটল বিহারী বাজপেয়ী সে কাজ করেছে। তাদের উগ্র আস্ফালনে ভারত কাঁপছিল। তিনি জানালেন, পাকিস্তানের বোমা বিস্ফোরণের পরেই তারা ঠাণ্ডা হয়।

কাজেই আমি মনে করি এটি যে শুধু কিছু বাম এবং ইসলামিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি তা ঠিক নয়। এটি সবার কথা যে ভারত তার নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে, বাংলাদেশের জন্য করেনি। এ ব্যাপারে খুব একটা দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

প্রশ্নঃ এ স্বার্থটা কি ধরনের ?

উত্তরঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সব ধরনের। পাকিস্তান ভাঙা তার রাজনৈতিক স্বার্থ। অর্থনৈতিক স্বার্থ তো আছেই। আর বাংলাদেশকে তার মার্কেটে পরিণত করা, যা আগে ছিল না।

প্রশ্নঃ একই সাথে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হলো। ভারতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল কিন্তু পাকিস্তানে পেল না। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তরঃ এ কথার মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। অনেক প্রশ্ন আছে। একটি প্রশ্ন হলো পাকিস্তানে সংবিধান ছিল কিনা? ছিল না একথাটি সত্য নয়। Pakistan from the first day was being run under a constitution. ১৯৩৫-এর এক্টের মাধ্যমেই পাকিস্তান শাসিত হচ্ছিল শুধু কতগুলো ধারা সংশোধন করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তারাও ১৯৩৫-এর এক্ট মোতাবেক শাসিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের সৌভাগ্য যে তারা ১৯৫০ সালের মধ্যে সংবিধান তৈরি করে ফেলল। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা তা করতে পারলেন না। তাদের সংবিধানের প্রথম ড্রাফট ৫২-তে হয়েছিল। ৫৪-তেও একটি ড্রাফট হয়েছিল। তবে এগুলো তারা পার্লামেন্টে পাস করতে পারেনি। ৫৬-তে এসে অবশেষে এটি পাশ হলো। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানের সংবিধান ব্যতীত একটি মুহূর্তও যায়নি। ৩৫-এর এ্যাক্ট ছিল গণতান্ত্রিক। তখন প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নির্বাচিত।

এখানে একটি কথা না বললে গ্যাপ থেকে যাবে। গণতন্ত্র চর্চার প্রশ্নে কারোর লাক

www.pathagar.com

ফেভার করে কারো করে না। ভারতের ভাগ্য ফেভার করেছে, সেখানে মিলিটারি ক্যু হয়নি এবং তারা গণতান্ত্রিক পথে চলতে পেরেছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটি দুর্ভাগ্য হলো যে গোলাম মোহাম্মদের মতো লোকেরা উপরে চলে আসে। এর সুযোগ নিলেন আইয়ুব খান। আবার যে কোনোভাবেই হোক ইস্কান্দার মির্জার মতো লোক নেতৃত্বে চলে আসে।

পাশ্চাত্যের অনেকে থিওরি দিয়েছে Muslims are not fit for democracy. এটি একটি থিওরি যার সত্যিকার কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি ইমোশনাল বক্তব্য। তেমনিভাবে যদি বলা হয়, ভারতের প্রশ্নে তারা বলে they are fit for democracy এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণ আনফিট - এ কথা সত্যিকার অর্থে মানা যায় না। আর মানার কোনো রেশনাল যুক্তিও নেই। কারণ এ বাংলা গণতন্ত্রের অধীনে ছিল ১৯৩৫ সাল থেকে। তখন পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতার দুজন চিফ মিনিস্টার ছিল। একজন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং অন্যজন এ কে ফজলুল হক। তৃতীয় চিফ মিনিস্টার ছিল পশ্চিম বাংলা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাঞ্জাবে যে সরকার হয়েছিল তারা শুরু থেকেই ৩৫-এর এক্টে চলছিল। সিন্ধুতে ডেমোক্রেটিক সরকার ছিল। তাই এ এলাকায় যে গণতন্ত্র ছিল না এ কথাটি ঠিক নয়। তবে কিছু লোক সব সময়ই বিরুদ্ধে বলতে থাকে এবং সে সাথে মুসলমানরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয় বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ভিত্তিহীন এবং সঠিক নয়।

ইতিহাসের বিপর্যয় কারো কারো উপর হয়। কোনো ফ্যামিলিতে দু-চারটা দুর্ঘটনা ঘটে। কোনো ফ্যামিলিতে দুর্ঘটনা ঘটে না। আমি বলব, তেমনি দুর্ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের ইতিহাসে। সে তুলনায় ভারত ভাগ্যবান। ভারত নেতৃত্ব পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দুই শীর্ষ নেতাই চার বছরের মধ্যে মারা যান। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮-এর ১১ সেপ্টেম্বর এবং লিয়াকত আলী খান ১৬ অক্টোবর ৫২-তে মারা যান। ফলে পাকিস্তানে দুর্ভাগ্য পেয়ে বসে। তা না হলে গোলাম মোহাম্মদের মতো লোক উপরে আসে না। তিনি এসে নির্বাচিত গণপরিষদ বাতিল করে দেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৫৬-তে এসে আবার নতুন পার্লামেন্ট গঠন হয়। গণপরিষদ বাতিলকে জাস্টিস মুনির বৈধ ঘোষণা করলেন। তিনি যদি বৈধ ঘোষণা না করতেন তাহলে হয়ত অন্যরকম হতো। বরং সাথে সাথে অর্ডারও দিলেন যে নতুন গণপরিষদ গঠন করতে হবে।

কাজেই এটি একটি বড় প্রশ্নের অংশ যে, মুসলিম জাতি গণতন্ত্রের জন্য অনুপোযুক্ত কিনা? মুসলিম জাতিই প্রথম জাতি যারা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চালু করে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খেলাফত হলো। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার হলো। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, মানুষের প্রতিনিধিত্ব, রাসূলের প্রতিনিধিত্ব। খলিফা একই সঙ্গে

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে। সে জাতিকে কী করে বলা যেতে পারে নট ফিট ফর ডেমোক্রেসি।

ইসলামের কথা বড় সুন্দর। সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে, কোনো জাতির বিরুদ্ধে তোমরা তাদেরকে খারাপ জাতি বলে জেনারেল জাজমেন্ট করো না। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা। আমাদেরও বলা উচিত নয় যে ওয়েস্টার্নরা এরকম কিংবা খৃষ্টান বা ইহুদীরা এরকম। সবাইকে এক কাতারে ফেলা কুরআনের মূল স্পিরিট বিরোধী। যদি আমরা এমন করি, তাহলে ভুল করি। এসব মিলিয়ে কেন পাকিস্তানে এরকম ঘটনা ঘটল এবং কেন অন্য রকম ঘটনা ঘটল না এ প্রশ্নের যারা খুব সাধারণ ব্যাখ্যা করবেন তারা অবিচার করবেন। এটি কিছুটা কাকতালীয়, কিছুটা এক্সিডেন্ট অব হিস্ট্রি। হিস্টরিক্যাল এক্সিডেন্ট, হিস্টরিক্যাল ইভেন্ট, সারকামসটেন্সেস - এগুলো না জেনে বুঝে যারা মন্তব্য করেন, কোনো জাতিকে নিন্দা করেন, সামগ্রিকভাবে তারা ঠিক করেন না।

প্রশ্ন: আচ্ছা, আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উত্তর: অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে যার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান আদর্শ ইসলাম হওয়া উচিত। এখানে প্রধান আদর্শ বলার কারণ আমাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও কিছু কথা স্পষ্ট করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক যুগে সমাজ বা চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিকাশ হয়েছে তাতে কতগুলো কথা স্পষ্টত বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের বর্তমান সংবিধানে চারটি মূলনীতির কথা বলা আছে। ইসলামকে সেখানে প্রথম স্থান দিয়ে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্রের একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি যে ফর্ম আছে সেটি থাকতে পারে। সেখানে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা আছে সমাজতন্ত্র হলো সোশ্যাল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায়বিচার। যদি সে অর্থেই হয় তাহলে এটি থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। সেখানে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের অনেক অর্থ আছে। এমন অর্থও আছে যেটি আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কল্যাণকর নয়। কিন্তু সংবিধানে যে অর্থে জাতীয়তাবাদের ব্যবহার এখানে করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বার্থ। সেটি বাংলাদেশের মৌলিক স্বার্থ এবং সঠিক স্বার্থ। এ অর্থে জাতীয়তাবাদ শব্দ ব্যবহারের মধ্যে আমি কোনো ত্রুটি দেখি না। শব্দেরও অনেক বিবর্তন হয়েছে। শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আছে। আগে যে অর্থে শব্দের ব্যবহার হতো আজকে সে অর্থেই ব্যবহৃত হতে হবে তা একেবারেই জরুরী নয়।

আমি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করি। সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করি। যুক্তি এবং ঈমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি ইসলাম রিপ্রেজেন্টস দ্য টোটালিটি অব ট্রুথ এবং এর বাইরে কিছুই নেই। অর্থাৎ গণতন্ত্র, সোশাল জাস্টিস সবই ইসলামের অংশ।

www.pathagar.com

জাতীয় স্বার্থ, এটিও ইসলামের অংশ। কিন্তু সব মানুষ এটিকে সেভাবে জানে না, বোঝে না। সেখানে যদি বিতর্ক অবসানের জন্য ইসলামকে অগ্রাধিকার দিয়ে গণতন্ত্রকে উল্লেখ করা হয় তাহলে তাতে সমস্যা দেখি না। সমাজতন্ত্র শব্দকে পরিহার করলে ভালো হয়। সমাজতন্ত্রের বদলে সোশাল জাস্টিস বলা যেতে পারে। যদি এর একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং এতে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্ষতি কী?

বাংলাদেশের জনগণ জাতীয়তাবাদে পূজার ভাব আছে বলে মনে করে না। এখানে জাতীয়তাবাদ মানে জাতীয় স্বার্থ। কাজেই ইসলামের ভিত্তিতে অধিকতর ঐক্য সৃষ্টি হবে যদি আমরা জাতির অন্যান্য যে মানসিকতা আছে তাকে আত্মস্থ (absorb) করতে পারি। ন্যাশনালিজমকে আত্মস্থ করার মধ্যে আমি কোনো সংকট দেখি না। আমি ইসলামে গণতন্ত্র বলার মধ্যে কোনো অসুবিধা দেখি না। এমনকি সোশাল জাস্টিসের মধ্যে একেবারেই দেখি না। এটি তো ইসলামেরই একটি অংশ। আমাদের এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে যে সমাজতন্ত্র শব্দটি পরিহার করা হোক। আমিও তার পক্ষে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে, জাতির ঐক্যের জন্য যদি এটি এভাবে রাখতে হয় অর্থাৎ সমাজতন্ত্র মানেই সোশাল জাস্টিস, যেটি জিয়াউর রহমান সাহেবের সময় করা হয়েছিল, তার মধ্যেও আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভৌগোলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর: নিরাপত্তা অবশ্যই একটি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেমন একজন ব্যক্তির জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জিওগ্রাফি থাকে। অতীতে এমন হয়েছে রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে নানা বিরোধ ছিল পৃথিবীর প্রায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই। কিন্তু বর্তমানে বিরোধ তেমন নেই। ম্যাপ স্টাডির বিজ্ঞান উন্নত হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক দেশের সীমানাই সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। মাত্র কিছু দেশের মধ্যে পারস্পরিক বর্ডার সমস্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। সেসব সুনির্দিষ্ট মানচিত্রের ডকুমেন্ট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত থাকায় এ সংক্রান্ত কোনো কথা উঠলে তা সহজেই মীমাংসা করা সম্ভব।

নিরাপত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে একটি বিতর্ক রয়েছে যে এ নিরাপত্তা কিভাবে? সে বিতর্ক আবার কতটা ইন্টেলেকচুয়াল আর কতটা পার্টিজান (দলীয়) সেটা চিন্তার বিষয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। বাংলাদেশের তিন দিকেই রয়েছে ভারত। আরেক দিকে সমুদ্র। সামান্য কিছু অংশে বার্মা। এ পরিস্থিতিতেও বলা হয় না, ভারতের বিপক্ষে আমরা কোনো অবস্থাতেই একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব না এবং ভারতকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি আমাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ

www.pathagar.com

চিন্তা করেন আমাদের এত বড় একটি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই। আমাদের একটি সামরিক বাহিনী দরকার শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেগুলো পুলিশ বাহিনী মোকাবিলা করতে পারবে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে কোনো ডিফেন্স পলিসিতে একটি মূল উপাদান হচ্ছে, হু ইজ দি পারসিভড এ্যানিমি - কে শত্রু হবে আগে তাকে চিহ্নিত করা। সে হিসেবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারসিভড এ্যানিমি যদি কখনও হয় তাহলে একমাত্র ভারতই হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা ভারতের মোকাবিলা করতে পারব না। এটি এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী শুধুমাত্র আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই দরকার। কেননা নানা কারণে আভ্যন্তরীণ কাজে পুলিশ ও বিডিআর-এর সাপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেনাবাহিনীই শুধু দরকার যাতে তারা প্রয়োজনে দেশের শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিতে পারে।

কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে কোনো রকম পার্টিজান ডিবেটে না গিয়ে, কোনো রকম পক্ষপাতমূলক কথা না বলে বলব, আমি মনে করি এ ডিবেট একটি আরোপিত ডিবেট যে ডিবেট হওয়া উচিত ছিল না। ডিবেট এ রকম হওয়া উচিত ছিল যে আমাদের রিসোর্স কতটা সামরিক বাহিনী সাপোর্ট করতে পারে? আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে এমন একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যে সামরিক বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। সেটার জন্য সময়ের কথা কেউ বলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বা প্রয়োজন কম, সেটা আমার কাছে মনে হয় মতামতের প্রকাশ নয় বরং কোনো এজেন্ডার প্রকাশ।

কি ধরনের সেনাবাহিনী আমাদের দরকার এটা তো সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। সাধারণভাবে বলা হয় একটা বাহিনী তার তিনগুণ শক্তির বাহিনীকে ডিফেন্ড করতে পারে। অর্থাৎ এক লক্ষ আর্মি ৩ লক্ষের বিরুদ্ধে ডিফেন্স করতে পারে। ডিফেন্ডিং পজিশনে কম লোক লাগে। সেদিক থেকে আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের সেনাবাহিনীর ওয়ানথার্ড থাকা দরকার। ভারতের সেনাবাহিনী বর্তমানে ১২ লাখ যেখানে, সেখানে আমাদের থাকা উচিত ৪ লাখ। ভারতের সেনাবাহিনীর ৮০ ভাগ ওয়েস্টার্ন বর্ডারে এবং কাশ্মীরে। ২০ ভাগ সৈন্য অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে রাখতে হয়। সুতরাং আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি ১ লাখ থাকে তাহলে তাকে আড়াই থেকে ৩ লাখে গড়ে তুলতে হবে আর ভারত যদি ২৪ লাখ করে আমাদেরকেও সে হারেই বাড়াতে হবে। এটি অবশ্য স্বল্পমেয়াদে হবে না।

এখন কেউ বলতে পারে সেনাবাহিনী ক্যু করে। ক্যু করার জন্য আড়াই লাখ লাগে না। ১ লাখ হলেই হয়। ৫০ হাজার সৈন্যবাহিনীই পারে। যেমন ক্ষুদ্র বাহিনী কর্তৃক মরিসাসের ক্যু। যদি সৈন্যবাহিনী না থাকে তাহলে বিডিআরও ক্যু করতে পারে।

www.pathagar.com

বিডিআর না থাকে পুলিশও ক্যু করতে পারে। কাজেই ক্যু করার ভয়ে সেনাবাহিনী না রাখার যুক্তি আমি বুঝি না। আমি নিজে মনে করি যে আমাদের একটা স্ট্রং ডিফেন্সই রাখতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কেমন হবে? এগুলো মিলিটারি বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। কিন্তু যে ধরনের নেভি, এয়ারফোর্স আমাদের রাখা সম্ভব সেটা রাখতে হবে। স্থলবাহিনীই বেশি রাখতে হবে। এয়ারক্রাফট আমরা বেশি রাখতে পারব না। আমাদের সাইজ ছোট, কান্ট্রির ডেপথ কম বলে এয়ারক্রাফটের মুভমেন্টের সমস্যা আছে। আবার স্ট্রং এয়ার বম্বিং-এর বিপরীতে স্থলবাহিনী মুভ করতে পারে না। এ সব দিক বিবেচনা করে আমাদের লেটেস্ট ক্ষেপণাস্ত্র থাকতে হবে।

বাংলাদেশের পারসিভড এ্যানিমি ইন্ডিয়া - এ ব্যাপারে মোটামুটি সবাই একমত। যেমন পাকিস্তানের পারসিভড এ্যানিমি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার পারসিভড এ্যানিমি পাকিস্তান। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার ডিফেন্স পলিসিতে পারসিভ এ্যানিমিকে ধরে নিতে হয়। এটা ধরেই মিলিটারি প্লান করতে হয়। সেসব দিক ধরে নিয়েই আমি বলছি আমাদের ডিফেন্স ফোর্স হয়ত বা ইন্ডিয়াকে ফাইনালি ট্যাকল করতে পারবে কিনা বলা মুশকিল। যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরকে জনগণ বা অন্তত এর একটা অংশকে সামরিকভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কিছুদিন যুদ্ধের পর একটা 'জনযুদ্ধ' দেখা দিতে পারে। জনগণ যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে যত বড় কলোনিয়াল পাওয়ারই হোক না কেন সময় বেশি লাগলেও তা একটি অভীষ্ট পর্যায়ে যেতে বাধ্য। এ সব কিছুই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এই বিষয়টিকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কোনোভাবেই শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা উচিত নয়। সত্যিকারভাবে, বাস্তবসম্মত যে ডিফেন্স পলিসি হওয়া উচিত আমাদের তাই করতে হবে।

প্রশ্নঃ এ ক্ষেত্রে আমরা সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করবো, নাকি ইকুইপম্যান্ট বাড়াবো?

উত্তরঃ আমি যতটুকু বুঝি আমাদের দুই সেক্টরেই বৃদ্ধি করতে হবে। সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে যেসব ইকুইপমেন্ট বর্তমানে লেটেস্ট ও এভেলেব্‌ল্ সেসবই সংগ্রহ করতে হবে। এখানে কোয়ালিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আস্তে আস্তে করতে হবে। ইকুইপমেন্ট ফার্স্টক্লাস হতে হবে এবং তা আমাদের ইকোনোমি সাপোর্ট করে কিনা দেখতে হবে। ইকোনমিক সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই এটিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিং ভালো। একটি স্টান্ডার্ড ট্রেনিং তারা পেয়েছে। এরা বৃটিশ এবং পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। এরা ৬৫-এর যুদ্ধেও বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের আর্মির ম্যান পাওয়ারকে প্রশিক্ষণের দিক থেকেও হাইলি কোয়ালিফাইড হতে হবে।

www.pathagar.com

রিক্রুটমেন্টের সময় শারীরিক যোগ্যতা কোনোভাবেই কম হওয়া যাবে না। আমাদের ১৩ কোটি মানুষ থেকে শক্তিশালী লোক বের করা কঠিন কিছু নয়। এ ব্যাপারে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যাবে না।

কাজেই এ কথা বলা ঠিক হবে না যে আমরা শুধু ইকুইপমেন্ট বাড়াই এবং জনবল কম রাখি। একটি দেশের একটি ডেপথ থাকে, ওয়ারের একটি ফ্রন্ট থাকে। ইন্ডিয়ার সে ফ্রন্ট বেশ বড়। আমেরিকাকে তার ডিফেন্স পলিসি ঠিক করতে হয়েছে রাশিয়া এবং চায়নাকে পারসিভড এ্যানিমি ধরেই। এটি ধরতেই হবে, না ধরে কেউ তার ডিফেন্স পলিসি ঠিক করতে পারবে না। কাজেই আমাদেরকেও এটি করতে হবে। এটিকে জোর দিয়ে বলার কারণ এতে যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ইট ইজ এন এক্সপ্রেশন অব রিয়ালিটি, এক্সপ্রেশন অব ট্রুথ, নিড এন্ড প্রাকটিক্যাল উইজডম।

প্রশ্নঃ অনেক দেশেই সবার জন্যই সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

উত্তরঃ আমি অলরেডি বলেছি অলটারনেটিভ প্রশ্নে জনযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হবে। তার জন্য মিলিটারি এক্সপার্টরা যা কিছু বলে তা করতে হবে। ১৩ কোটি লোককে ট্রেনিং দেয়া বাস্তবে সমস্যাজনক। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই মিলিটারি এক্সপার্টদের স্টাডি আছে। আমরা এজন্য স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে পারি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক যে ক্যাডেট কোর আছে তাকে আরো সম্প্রসারণ করতে পারি। এজন্য আমরা ইনসেনটিভ বাড়াতে পারি। আবার ৩০ বছর বয়সের মধ্যে একবার বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ারও আমি বিরোধী নই। এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এজন্য এটি অন্তত করা যায় যে যারা কলেজে উঠবে তাদের সকলকেই মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হবে। এদের মধ্য থেকেও আবার ফিটনেসের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ বাছাই করতে পারে। আর যাদেরকে সিলেক্ট করা হবে তারা এটিকে পরিহার করতে পারবে না। এরকম কিছু চিন্তা করা যায়। কিন্তু এটি স্টাডির ব্যাপার।

প্রশ্নঃ নিরাপত্তার বিষয়ে পররাষ্ট্রনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তরঃ প্রথম দিকটি হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা। এটা হবে, ডিমান্ড অব উইজডম এন্ড ডিমান্ড অব রিয়ালিটি। এজন্য কোনো প্রকার বেসিক ইন্টারেস্ট বিসর্জন না দিয়ে, সার্বভৌমত্বকে ধরে রেখেই ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এ একটা সেনসেটিভ বিষয়। এটাকে আমাদের সাবধানে ডিল করতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, বার্মার সঙ্গে আমাদের বর্ডার আছে। বার্মার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যাই হোক না কেন নানাকারণেই বার্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো রাখা উচিত। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বার্মার সরকার সামরিক না সিভিল তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে চায়নার সঙ্গে বর্ডার না থাকলেও তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। সম্ভব হলে গভীর করতে হবে।

পররাষ্ট্রনীতির একটা বড় কথা হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ওআইসি ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা দরকার। এজন্য ওআইসিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন। আমার দৃষ্টিতে ওআইসির নিজেরই একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল করতে হবে। জাতিসংঘের যদি একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকে তাহলে ওআইসির কেন থাকবে না? এটা বাস্তবে প্রয়োজনও। গত ১৫/২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি জাতিসংঘের উপর ছোট রাষ্ট্রগুলো নির্ভর করতে পারে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আরো পারে না। এ অবস্থায় আমরা যতই বলি না কেন আমরা দুর্বল, একে সবল করাই আমাদের কাজ, দুর্বল করা নয়। সে কাজটিই আমাদের করতে হবে বলে আমি মনে করি। ওআইসির সিকিউরিটি কাউন্সিলে শুধু ভেটো পাওয়ার থাকবে না। সিদ্ধান্ত নিতে মেজরিটি লাগবে। এ মেজরিটির জন্য যে কোনো একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এখানে ভেটো পাওয়ার বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় পররাষ্ট্রনীতি হবে ভারত, বার্মা, চায়না এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। এ চারটির পর পঞ্চম দিক হবে আমাদের অর্থনৈতিক ডিপ্লোমেসি অর্থাৎ আমাদের ট্রেড ইন্টারেস্ট বাড়ানো। আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যেই এটা দরকার।

প্রশ্নঃ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে যতটা সম্ভব আমাদেরকে সুসম্পর্ক রক্ষা করেই চলতে হবে। বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলা যায় সেখানে এখন ছাত্র না পাঠালেও চলবে। কিন্তু তাদের টেকনোলজি আমাদের দরকার। তাদের মতো আমাদেরও একটা ট্রেড ইন্টারেস্ট আছে। আমাদের জনসংখ্যা বিশাল। জিডিপি ৪০৭ ডলার। কাজেই আমাদের স্বার্থেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখব। আবার তারাও তাদের স্বার্থেই আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে। এটাই আন্তর্জাতিক ট্রেড ও সম্পর্কের ভিত্তি যে, প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রয়োজন। একলা চলরে বলা যায়, কিন্তু আসলে একলা চলা যায় না।

আবার আমাদের এটাও জানতে হবে যেহেতু বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, ওয়েস্টের সাথে আমাদের একটি বিরোধ রয়ে গেছে। ওয়েস্ট মনে করে, দেয়ার ইজ

www.pathagar.com

এ ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন। তারা শক্তিশালী। দুর্বলকে দাবিয়ে দিতে হবে, নিপ ইন দ্য বাড, যাকে বলে অঙ্কুরে বিনাশ করা - এ পলিসি তারা কিছুটা বলে আবার কিছুটা বলে না। কেউ কেউ রামসফিল্ডের মতো প্রকাশ্যে বলে ফেলে। যেহেতু মুসলিম বিশ্বকে তাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক রাখতে হবে তাই সম্পর্ক রাখার সময় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে। সংঘাত প্রশ্নে একটি ডায়ালগের দরকার ছিল অথবা দরকার ছিল পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সহাবস্থানের। আমাদের এ চিন্তা বাদ দিতে হবে যে আমরা দুনিয়াকে জোর করে দখল করে নেব। এ চিন্তা যদি থাকেও তাহলে তা বাস্তব কোনো চিন্তা হবে না। আমরা এ চিন্তা করলে অন্যরাও একই চিন্তা করতে পারে। ফলে তখন যার জোর বেশি সে এগিয়ে যাবে। ইসলামিস্টদের অফিসিয়াল পলিসি এটা হওয়া উচিত নয় যে, শক্তির জোরে আল্লাহর বাণী সবখানে ছড়িয়ে দেব। এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। ইসলামের বাণী পৌছানোর জন্য দেশে দেশে যেতে হবে, দেশ দখল করে শোনাতে হবে - এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন দুনিয়ার সব দেশেই স্থানীয় মুসলিম আছে। তারা এ কাজটি করতে পারে। এটা গেল একটি দিক।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের দাওয়াত রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট, ফ্যাক্সের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। জোর করে কিছু করা কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিস্থিতিতে এরকম ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। যারা শক্তির চিন্তা করেন তারা ঠিক চিন্তা করছেন না। তাহলে অন্যরাও একই চিন্তা করবে। এটা একটা মানবতা বিরোধী কাজ। বরং আমি যেটা সঠিক বলে মনে করি তাহলো 'লাইকরাহা ফিদ্‌দীন' এর আলোকে কাজ করা যে, ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। আমার দায়িত্ব বাণী পৌছে দেয়া, আমি তাই দিচ্ছি। আমাদের কোনো থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত হবে না। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আজ হোক কাল হোক বিশ্বব্যাপী একটা সমঝোতায় পৌছাতে হবে যে আমরা রিলিজন অথবা পলিটিক্যাল কোনো প্রকারেরই জোরজবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যবাদের চেষ্টা করবো না। এটা করতে হবে মানবতার কল্যাণে। আমি মনে করি ইসলামের মূল ম্যাসেজ পিস, ট্র্যাংকুয়িলিটি, ফ্রিডম এন্ড নো-কম্পাল্‌শ্‌ন্। ফিকাহ অব ব্যালান্স (ফিকহুল মুয়াজানাহ) বলে যেটি করলে ক্ষতি বেশি হয় সেটা করা উচিত নয়।

আমাদের সাথে ওয়েস্টের একটা সংঘাত আছে। এটা প্রকৃতপক্ষে তাদেরই সৃষ্টি। তারা অনেক বেশি যুদ্ধবাজ। তার প্রমাণ তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস। এসব মনে রেখেই তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে তারা আমাদের বন্ধু নয়। যেহেতু আমি গণক নই তাই ভবিষ্যতে কি হবে তা এখন বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কারা লড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী কৌশল কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পুরানো বামের একটি অংশ এবং ইসলামিস্টরা লড়াই করছে। ডেমোক্রেটরাও লড়াই করছে। আমি এ তিন দলেরই সমন্বয়ের কথা বলব। এ কাজে ইসলামের অংশটি বেশ সিনসিয়ার। বামেরও একটা অংশ সিনসিয়ার। কাজেই এদের মধ্যে এ ব্যাপারে সমঝোতা, বোঝাপড়া, যোগাযোগ হওয়া ভালো। কারণ ওয়ার্ল্ড ইম্পেরিয়ালিজম এতই শক্তিশালী যে বিষয়টিকে আমরা কোনোভাবেই আর হালকা করে দেখতে পারি না। অন্যদিকে বামদের এমন কোনো শক্তি নেই যে এ কাজ করলে তাদের শক্তি বা ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।

এর কৌশল অবশ্যই ডেমোক্রেটিক প্রসেসের মাধ্যমে হতে হবে। যেমন লেখালেখি, ডেমোনেস্ট্রেশন, প্রসেশন, অবস্থান ধর্মঘট, সেমিনার প্রভৃতি। কোনোভাবেই ভায়োলেন্সের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যাবে না। যেমন কোনো একটি দূতাবাসকে টার্গেট করা পাগলের কাজ হবে। বাস্তবে এতে কোনো কল্যাণ নেই। যে কোনো প্রকার ভায়োলেন্সের সুযোগই আমেরিকা নেবে।

প্রশ্নঃ দাতাগোষ্ঠীর চাপের মুখে আদর্শিক চেতনাকে সমুন্নত রেখে কিভাবে আমরা তাদের সাথে ট্রেড রিলেশন ডেভেলপ করতে পারি?

উত্তরঃ ট্রেড রিলেশন সাধারণত বাইলেটারাল হয়। এজন্য এক্সপোর্ট মার্কেট দেখতে হবে। সত্যিকার অর্থে চায়না, জাপানের সাথে আমরা এক্সপোর্ট বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি কিনা, না করলে করা উচিত। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরা বেশি সহানুভূতিশীল। আমাদের মুসলিম দেশগুলো বর্তমানে ট্রেড রিলেশন বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে না কিংবা ভাবতে পারছে না। আমাদের সরকারও এগুলো হয়ত কম চিন্তা করে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদী সুফলের ব্যাপার। যদি সরকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারত তাহলে অনেক সমস্যা কমে আসত, ব্যর্থতা কমে আসত।

আমাদের মতো দেশগুলোসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো যদি মনে করে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ নেব এবং তারপর আর ঋণ নেব না, তাহলে তা কয়েকটি শর্তে নেয়া যেতে পারে। যদি পলিটিক্যাল কোনো চাপ থাকে তাহলে সে ঋণ নেয়া ঠিক নয়। তারা যেসব ক্ষেত্রে দিতে চায় সেসব ক্ষেত্রে নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আমাদের দরকার সেসব ক্ষেত্রেই ঋণ নিতে হবে। যেমন আমাদের পাওয়ার সেক্টরের প্রয়োজনে ঋণ নিতে হবে। এজন্য শর্ত সহজ হতে হবে। দেখতে হবে আমাদের কতটুকু ঋণ দরকার। সহজ শর্ত হলেও ঋণ পরিশোধের ক্যাপাসিটি আমাদের কতটুকু আছে, এক্সপোর্ট আর্নিং-এর কতটুকু ঋণ পরিশোধে চলে যাবে - সেসব দেখতে হবে।

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের নিজেদের উন্নয়ন দরকার। ৭/৮ ভাগ জিডিপি গ্রোথ দরকার। এসবের জন্য আমাদের রিসোর্স দরকার। সে রিসোর্সের সব আমাদের দেশে নেই। এসব আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্য দিয়ে না করে বাইলেটারেলি করা উচিত। সৌদি আরব ও আরব বিশ্বের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে চুক্তি করা উচিত। তারা বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকে যে হারে টাকা রাখে আমরাও বলবো সেখান থেকে অত টাকা আমাদের দাও, আমরা সে একই হারে রিটার্ন দেব। না হলে কিছু কম অথবা কিছু বেশিতে দাও। এসব আমরা ভালো করে চিন্তা করিনি। আজকাল বিমানের মাধ্যমে রপ্তানীতে অনেক কম সময় লাগে। বাস্তবে মুসলিম বিশ্বই এগুলো কার্যকরভাবে চায় না। ওআইসিকে ট্রেড রিলেশন বাড়ানোর ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো যদি এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারত তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা কমে আসত। সেসব দিক থেকে মনে হয় আমাদের ডিপ্লোমেটিক পথ ভিন্ন হতে পারত। সোজা কথায় বাংলাদেশে কোনো ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রকৃত মেধাসম্পন্ন নেতা আসলে তিনি কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাস্তা বের করে ফেলবেন। সত্যিকার অর্থে আমাদের রাজনীতি নোংরা হওয়ায় এবং তেমন কোনো মেধাসম্পন্ন নেতা বেরিয়ে না আসায় আমাদের চিন্তার পথও সংকীর্ণ হয়ে আছে।

মূল কথা হলো উন্নয়নের শর্তে আমি ঋণ নিতে না করি না। কিন্তু আমি এটাও যোগ করি যে আমরা যেন ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। ঋণ যাতে একদম না নিতে হয় আমাদের সে চেষ্টাও করতে হবে। তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে? কিছুই হবে না। তখন শুধু আমাদের বাজেট কমিয়ে ফেলতে হবে। কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। আসলে এছাড়া আর তেমন কিছুই হবে না।

প্রশ্নঃ পাশ্চাত্যের সাথে শক্তির ভারসাম্যের পার্থক্যের কারণে তাদের সাথে আমাদের সংঘাত কি চলতেই থাকবে?

উত্তরঃ এটা ঠিক আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পাশে ভারত আর মুসলিম বিশ্বের প্রতিবেশী পাশ্চাত্য। আমেরিকা সে হিসেবে দূরবর্তী প্রতিবেশী। তাদের শক্তিকে আমাদের মেনেই চলতে হবে। এজন্য আমাদেরকেও কিছুটা সংযত হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করতে হবে। প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত না হলে শক্তিশালী ডিফেন্স হবে না। অনেক আগে থেকেই মুসলিম বিশ্বকে বিজ্ঞানের উপর অর্থ ব্যয় করার দরকার ছিল।

আমরা ধরে নিচ্ছি লংটার্মে একটি ট্রাইপোলার অথবা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডই হবে - সেখানে মুসলিম বিশ্বের অবশ্যই একটি শক্তিশালী পোল হতে হবে। কেননা ইউরোপ

www.pathagar.com

একটি পোল, আমেরিকা একটি পোল। চায়না, ইন্ডিয়া প্রত্যেকে এককভাবে একটি পোল হতে চায়। আমাদেরও একটি পোল না হওয়া পর্যন্ত কিছুটা দুর্বলতা থাকবেই। যেমন চুক্তি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষেই বেশি হয়। তার স্বার্থ বেশি রক্ষা হয়। এসব সমস্যার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। গণতন্ত্রকে, জনগণের সরকারকে খুবই শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের সরকার সামরিক সরকারের চেয়েও শক্তিশালী এটা আমাদের বুঝতে হবে।

প্রশ্নঃ আপনার আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, আমাদের অর্থনীতি, সামরিক বাহিনী, প্রযুক্তি, মিডিয়া এবং শিক্ষাখাতকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু এজন্য উদ্দীপক ও সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজন। আর আমাদের দেশে এটিরই সংকট। এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

উত্তরঃ আলাউদ্দীনের জাদুর চেরাগের মতো এটা হবে না। প্রসেসের মাধ্যমেই যেতে হবে। আমাদের করণীয় হলো গণতন্ত্রকে ভালো করে রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করা, শক্তিশালী করা। এটি করতে পারলে ৫/৭টি নির্বাচনের পরই জনগণ বুঝে যাবে কি ঠিক আর কি ঠিক নয়। এটি ছাড়া আমি আর কোনো উপায় দেখি না। অন্যান্য কথা সহজেই বলা যায়। পেশীশক্তি বন্ধ করতে হবে, কালো টাকার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে, এই করতে হবে সেই করতে হবে। কিন্তু মূল জিনিস হলো গণতন্ত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বেশ কিছু নির্বাচন হয়ে গেলেই এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে। সমস্যাগুলো ধরে নিয়েই এগুতে হবে। আবার এরই মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে একজন বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাব হবে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ভেতরে এ মুহূর্তে আমি তা দেখছি না। যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত We have to live with this type of politics or this type of leaders. এতে আমাদের সময় নষ্ট হবে, গতি শ্লথ হবে। যত তাড়াতাড়ি করতে চাইবো পারব না। এ বাস্তবতার মধ্য দিয়েই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

একজন মিলিটারি নিজেকে যোগ্য মনে করে ক্ষমতা নিলেও আসলে তার কোনো মোরাল অবস্থান থাকে না, সে মনে জোর পায় না। জনগণের ভয়ে তার মন টিপটিপ করে। আসলে তার কোনো ভিত্তি নেই। এসব সমস্যায় ঐ রকম লিডারশিপে কোনো লাভ নেই। কেউ যদি অসংবিধানিকভাবে আসে তাতে কোনো কাজ হবে না।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে তা কিভাবে মোকাবিলা করা যায়?

উত্তরঃ এক কথায় বলব কঠিন। সত্যি কথা কি কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। সন্ত্রাস অবশ্যই দূর করতে হবে কিন্তু তা ক্রমেই যে আরো

www.pathagar.com

কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটি খুব দ্রুত বন্ধ হবে বলে আমার মন বলে না। বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনের জন্যে আমাদেরকে অনেক ফ্রন্টে কাজ করতে হবে। পলিটিক্যাল রিফর্ম দরকার হবে। রাজনীতিবিদদের সন্ত্রাসীদেরকে দলে নেয়া বন্ধ করতে হবে। তাদের প্রশ্রয় দেয়া বাদ দিতে হবে। যদিও এটিও একটি কঠিন কাজ। তবু এটি টুডে অর টুমরো করতে হবে। যে করেই হোক বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। আরেকটি বড় দিক হচ্ছে পুলিশ ফোর্সকে অবশ্যই ঢেলে সাজাতে হবে। আসলে সার্বিকভাবে সমস্যা সমাধান বেশ সময়ের ব্যাপার। এজন্য আমাদের এমপ্লয়মেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে। দারিদ্র্য দূর করতে হবে। এতেও সময় লাগবে। সব কিছু মিলিয়ে এর পিছনে একটি মোরাল ফ্যাক্টর জড়িত। আবার শিক্ষার মধ্যে ইসলামের ভূমিকা ব্যাপক হওয়া দরকার। আমাদের ধর্ম ও নৈতিকতাকে তুলে ধরতে হবে। সব মিলিয়ে ব্যাপক সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সংস্কার কর্মসূচি চালানো উচিত। তাড়াতাড়ি এ সমস্যা শেষ করা বাস্তবসম্মতও নয়। কাজেই সন্ত্রাস যেভাবে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে তা দূর করতে ঠাণ্ডা মাথায় কমপক্ষে দশ বছর মেয়াদী সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের এগুতে হবে।

প্রশ্নঃ পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতা, দুর্নীতি সব কিছুই ওপেন সিক্রেট হলেও এ বাহিনী কেন সংশোধিত হচ্ছে না?

উত্তরঃ আসলে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার দরকার। তার রিক্রুটমেন্ট পলিসি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পুলিশ বাহিনীতে কি ধরনের লোক নেয়া হবে আর কি ধরনের লোক নেয়া হবে না তা ঠিক করা দরকার। তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা দরকার। তার মোরাল ট্রেনিং দরকার। তার ইকুইপমেন্ট বৃদ্ধি করা দরকার। সে সাথে পুলিশ বাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করা দরকার। এগুলো সবই শক্তভাবে পরিবর্তন করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতিসহ যে কোনো দুর্নীতিকেই শক্তভাবে দেখতে হবে। তবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে, কে দেখবে? কিন্তু এভাবেই আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে। কাউকে না কাউকে এগুলো কার্যকর করতে হবে।

প্রশ্নঃ কিভাবে?

উত্তরঃ আমাদের পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট যদি অনেস্ট হয় তাহলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, দারিদ্র্যমোচন এগুলো এক বছরের মধ্যেই দূর হবে না। এগুলোকে ফেইজ ওয়াইজ দূর করতে হবে। প্রত্যেক সমস্যা দূর করতে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকা দরকার। আমি বলেছি সব কিছুর মূলে হচ্ছে পলিটিক্যাল রিফর্ম। এটিই প্রধান। রাষ্ট্র বাস্তবে চালায় রাজনৈতিক সরকার। সে রাজনৈতিক সরকারের

www.pathagar.com

রিফর্ম ছাড়া এসব দূর হবে কেমন করে? অথবা মোরাল রিফর্ম করবে কে? একটি সৎ রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় আসে, এমনকি সরকার প্রধান যদি সৎ হয়, জ্ঞানী হয় তাহলেই একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শীর্ষে একজন সৎ লোক থাকতে হবে।

তবে আমি আরেকটি বিষয়ের পরিবর্তন দরকার বলে মনে করি। সেটি হলো আইন। আমরা কেন জানি বৃটিশ আইনের খুব ভক্ত। আমাদের উকিল ব্যারিস্টার সাহেবরা অধিকাংশই এ আইনের খুব ভক্ত। তারা এগুলোকে খুবই সুন্দর আইন বলে মনে করেন। আমি একজন সাবেক চিফ জাস্টিসের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, তিনিও বলেছেন, এর চেয়ে সুন্দর আইন আর হয় না। এ আইনের কোনো দোষ নেই, দোষ শুধু তা বাস্তবায়নের। আমার এ কথাও তিনি শুনতে রাজি হলেন না যে, যে আইন সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় সেটিই তো ভালো আইন। যে আইন বাস্তবায়নে এত দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে সেটি ভালো হয় কিভাবে? অথচ তারা এসব তৈরি করা আইনের উপর এতই ঈমানদার যে তা সংশোধনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। তারপরও সরকারের উদ্যোগে কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। আমি মনে করি আমাদের আইনের পরিমাণ অনেক বেশি এবং অনেক জটিল। আমাদের বিচার পদ্ধতিও খুব জটিল। সিস্টেমটাই এমন যে উকিল ছাড়া আমরা কেউ তা জানি না। তাই এটি লেখা থাকা না থাকা সমান। তেমনিভাবে বিচার প্রক্রিয়াও খুব ব্যয়সাধ্য হয়ে গেছে। তাই আইন ও বিচারকে সহজ করা দরকার। জনগণ সরাসরি যাতে আপিল করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি রাস্তা থাকতে হবে যাতে সরাসরি যে কেউ কোর্টে গিয়ে নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে, কোনোরকম আবেদন ছাড়াই নিজে এসে হাজির হয়ে কিছু বলতে পারে। আমার এ কথাকে কেউ অসম্ভব বলে মনে করতে পারেন? কিন্তু আমি মনে করি এরকম করতে পারলে আসলেই আমরা বড় কাজ করতাম।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে কি আপনি স্বাধীন বলে মনে করেন?

উত্তরঃ বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় বলা ঠিক হবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে লোয়ার লেভেলের ক্রিমিনাল জাস্টিস। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেসি সুপ্রিম কোর্ট নয়, পলিটিক্যাল গভার্নমেন্টের অধীনে বলে এটি একটি সমস্যা। তবে আমরা জানি একে সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। এজন্য দাবি দাওয়া আছে। প্রচেষ্টা আছে। বোধহয় আইনও হয়ে গেছে। এটি হয়ে যাওয়া দরকার।

প্রশ্নঃ দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে আজকে অর্থের বিনিময়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

উত্তরঃ একটি উদাহরণ দেই। বন্যায় যখন পানি বাড়তে থাকে তখন সব দিক দিয়েই

www.pathagar.com

বাড়তে থাকে। তখন কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধ দিয়ে কাজ হয় না। আবার যখন বন্যা চলে যায় তখন পানি অটোমেটিক সব দিক থেকেই কমে যায়। মানব সমাজের উন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলো এরকম। একটি সময় আসে যখন সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। আবার একটি সময় আসে যখন সমস্যাগুলো কমতে থাকে। যেমন আমরা দেখি আরব বিশ্ব সমস্যায় ভরা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনে সব সমস্যা দূর হয়ে গেল। যত দিকে সমস্যা ছিল সব দিক থেকেই চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরের যুগেরও বহু উদাহরণ আছে। এভাবে যদি একটি গুড গভার্নমেন্ট কোনো দেশে আসে তখন যে উন্নয়ন হবে তা হবে সব দিক থেকেই। আবার এ উন্নয়ন অনেক আনুষঙ্গিক উন্নয়নকেই সাথে করে নিয়ে আসবে। কাজেই যেদিন এসব করা সম্ভব হবে সেদিনই সব কিছু বদলাতে থাকবে। নাহলে আমাদের জিডিপিও বাড়তে থাকবে, করাপশনও বাড়তে থাকবে। সন্ত্রাসও থাকবে। আরেকটি হতে পারে সমাজে একটি মোরাল ডেভেলপমেন্ট হবে। একটি নৈতিক গভার্নমেন্ট আসবে। তখন সন্ত্রাস, দুর্নীতি এমনিতেই কমে যাবে।

প্রশ্নঃ কেউ কেউ সুশীল সমাজের নামে সুশাসন কায়েমের কথা বলেন। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে সুশাসন কায়েম করা সম্ভব?

উত্তরঃ এটি ঠিক আমাদের দেশে সুশাসন নেই। এটি করতে গেলে আমাদের কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমে এর প্রয়োজনটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের সমাজে সুশাসনের অনুপস্থিতি বোঝা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিভিল সোসাইটির একটি অংশকে কাজ করতে হবে। এখানে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, লেখক, চিন্তাবিদ, আলেম সমাজ, সমাজ বিশ্লেষক, সমাজ বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী সবাইকেই কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ একই কথা যে, একটি রিফর্মড পলিটিক্যাল লিডারশিপ লাগবে। আসলে এটিই প্রকৃত ভাইটাল কন্ডিশন। এ অবস্থার পরিবর্তন যতদিন পর্যন্ত না হবে স্কুল, কলেজ, লিটারেসি সবই বাড়তে থাকবে সে সাথে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অনৈতিকতাও বাড়বে।

প্রশ্নঃ স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে তো জাতি আজ ঐকমত্য হয়ে গেছে। এটি দরকার। এখন যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো আছে এর প্রধান এক সময় ছিল কেবিনেট সেক্রেটারি এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব। এটি একটি সরকারি ডিপার্টমেন্ট। সরকারি কর্মচারীরা ভালো হলেও তাদের স্বাধীনতা কম। আর মন্দ হলে তো কথাই নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে আমরা এভাবে গড়ে উঠেছি। আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যে দলের হবেন সে দলের কেস বাদ দেয়া হবে আর অন্য দলের কেস তাড়াতাড়ি নেয়া

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন যদি হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিংবা এরকম উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এর নেতৃত্ব দেন তাহলে তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হবে তা দেখে সকলের একটি ভীতি সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভীত হবেন যে, এরা তার অফিস পর্যন্ত ভিজিট করতে পারে, ডকুমেন্ট নিতে পারে।

কাজেই এটি হওয়া ভালো। বিশেষ করে আমরা যেখানে একটি মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছি সেখানে এরকম একটি কমিশন যদি হয় আর তার কর্তাব্যক্তি যদি যোগ্য হন, সক্রিয় হন তাহলে তিনি বড় কিছু করতে পারেন। তখন মানুষের মনে ন্যায় বিচারের আশা জাগবে এবং দুর্নীতিবাজদের মনে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি হবে।

প্রশ্নঃ দেশে সুস্থ রাজনীতির ধারা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়?

উত্তরঃ রাজনীতিকে তারা যেন ব্যবসায় পরিণত না করেন। একে যেন উপার্জনের উপায় হিসেবে না নেন। তারা যেন তাদের পার্টির ভিতরেও গণতন্ত্রের চর্চা করেন। ক্ষমতায় যাবার জন্য তাদের উচিত পেশীশক্তি ব্যবহার না করে বৈধ পন্থা ব্যবহার করা। অন্যায়ভাবে অর্থের পাওয়ার না খাটানো। কেউ যেন ভোট চুরি না করে। দুনিয়ার অসংখ্য দেশে কোনো প্রকার ভোট চুরি নেই। আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, জাপানে নেই। এমনকি ইন্ডিয়াতে এটি খুবই কম। তাহলে আমাদের দেশে কেন হয়? আমাদের রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক রুলস মেনে চলতে হবে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সহনশীল নন, তাদেরকে সহনশীল হতে হবে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল কি হওয়া উচিত নয় বললেই তাতে কি হওয়া উচিত বোঝা যাবে। সরকারই সব উন্নয়ন ঘটাবে আমাদের এরকম চিন্তা-ভাবনা থাকা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে, উন্নয়ন প্রধানত প্রাইভেট সেক্টর দ্বারাই করতে হয় এবং সারা বিশ্বের উন্নয়ন প্রাইভেট সেক্টর দ্বারাই হয়েছে। সরকারকে প্রয়োজনে কতগুলো শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হয়। তাই আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে শক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। একটি চমৎকার পরিবেশ করে দিতে হবে যাতে তারা এ কাজটি করতে পারে। তা না হলে তাদের দ্বারা এ কাজ হবে না। এটি গেল একটি দিক। দ্বিতীয়ত, মাইক্রোক্রেডিট দ্বারা আমরা উন্নয়ন করবো, দারিদ্র্য বিমোচন করবো, আমাদের এরকম কল্পনা বিলাসী হওয়া ঠিক হবে না। মাইক্রোক্রেডিট উন্নয়নের মাধ্যম নয়। এটি বড় জোর দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সহায়ক উপাদান। আমি এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টত বলেছি দারিদ্র্য বিমোচন মাইক্রোক্রেডিট দ্বারা সম্ভব নয়। বাস্তবেই তা সম্ভব হয়নি। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

www.pathagar.com

আমাদের উন্নয়নের প্রচলিত ধারা হলো সরকার অবকাঠামোর উন্নয়ন করবে। এটি উন্নয়নের প্রথম স্টেজ। আমরা এখনো উন্নয়নের এ স্টেজেই আছি। পরবর্তী স্টেজে এখনো যেতে পারিনি। এদিকে সরকারকে আরো নজর দিতে হবে। পোর্ট, এয়ারপোর্ট আর কমিউনিকেশনের আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে। রাস্তাঘাট, টেলিকমিউনিকেশনের দিকে নজর দিতে হবে। ইন্ড্রাস্ট্রি, এগ্রিকালচার এবং সার্ভিস সেক্টরের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরকে পালন করতে হবে। এজন্য প্রাইভেট সেক্টরকে সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে। উন্নয়নের জন্য বিদেশী ঋণ ও বিদেশী বিনিয়োগ ভালো, যদি তা কোনো খারাপ শর্তে না হয়। খুব খারাপ শর্তে আমাদের ঋণ নেয়া উচিত নয়। আর তা আমাদের ক্যাপাবিলিটি টু পে ব্যাক-এর আলোকে করতে হবে। কোনোভাবেই যেন ঋণ পরিশোধের অর্থ এক্সপোর্ট আর্নিং এর ১০ বা ১৫ ভাগের বেশি চলে না যায়। এ বিষয়গুলো আমাদের বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে।

কৃষির ব্যাপারে - আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের সহযোগিতা দিতে হবে। কৃষি উপকরণ যাতে মার্কেটে সহজেই পাওয়া যায় এবং দাম কম থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিক্রয়মূল্য যাতে উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার জন্য যদি শস্যের দাম বাড়েও - সেটি আমাদের মানতে হবে।

প্রশ্নঃ ইসলামের আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়গুলোকে আমরা কিভাবে উন্নয়নের সাথে জড়াতে পারি?

উত্তরঃ আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন সরকার মনে করতে পারে মাইক্রোক্রেডিটে এগুবে। ঠিক আছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাইক্রোক্রেডিটে দারিদ্র্য শেষ হয় না। আবার যদি কারো কারো ধারণা মতে গরীবদের ধরে ধরে লিস্ট করে এলাউন্স দেয়া শুরু করলে তা বিশাল এক বোঝা হবে। আমাদের অর্থনীতি এত লক্ষ-কোটি লোকের বোঝা বহন করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে এটি বাস্তব সম্মত হবে না।

তাই আমাদের বোঝার সমস্যা থাকলেও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামের যে পলিসি তা সঠিক। ইসলামের সাধারণ উন্নয়ন পদ্ধতি একই। ইসলামের যে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয় মনিটরি পলিসি, ফিসকেল পলিসি, এক্সপেন্ডিচার পলিসি (এটি ফিসকেল পলিসিরই অংশ) এবং ব্যাংকিং পলিসি ব্যবহার করে। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতি বছর যে নতুন টাকা তৈরি করে তা একদম ফ্রি টাকা। আমার ভাষায় আকাশ থেকে পাওয়া টাকা। সেন্ট্রাল ব্যাংক নোট প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়া মাত্রই টাকা হয়ে যায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো নেই। এর মানে হলো এ নতুন টাকা হিসাব করেই প্রিন্ট করা হয় এবং বাজারে ছাড়া হয়।

www.pathagar.com

ধরা হয় বছরে গ্রোথ হবে ৫ পারসেন্ট এবং ইনফ্লাশন হবে ৫ পারসেন্ট। অর্থাৎ ৫ যোগ ৫, ১০ পারসেন্ট নতুন টাকা লাগবে। এ টাকা সরকার পণ্য কেনার মাধ্যমে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে বাজারে ছাড়ে। না হলে এ টাকা তো আর শুধু শুধু বিলানো যাবে না। এ টাকা সম্পর্কে ড. ওমর চাপড়া বলছেন এর একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খরচ করতে পারে। প্রতি বছরই এ টাকা আমরা পেতে পারি। তার জন্য গ্রহণযোগ্য, কার্যকরী প্রোগ্রাম দরকার।

তৃতীয় দিক হচ্ছে ব্যয়। সরকার বাজেটে যে ব্যয় ধরে তার মধ্যে একটি অংশ থাকে দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য। এগুলো ইনডাইরেক্ট প্রোগ্রাম। এগুলোকে সুপরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট করতে পারলে ভালো হবে। আর যদি ডাইরেক্ট করা যায়তাহলে তা অবশ্যই কল্যাণকর। আমি স্পষ্টত বলতে চাই, ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে কেউ যেন কেবল যাকাত নির্ভর মনে না করে। এরপর আসে ব্যাংকিং পলিসি। ব্যাংক তার ৮০ ভাগ অর্থ শিল্প-কারখানায় দিলেও ৫ থেকে ১০ ভাগ অর্থ গরীবদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে দিতে পারে। সেখানে জামানত ব্যবস্থা না থাকলে বাড়ি নেবে, তাও না পারলে অন্য কারো কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবে। এরপর যাকাত। তারপর উশর। তারপর ওয়াক্ফ। এসবই সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে।

আসলে ইসলামের মধ্যেই দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা আছে। এখানেও অন্যদের মতোই বলা আছে। যাকাতের কথা বেশি বলা আছে। অন্য এক সাক্ষাৎকারে আমি সুপারভাইজড যাকাতের কথা বলেছি। এ সিস্টেমে যাকাত ফান্ড থেকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যাকাত দেয়া হবে এবং তা সুপারভাইজ করা হবে। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে না পারলে পরবর্তীতে দেয়া হবে না কিংবা তার জন্য শাস্তিমূলক বা জরিমানা সিস্টেম থাকবে। কাজেই ইসলামের কৌশল যে কোনোভাবেই ভালো।

আরেকটি কথা, বেকারত্ব যে কোনো সরকারের সময়ই থাকবে। কাউকে একটি চাকরি খুঁজতে কিংবা অন্য চাকরি পেতে সময় লাগে। তখন কেউ বেকার থাকতেই পারে। এটি মুসলিম অমুসলিম দেশে এবং সব অর্থনীতিতেই হবে। এজন্য ইসলামী সরকারের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এর দায়িত্ব আগে পরিবারকে নিতে হবে। পরিবার না পারলে তখন আন এমপ্লয়মেন্ট এলাউন্সের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। আজ এটা আমেরিকা বা ইউরোপ করছে, তা আসলে ইসলামেরই স্পিরিট।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

উত্তর: আমার মনে হয় কেউই সন্তুষ্ট নয়। এজন্য বিরাট কাজ করা দরকার। আমাদের দেশে প্রাইভেট সেক্টরেও অপরাধ, দুর্নীতি অনেক। দেশে ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন আছে। তেমনি পুলিশ, বিডিআর, আর্মির অপারেশনের সময় অনেক ঘটনা ঘটে। এসব

www.pathagar.com

কোনোটাই কোনো দেশের জন্য এমনকি কারোর জন্যেও ভালো নয়।

মানবাধিকারে আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই। এজন্য একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের কথা উঠছে। তা হতে পারে। আমাদের আইন শৃঙখলার ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। পুলিশ বাহিনী রিফর্ম করতে হবে। আইন-আদালত সহজ করতে হবে যাতে এটি সবার সহযোগী হয়। মানবাধিকার ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। যেহেতু আমরা মুসলিম, ইসলামে মানবাধিকারের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তাও আমাদেরকে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে ওআইসি ডিক্লারেশন আমাদের জন্য একটি ডকুমেন্ট হিসেবে নিতে হবে।

বিশ্ব পরিস্থিতি

প্রশ্নঃ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিত্র কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতাকালে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইসরাইলের সমন্বয়ে জোট গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ ধরনের জোট বিশ্ব রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ এটি ঠিক, বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে, বিশেষ করে কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর থেকে। রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকার মতো জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স এরাও ইউরোপের এক একটি শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সাবকন্টিনেন্ট বা মিডল ইস্টের দিকে তাকালে ইসরাইল, ভারত একটি শক্তি। আবার মুসলিম বিশ্ব এজ এ হোল একটি শক্তি হতে পারে। এসব শক্তির মধ্যে আলটিমেটলি কিভাবে পোলারাইজেশন হবে এটি সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। হানটিংটন এক ধরনের পোলারাইজেশনের কথা বলেছেন এভাবে, আমেরিকা আর ইউরোপকে দাঁড়াতে হবে চায়না এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে। এদিকে ভারত একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখছে। তার আছে ৯ লাখ বর্গমাইল এলাকা আর লোকসংখ্যা প্রায় একশ কোটি। তার রিসোর্সও কম নয়। তার এডুকেশন বেস অনেক বড়। সেখানে ভারত, ইসরাইল এবং আমেরিকার মধ্যে কম্বিনেশন হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এটি একটি দিক। তেমনিভাবে প্রকাশ হোক বা না হোক আমেরিকা এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অন্তর্মুখী মানসিক সংঘাতের স্রোত আছে। এ প্রেক্ষিতে এরকম একটি জোট গঠনও অসম্ভব নয়।

এর অন্য দিক হচ্ছে, যদি তাই হয় তাহলে এটি একটি মন্দ জোট হবে। কেননা গত ৫০ বছরে আমরা ভারতকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অনেকটা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখেছি। আর ইসরাইলের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি। ইসরাইল আরব বিশ্বের উপর একটি ওয়েস্টার্ন-আউটপোস্ট, পাশ্চাত্যের একটি ঘাঁটি। এ ঘাঁটি

www.pathagar.com

চরানোর জন্যেই ইসরাইলকে বানানো হয়েছে। ইসরাইল বলে ১৯৪৮-এর আগে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। জাতিসংঘের সহায়তায় ফিলিস্তিনের একটি অংশকে আলাদা করে পাশ্চাত্যের শক্তি এই আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ গঠিত হয় তখন তার বেশিরভাগ সদস্যই ছিল পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র। কেননা এ এলাকার অধিকাংশ দেশই তখন কলোনি হিসেবে ছিল। ৪৮ সালে যখন জাতিসংঘে রেজুলেশন পাস হলো তখন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া মাত্র স্বাধীন হয়েছে। বাকি মুসলিম দেশসমূহ, আফ্রিকাসহ সব পরাধীন। ফলে পশ্চিমারা মেজরিটির মাধ্যমে ইসরাইলকে পাস করিয়ে নেয়।

আমি মনে করি না ভারত, ইসরাইল ও আমেরিকার সমন্বয়ে একটি জোট হতে পারে না। তবে হলে তা অবশ্যই ভালো হবে না। সেটি খুবই খারাপ কম্বিনেশন হবে। কিন্তু আমেরিকা প্রকাশ্যে এ ধরনের কোনো জোট করবে বলে মনে হয় না। তাহলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ইউরোপ, রাশিয়া, চায়না এবং মুসলিম বিশ্ব। আবার এটিও আমার মনে হয় না যে আমেরিকা ইউরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আমেরিকার সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক ভালো। ভারত এতে যোগ দিলে ফরেন পলিসিতে আমেরিকার সাথে ইউরোপের বিভেদ দেখা দেবে। এরকম পোলারাইজেশন হলে ইউরোপ, রাশিয়া, চায়না অন্যদিকে চলে যাবে। চায়নাকে দূরে ঠেলে দিতে আমেরিকা চাইবে কিনা প্রশ্ন আছে। ভবিষ্যতে যে ধরনের পোলারাইজেশন দাঁড়াবে তাতে ১, ২, ৩ বা ৪টি কম্বিনেশন হতে পারে। কেউ এখনই এর ফোরকাস্ট করতে পারবে না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কোনোকিছু নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তবে এটি বলতে পারি ইসরাইল এবং আমেরিকা একদিকে থাকবে।

প্রশ্নঃ যদি এ ধরনের জোট হয় তাহলে মুসলিম বিশ্বে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উত্তরঃ মুসলিম বিশ্ব অবশ্যই এর বিপরীত জোটে যাবে। কারণ ইসরাইল যেদিকে থাকবে মুসলিম বিশ্ব সেদিকে থাকবে না। এটি সুস্পষ্ট। আবার এ রকম জোট আমেরিকা করবে বলেও মনে হয় না। বর্তমানে আর যাই করুক ভবিষ্যতের চিন্তায় আমেরিকা এমন কিছু করতে যাবে না যা তাকে মুসলিম বিশ্ব, ইউরোপ থেকে আইসোলেটেড করে দেয়। ইন্ডিয়া এ রকম জোটের পক্ষে হলেও তা আমেরিকার আগ্রহে নয়। আবার ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। সে হিসেবে ইন্ডিয়ারও বিপরীত চিন্তা এটি। যদি ভারত রাশিয়াসহ হতো তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। আবার এ মুহূর্তে রাশিয়া ও আমেরিকার একত্রে জোট হওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই ব্রজেশ মিত্রের কথাটাকে সেভাবে সিরিয়াসলি নেবার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ সময়ের প্রেক্ষিতে রাশিয়া-আমেরিকা জোট হতে পারে না?

উত্তরঃ Nothing is impossible - এদিক থেকে বলা যায় সবই সম্ভব। তাতে ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-চীনও জোট হতে পারে। কিন্তু এগুলো আমাদের মানসিক হিসাবে অসম্ভব।

প্রশ্নঃ ভারতের গতিবিধি ও কার্যবিধিকে সামনে রেখে ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

উত্তরঃ যে কোনো ছোট রাষ্ট্রের প্রতিবেশী যদি বড় রাষ্ট্র হয় তাহলে তা তার জন্য সমস্যাই। আবার বড় রাষ্ট্রের সাথে কিছু ছোট প্রতিবেশী থাকবেই। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে কয়েকটি কাজ করতে হবে। একটি হলো আমরা অকারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবো না। ভারত যদি বাধায় আমরা যতটা পারি হজম করবো। কিন্তু নিজেরা কোনোরকম উত্তেজনা সৃষ্টি করা যাবে না। আমাদের জনগণকে সকল ক্ষেত্রেই সব সময়ের জন্য এন্টি ইন্ডিয়ান করে গড়ে তোলাকে আমি সঠিক বলে মনে করি না। বিদ্বেষমূলক ফরেন পলিসি কোনো রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়। আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে দৃঢ় থাকব। স্বাধীনতা নিয়ে সক্রিয় থাকব। শক্ত থাকব। তা রক্ষা করার জন্য সর্বদা তৈরি থাকব, যেদিক থেকেই বিপদ আসুক না কেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের নিরাপত্তার দিকে ভালো করে খেয়াল রাখা দরকার। এজন্য সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত মায়ানমার এবং চায়নার সাথে। মায়ানমারের সাথে আমাদের বর্ডার আছে এবং চীন নিকটবর্তী রাষ্ট্র। তারা প্রয়োজনে কোনো বিষয়ে ইন্টারভেন্ট করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। চায়নার সাথে আমাদের কোনো আইডোলজিক্যাল সমস্যা নেই। তার কমিউনিস্ট থাকা না থাকা সমান। আর মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এটি তো আমাদের স্বাভাবিক বন্ধন।

তৃতীয়ত, আমাদের ডিফেন্স শক্তিশালী করতে হবে - আমাদের সম্পদ, সামর্থ্যকে সামনে রেখেই। জনগণকেও সামরিক দিক দিয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেটি সম্ভব এবং যতটুকু সম্ভব। যদি কখনো পারসিভড এ্যানিমির মুখোমুখি হতে হয়, সে প্রেক্ষিতে জনগণকে তৈরি করার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নঃ মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির জন্য ইসরাইল নিজেই একটি সমস্যা। তারাই আবার ফিলিস্তিনিদের সহিংসতা বন্ধ করার কথা বলে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আপনার দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থ নিশ্চিত করে মধ্যপ্রাচ্যে কিভাবে শান্তি আসতে পারে?

উত্তরঃ ইতিহাসের ডেভেলপমেন্ট যখন ঘটে যায় তখন তাকে আর তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এটি একটি বাস্তবতা। তেমনিভাবে বলা যায়, এ

www.pathagar.com

মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম স্বার্থ পুরোপুরি নিশ্চিত করে কোনো সমাধান নেই। ইসরাইল একেবারেই অবৈধ রাষ্ট্র। যেসব ইহুদী বিভিন্ন দেশে নিগৃহীত হয়েছে, অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে তারা ১৯৩০ সালের দিকে এখানে অভিবাসিত হয়। এটি প্রথম অবশ্য শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অত্যাচারিত না হলেও এখানে অনেকে চলে আসে।

ব্রিটিশ মন্ত্রী বালফোর এখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন ছিল বৃটিশ রাষ্ট্রের ম্যান্ডেটের অধীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কতগুলো রাষ্ট্রকে কয়েকটি বড় রাষ্ট্রের দায়িত্বে তুলে দেয়া হয়। যেমন ফ্রান্সের হাতে পড়ে লেবানন, সিরিয়া। বৃটেনের হাতে পড়ে ইরাক, প্যালেস্টাইন। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৃটেন ইমিগ্রেশন অনুমোদন করল। আস্তে আস্তে এখানে ইহুদী বসতি বাড়তে লাগল। বৃটেন বলে, তারা বাধা দিয়েছে অথচ ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখার বিষয় কতটুকু তারা বাধা দিয়েছে, আর কতটুকু সুযোগ করে দিয়েছে। বাইরে বলেছে না, আর ভেতরে বলেছে হ্যাঁ। এর ফলে যখন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন বহু মুসলিম-অমুসলিম দেশের উপনিবেশিকতার সুযোগ নিয়ে জাতিসংঘে মেজরিটির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয়। সেখানে এমন একটি বর্ডারের বিভাজন করা হলো যা না আরবরা মানল, না ইহুদীরা। আরবরা এটিকে রাষ্ট্র হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, যারা এখানে আগে থেকেই আছে সেসব ইহুদী শুধু থাকবে। নতুন ইহুদী না হয় কিছু মানবো, কিন্তু এ অবৈধ রাষ্ট্র কেন মানবো? আর ইহুদীরা বলল এ বর্ডারে তারা সন্তুষ্ট নয়। এর ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ হলো। ইসরাইলের ওয়েল আর্মড আর্মি আরবদের পরাজিত করলো এবং প্যালেস্টাইনের বেশিরভাগ এলাকা তারা দখল করে নিল। এভাবে একটি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা হলো।

কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এটাকে এখন উৎখাত করা সম্ভব নয়। ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে আরবরা চেষ্টা করে। ১৯৭৩-এর যুদ্ধেও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেনি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরে দীর্ঘ ৪৫ বছর এখানে অবৈধ অকুপেশন রয়ে গেছে পশ্চিম তীরসহ অন্যান্য স্থানে। এ অবস্থায় রোডম্যাপের ব্যাপারে বলা যায় এটা অবশ্যই ফেল করবে। কারণ অসলো পিস প্রসেসে তবু কিছু সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোডম্যাপে একদমই নেই। অসলো চুক্তিতে কখনোই এ কথা ছিল না যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা হলে পরেই আলোচনা এগুবে, না হলে এগুবে না। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী রবিনের মৃত্যুর পর নেতানিয়াহু এসে তাও বাতিল করে। শ্যারন এটিকে একদমই বাতিল করে দেয়। মধ্যে কিছুদিন ইয়াহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এটা নিয়ে এগুতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। এরপরও বলতে হয় রোডম্যাপ

www.pathagar.com

'অসলো থেকে আরো খারাপ। কেননা তারা বলছে প্রথমে অবস্থা শান্তিপূর্ণ হতে হবে। তারপর এক-দেড় মাস এ শান্তি অব্যাহত থাকতে হবে। তারপর সেটেল করা হবে, কি কি করা হবে বা হবে না। শেষে ২০০৫ গিয়ে ফাইনাল চুক্তি হবে। এটি একদমই অসম্ভব। প্যালেস্টাইনে বিভিন্ন রকম ফোর্স আছে। ইহুদীদের কথায় এরা যদি নাও গণ্ডগোল বাধায় সেখানে কারো কোনো না কোনো এজেন্ট গণ্ডগোল বাধাবে। এ ব্যাপারে এ পথে অগ্রসর হলে কিছুই হবে না। যেটা হওয়া উচিত ছিল, আমেরিকা তা বোঝে কিন্তু তা বুঝেও না বোঝার ভান করে। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে। এজন্য আগে জেরুজালেমের স্ট্যাটাস ঠিক করতে হবে। এটি দুই সরকারেরই হেড কোয়ার্টার হবে। ফিলিস্তিনী যারা আছে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য রিফিউজি এগ্রিমেন্ট হতে হবে - তারা তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে কি পারবে না। এগুলো বাস্তবতার আলোকেই করতে হবে।

তৃতীয়ত, সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। মূলত ১৯৪৮-এর আলোকেই তা হওয়া উচিত। আর তা যদি না হয় অন্তত ১৯৬৭-এর বর্ডারটাই রাখতে হবে। দুই পক্ষের মধ্যে এসব চুক্তি হওয়ার পর এটা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে হবে তা বাস্তবায়নের জন্য। প্রয়োজনে সেখানে বেড়া দাও, আর্মি নিয়োগ কর, বাকি সবাইকে নিরস্ত্র কর। মূল চুক্তি হওয়ার পরই এটিকে বাস্তবরূপ দিতে হবে। আমেরিকা বলছে দুই পক্ষের আলোচনা হতে হবে। কিন্তু দুই পক্ষের আলোচনার যদি কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অবশ্যই আউট সাইড কোনো পার্টির মাধ্যমে এটি করতে হবে। তাহলে তা অবশ্যই জাতিসংঘের একটি গ্রুপকে করতে হবে।

প্রশ্ন: ফিলিস্তিনে যে ইনতিফাদা বা স্বাধিকার আন্দোলন চলছে একে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর: ইনতিফাদার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? ফিলিস্তিনী জনগণ যখন দেখল ইসরাইলী অকুপেশন বন্ধের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না এবং এটিকে বন্ধও করা যাচ্ছে না, আরব বিশ্ব কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না তখন তারা সোশাল লিডারশিপ গড়ে তোলার চিন্তা করল। সেটা হবে নিরস্ত্র। শুধু এতটুকু যে পাথর মারা। যেখানেই সম্ভব ইসরাইলী সৈন্যদের পাথর মারা হবে। এভাবে পাথর মারল তারা পাঁচ-ছয় বছর। এ সময় নিজেদেরই বেশ কিছু লোক মারা গেল। এটিই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খুবই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে শিশুদের পাথর মারার মাধ্যমে প্রতিবাদ বিশ্বকে নাড়া দিল। এরই পরিণাম হলো অসলো চুক্তি। অসলো চুক্তিতে সবই আলোচনার মাধ্যমে করার কথা বলা হলো। কোনো সমাধান এতে দেয়া হলো না। তবুও কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো - এটি সে রকমই।

www.pathagar.com

অসলো ব্যর্থ হলো। আইজাক রবিন থাকলে এর কিছু একটি সমাধান হয়ত হতো। কিন্তু শ্যারন ও তার লিকুদ পার্টি সে সম্ভাবনাও নষ্ট করে দেয়। অসলো চুক্তি হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই ইনতিফাদা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে শ্যারনের উপস্থিতিতে ফিলিস্তিনী জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হলে ৩০/৪০ জন ফিলিস্তিনী নাগরিক মারা যায়। ইতোমধ্যে অসলো চুক্তিও বাতিল হয়ে যাওয়ায় আবার ইনতিফাদার ডাক দেয়া হয়। এবারের ইনতিফাদা ছিল একই সঙ্গে বাচ্চাদের ঢিল এবং অন্যদের অস্ত্র। ফলে ইনতিফাদা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আর নিরস্ত্র থাকল না। শ্যারন তার বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করার ফলেই এটি হলো। তারা মানুষ মারতে লাগল, বাড়ি-ঘর ধ্বংস করতে লাগল। ফিলিস্তিনী নেতাদের মেরে ফেলার পলিসি নিল। সব মিলিয়ে তারা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যার ফলে ইনতিফাদা সশস্ত্র হয়ে গেল। এ হচ্ছে ইনতিফাদার ব্যাকগ্রাউন্ড।

ইনতিফাদার হয়েছে একটি হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু এ ইনতিফাদার মধ্যে সমাধান হবে না। এজন্য পলিটিক্যাল সমাধান সবচেয়ে জরুরী। আমেরিকা যদি একেবারে অন্ধভাবে ইসরাইলকে সমর্থন না করত তাহলে এ সমস্যা সমাধান অনেক আগেই হতো। তারা প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি সব কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ সহায়তা দিয়েছে আর ইসরাইলী পলিসিকে আত্মস্থ করেছে। এটি রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটদের চেয়ে বেশি করেছে। যত সময়ই লাগুক এজন্য আমার কাছে রাজনৈতিক সমাধানই সবচেয়ে উত্তম ও জরুরী বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : আফগানিস্তানের পর ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: ২০০৩ সালের জুন মাসে এসে হিসাব-নিকাশ আর পরিস্থিতি বদলে গেছে। Weapon for Much Destruction (WMD) বলতে যা বোঝায় ইরাক বলছে সেই আনবিক বোমা কিংবা রাসায়নিক অস্ত্র কোনোটাই তার নেই। কিন্তু এটি আমেরিকা-বৃটেন মানছে না। আর যারা পরিদর্শনে গেছেন তারাও কোনো পরিষ্কার রিপোর্ট না দিয়ে বলে অস্ত্র পাইনি কিন্তু থাকতে পারে। এমন একটি লেজ লাগিয়ে রাখে যার ফলে আমেরিকার সুযোগ হয়ে যায়। এ অজুহাতেই তারা যুদ্ধ করেছে। অথচ আমরা পরিষ্কার দেখছি WMD পাওয়া যায়নি এবং তা নেইও। এখন তারা যদি বলে পেয়েছি তাহলে কেউ আর তা বিশ্বাস করবে না। এখন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই জেনে গেছে। WMD বাদে আর যে প্রশ্নটি আসে তাতে আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই এটি স্বীকৃত নয় যে কোনো শাসককে বদলানোর জন্য আরেকটি দেশ আক্রমণ করবে। অর্থাৎ সাদ্দামকে অপসারণের জন্যেই আমেরিকা লড়াই করেছে- এটিও ভাবা যায় না।

www.pathagar.com

তাহলে কেন আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করল? এর নানা কারণ হতে পারে। সবাই বলে তেল। আমি বলি না যে তেল নয়। আবার এটিও উদ্দেশ্য যে আরব বিশ্বকে এমন লাইন আপে আনা যাতে আমেরিকার সমর্থক সৃষ্টি করা যায়। ইরাক তার জন্য সমস্যাই ছিল। এখানে যদি অনুগত সরকার থাকে তাহলে তা আমেরিকার জন্য সুবিধা হয়। তারা চায় মিশরে একটি অনুগত সরকার থাকুক। ইরানকেও এর আওতায় আনতে চায়। এটিও রিপাবলিকান পার্টির একটি স্ট্রাটেজি হতে পারে। তেল প্লাস এন্টি মুসলিম ভূমিকা, তাদের বশংবদ সরকার বসানো, কোনো মুসলিম পাওয়ার যেন আরো শক্তিশালী না হতে পারে– এসব হিডেন (গোপন) এজেন্ডা থাকতে পারে। আমি মনে করি আছে। ভবিষ্যৎই বলে দেবে কি হবে আর কি হবে না। তবে আমি এটিও বলব আমেরিকার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এসব হবেটবে না বলেই আমার মন বলে।

আমেরিকা একটি জালে জড়িয়ে পড়েছে। কাদামাটিতে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে ইরাক আক্রান্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতে সেখানে একটি ইসলামিক ও গণতান্ত্রিক সরকারই কায়েম হবে। এটিই ইরাকের জনগণের অভিব্যক্তি। তারা এটিই চায়। সেখানে আমেরিকার উদ্দেশ্য খুব বেশি পূর্ণ হবে না। তেলও সে নিতে পারবে না। কেননা ইতোমধ্যেই বিশ্বের নজর ইরাকের উপর পড়ে গেছে। যদি কেউ বলে আমেরিকা এগুলোর তোয়াক্কা করে না, তা ঠিক। কিন্তু তারপরও আমেরিকাকে এসব তোয়াক্কা করতে হয়। যে কোনো একটি ঘটনা ঘটলেই ব্যাখ্যা দিতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুল দেখালেও তার কৈফিয়ত তাকে দাঁড় করাতে হয়।

এখন ইরাকের যে ক্ষয়ক্ষতি আর পুনর্গঠনের দায়দায়িত্ব আমেরিকাকেই নিতে হবে। সে সাথে সহযোগী বৃটেন, অস্ট্রেলিয়ারও। আমি মনে করি ইরাক ও আফগানিস্তান কোনো জায়গাতেই আমেরিকার স্বপ্ন পূরণ হবে না। তারা মুসলিম সমর্থন, সহানুভূতি সবই হারিয়েছে। এমনকি ইউরোপের সমর্থনও অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়েছে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ একে অর্থনৈতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখে থাকেন। অনেকে আবার একে ডলারের পতন ঠেকানোর কৌশল বলে মনে করেন।

উত্তর: কোনো সিরিয়াস বিশ্লেষক এ কথা বলেছেন কিনা আমি জানি না। ডলার তো এমনিই তার স্থান দখল করে আছে। এটি এমন কিছু নয় যে ডলার সংকটে ছিল বা Dollar is not the most important currency of the world. এটি ঠিক যে আমেরিকা ডলার প্রিন্ট করিয়ে নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে। কিন্তু এটি এত সহজ নয়। সে ডলার আমার হাতে আসলে আমিও তো আমেরিকার মাল কিনতে পারি। It creats a counter demand of American goods. এটি আমেরিকার এডভানটেজ যে ডলার বিশ্ববাজারের বিনিময় মুদ্রা হয়ে গেছে। এটি তো আগে থেকেই

www.pathagar.com

ছিল। এতে ইরাক তো কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি। মধ্যপ্রাচ্য করেনি। যে সংকট হয়েছে সেটি ইউরোপে হয়েছে। কাজেই ডলারের জন্যই যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে ইউরোপের বিরুদ্ধেই করা উচিত।

প্রশ্নঃ ডলার আর ইউরোর সংঘাতকে কিভাবে দেখেন?

উত্তরঃ আমি একে সংঘাত মনে করি না। শুধুমাত্র ইউরোপের জন্য বৃটেনের পাউন্ড, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর ডয়েস মার্ক প্রভৃতি কারেন্সিকে একত্রিত করে একটি কারেন্সি ইউরো করা হলো। এতে তাদের বাজার এক হয়ে যায়। কয়েকটি কারেন্সিকে এক করায় অর্থনীতিতে সামান্য সুবিধা বাড়ল। দুর্বল ও শক্তিশালী কারেন্সির মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করল। সব কিছু বিবেচনায় তারা মনে করল তাদের এক কারেন্সি থাকা দরকার। সেটি তারা করেছে। তাই বিষয়টিকে বড় করে দেখার কিছু নেই। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজ করতে চাই। ইন্ডিয়া বা জাপান যদি বলে আমি ইউরোতে পেমেন্ট নেব তাহলে সেখানে ডলারের কি বলার আছে?

প্রশ্নঃ আমেরিকা বারবার কেন মুসলিম দেশগুলোর উপরই আক্রমণ চালাচ্ছে?

উত্তরঃ বাস্তবেই আফগানিস্তান আর ইরাকের উপর আক্রমণের কোনো যুক্তি ছিল না। আমেরিকায় নিউ কনজারভেটিভ খ্রিস্টানদের একটি উত্থান হচ্ছে। এরাই বর্তমানে ক্ষমতায়। At the deep corner of the heart they want the establishment of christian domination in the world. যদি তারা শান্তিপূর্ণভাবে তা করতে পারে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু অস্ত্র দিয়ে করবে কেন? তাদের এরকম পলিসি গ্রহণ করা উচিত যেমন ইসলামে আছে- লা ইকরাহা ফিদদীন, অর্থাৎ ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।

এর সাথে তাদের আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ চলছে। জাতিসংঘের মাধ্যমেও চলছে। আমি এক জায়গায় ইউএনও (UNO)-এর পরিবর্তে তাদের ইউনাইটেড স্টেটস অর্গানাইজেশন, USO করার কথা বলেছি। UNO ওয়েস্টার্ন পারপাস সার্ভ করে ওয়েস্টার্ন ইনিস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের পারপাস সার্ভ করছে না। এজন্য জাতিসংঘকে গ্রহণযোগ্যভাবে পুনর্গঠন দরকার।

প্রশ্নঃ কিভাবে? আমেরিকা তো জাতিসংঘকে তার নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে।

উত্তরঃ বাস্তবে জাতিসংঘ তার রোল প্লে করতে পারছে না। যখন জাতিসংঘ আমেরিকার প্রস্তাব মানে তখন জাতিসংঘ ভালো। তখন আমেরিকা বলে এটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির রায়। আমেরিকা তার পক্ষে প্রস্তাব বা রায়ের জন্য জাতিসংঘকে সব সময়

www.pathagar.com

চাপ দিতে থাকে। আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো রায় বা প্রস্তাবই দেয়া যায় না। সে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিশ্বের সবাই জানে যে আমেরিকা জাতিসংঘকে তার নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মতো ব্যবহারের ফলে জাতিসংঘ তার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তারা হুমকি এবং নানা কথা বলে প্রস্তাব পাস করে। এ জাতিসংঘ দিয়ে মানবতার তেমন কোনো কল্যাণ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। জাতিসংঘ ১৯৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত তেমন ভালো কাজ করতে পেরেছে তা আমরা বলতে পারছি না। হতে পারে এ জাতিসংঘের থাকার চেয়ে না থাকার দরকার ছিল। না থাকলে হয়ত বা আরো বিপদ হতে পারত। কোল্ড ওয়ারের সময় যদি জাতিসংঘ না থাকত তাহলে হয়ত আরো বড় ধরনের বিপদ হত।

কিন্তু এখন মানবতার ভবিষ্যতের দাবি হলো জাতিসংঘ পুনর্গঠন করা। এখানে সিঙ্গেল কান্ট্রি ভেটো পাওয়ার বাতিল করতে হবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য ১৫ থেকে ২১ করা যেতে পারে। সাধারণ প্রস্তাব ভোটের মাধ্যমে পাস হবে। কিন্তু টু ফিফথ যদি বলে আমরা ভেটো দিলাম তাহলে সে প্রস্তাব পাস হবে না। এজন্য অনেক গভীর চিন্তাভাবনা করা দরকার। সিকিউরিটি কাউন্সিলে সদস্য পদ বন্টনের সময় নিরপেক্ষতার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে এতে ওয়েস্টার্ন দেশের সংখ্যাই বেশি। এর পাশাপাশি ন্যাম (NAM) যদি একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে অনেক ভালো হবে। তখন ছোট ছোট দেশগুলোর জন্য ন্যাম একটি ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হবে। তারাই তখন বলবে আমাদের সমস্যা আমরাই দেখতে পারব, তোমাদের আর আসার দরকার নেই।

এদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোটেরও একটি ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণতন্ত্র হুমকির সম্মখীন হলো। রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠিত হলো কোথাও আভ্যন্তরীণ শক্তিকে ইন্ধন যুগিয়ে আবার কোথাও রাশিয়ার দ্বারা দখলকৃত হয়ে। তখন আমেরিকা কয়েকটি জোট করে। ন্যাটো, সেন্টো, সিয়াটো এরকম কিছু জোট এমনভাবে গঠিত হয় যা রাশিয়াকে ঘেরাও করে রাখে। তারা আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করার গ্যারান্টি দেয়া হয়। ন্যাটো করাও হলো ওয়েস্ট ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য। আজ আর এগুলোর কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন: অবস্থা দেখে কি মনে হয় সব কিছু আমেরিকার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে?

উত্তর: আসলে আমেরিকার এখন যে দুর্দান্ত দাপট চলছে মনে হবে এর কোনো শেষ নেই। তবুও আমরা জানি সব কিছুরই শেষ আছে। আমেরিকার এ দুর্দান্ত দাপট তার আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা ভেঙে যেতে পারে। ইউরোপ থেকে সিরিয়াস প্রোটেস্ট আসতে পারে। আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একত্রিত হয়ে তারাও

www.pathagar.com

আমেরিকার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে পারে। অন্যদিকে আমেরিকা যা চায় তা আবার হয়ও না। আফগানিস্তানে হয়নি। তারা ভেবেছিল ইরাকে তারা ওয়েলকাম পাবে কিন্তু তা তারা পায়নি। যে সমস্ত দালাল পেয়েছিল তাদের দ্বারাও তারা সুবিধা করতে পারেনি। তারা বিশ্ব সমর্থনের আসা করেছিল, তাও হয়নি।

প্রশ্নঃ ইরাক আক্রমণের প্রধান যুক্তি ছিল যে দেশটিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। অথচ এখন প্রমাণিত হয়েছে ঐ তথ্যের পেছনে কোনো সত্যতা ছিল না। গোটাটাই ছিল বুশ-ব্লেয়ার প্রশাসন ও মিডিয়ার কারসাজি। মিডিয়া কেন এ ধরনের মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় এবং সহযোগিতা দিল?

উত্তরঃ আমরা তো জানি ইহুদী মিডিয়া হোক আর খ্রিস্টান মিডিয়াই হোক ওভার অল মিডিয়া আমেরিকার স্বার্থই দেখছে। কিন্তু তবুও তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনেক কথা বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা পরিদর্শকদের জানায় আমরা যুদ্ধে যাব তোমরা তাড়াতাড়ি ইরাক থেকে চলে আসো। পরিদর্শক তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে আসল। জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের রিপোর্ট দেয়ার কথা। কিন্তু আমেরিকার কথায় দেয়া হলো না। এজন্য পরিদর্শক টিমের ভেতর অসন্তোষ এবং গভীর একটা ক্রোধ আছে। আর সে ক্রোধেরই প্রকাশ হয়েছে এখানে-সেখানে। হ্যান্স ব্লিক্স যা বলছে এগুলো তার ক্রোধেরই কথা। হ্যান্স ব্লিক্সকেও আমি খুব একটা ভালো বলব না। এ যুদ্ধের ঘটনায় সেও কমবেশি দায়ী। সে সোজা ভাষায় সহজ করে বলতে পারত এখানে আমরা কোনো কিছু পাইনি, এখানে আক্রমণের কোনো বৈধতা নেই। তাহলে কিন্তু আজকে এমন ঘটনা ঘটত না। আমরা আরো দেখব, আমাদের আরো সময় দরকার, পাওয়া যায়নি কিন্তু নেই বলা যাবে না - এসব কথা বলে ব্লিক্স কিন্তু আমেরিকাকে কমবেশি সুযোগ করে দিয়েছিল। সে হিসেবে আমি ব্লিক্সকে দোষী পাই। আল বারাদে অনেক ক্লিয়ার কথা বলেছে। সে বলেছে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ক্যাপাবিলিটি ইরাকের নেই আর পাওয়াও যায়নি।

প্রশ্নঃ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রশ্নে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কৌশল কেমন হওয়া উচিত?

উত্তরঃ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা হিসেবে ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা ধরতে পারি। এ নিরাপত্তা কেমন হবে তা নির্ভর করবে সে কি পরিস্থিতিতে আছে? রাষ্ট্র যদি ছোট হয় আর তার চারদিকে শত্রুভাবাপন্ন দেশ বা যাদের সাথে তার ঐতিহাসিক সংঘাত আছে এ রকম ব্যাপার না থাকে তাহলে তার তেমন কোনো নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থাকবে না। যেমন সুইজারল্যান্ডের কথা বলতে পারি। সুইজারল্যান্ড খুবই ছোট দেশ, বিশ্ব নিরপেক্ষ দেশ এবং তার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পাশে যদি কোনো বড় রাষ্ট্র থাকে, যেমন - রাশিয়া, ভারত,

www.pathagar.com

আমেরিকা বা চীনের আশপাশের রাষ্ট্রগুলো, তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ছোট রাষ্ট্রের নিজেরই দায়িত্ব হচ্ছে সে যেন প্রতিবেশী বড় রাষ্ট্রের সাথে অহেতুক কোনো বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে এবং তার উচিত হবে সাধ্যমতো ভাব রক্ষা করা। এ কথাগুলো আমি আগেও বলেছি। একই সঙ্গে তার উচিত আরো কিছু বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। তাহলে হয়ত প্রয়োজনে তার সাহায্যে বড় কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে পারে। যদিও রাজনীতিতে এটা বলা কঠিন। তার নিজের রক্ষার জন্য সম্ভব হলে সামরিক শক্তি বাড়ানো উচিত। প্রয়োজনে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এটা একটা ফরমেট যা সবখানেই ব্যবহার করা যায়।

এরপরও আমি বলতে বাধ্য ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সমস্যা সব সময় হুমকির সম্মুখীন থাকবে, যদি জাতিসংঘের মতো সংগঠন শক্তিশালী না হয়। যদি বড় রাষ্ট্রগুলো আরো সভ্য না হয়। তারা যতই নিজেদের সিভিলাইজড দাবি করুক তারা আসলে সিভিলাইজড নয়। তারা যা করে তাতে তাদেরকে সভ্য বলা চলে না। বর্তমানে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ভারত যা করছে তাকে সভ্য বলা চলে না। তারা যতই নিজেদের ভদ্র ভাবুক বা দাবি করুক তারা যে আইনকানুন মেনে চলে তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কাজেই যদি আন্তর্জাতিক সংগঠন শক্তিশালী না হয় এবং বড় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার মতো মানসিকতা ডেভেলপ না করে তাহলে ছোট রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন থাকবে। এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে এই বাস্তবতা মেনেই চলতে হবে।

প্রশ্নঃ এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ইরাকের পর আমেরিকা ইরান সরকারকে উৎখাতের বা অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে ইরান বা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কি ধরনের ভূমিকা নেয়া উচিত?

উত্তরঃ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকার মতো রাষ্ট্র যদি কোনো রাষ্ট্রকে হুমকি দেয় সেখানে ঐ রাষ্ট্রের পক্ষে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমেও তেমন কিছু করা যাচ্ছে না। তারা তো এসব সংগঠনকে মানে না। সে সংগঠনগুলোও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেককে যতটুকু সম্ভব নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। আমি জানি সব রাষ্ট্রের পরিস্থিতি এক নয়। ইরাকের পরিস্থিতি আর ইরানের পরিস্থিতি দু'রকম। ইরাকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সেখানে অত্যাচারী শাসক ছিল। অথচ ইরানের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাচ্ছে না। আমেরিকা এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। ইরান অনেক শক্তিশালী ও বড় দেশ। ইরাকের তুলনায় ইরানের জনসংখ্যাও অনেক বেশি। তাদের নিজেদের মধ্যেও বড় ধরনের কোনো সংঘাত নেই।

www.pathagar.com

আমেরিকা এখানে কোনো সংঘাত বাধাবে বা বাধাতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ইরাকেই তো আমেরিকা বিব্রতকর অবস্থায় আছে। প্রায় প্রতিদিনই তাদের সৈন্য মারা যাচ্ছে। ইরাকী জনগণ ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে। সামনে এ সংঘাত আরো বাড়তে পারে। কাজেই আমেরিকা ইরাক, আফগানিস্তান নিয়ে অনেক ব্যস্ত। সামনে তাদের নির্বাচনও। এসবকে সামনে রেখে আমার মন বলে না কোনো নতুন সংঘাতে সে জড়াবে। যদি জড়িয়েও পড়ে তাহলে তার জন্য সেটা ইরাকের চেয়ে বেশি অকল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

প্রশ্ন: আমেরিকান প্রফেসর হানটিংটন পশ্চিমাদের সাথে ইসলামের সভ্যতার যে সংঘাতের কথা বলেছেন তা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: সংঘাত শব্দটি আগে ব্যবহৃত হতো না, তবে সংঘাত আগেও ছিল। ক্রুসেড আসলে কী ছিল? ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে খ্রিস্টান ইউরোপের বরাবর একটি বিরোধ ছিলই। তখন আমেরিকা কিছুই ছিল না। ইউরোপ থেকে আমেরিকায় সাদারা গেলই তো সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে। প্রথমে 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ গেল। এভাবে আমেরিকার ইতিহাস হলো তিনশ বছর। তারও আগে ইউরোপ আর মুসলিম বিশ্ব ছিল। এদিকে চায়না ছিল। সে সময়ের ক্রুসেডই তো আজকের সংঘাত। তখন খ্রিস্টান ইউরোপ কর্তৃক মুসলমানদের বশ্যতায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু পারেনি। এরপর ঔপনিবেশ, এটাও এক প্রকার আগ্রাসন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

অন্যদিকে ইসলাম ও খিস্ট্রীয়বাদের মধ্যে একটা সংঘাত তো আছেই। আবার হিন্দুবাদ ও ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই তা বলা যাবে না। এদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য প্রভৃতির সংঘাত আছে। কিন্তু সে সময় সংঘাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তবে তা একদিকে ভালো ছিল। কিন্তু হানটিংটন একটি ডকুমেন্ট, প্রকাশ্য নয় লুপ্ত এবং অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্টকরণ করল, ব্যাখ্যা দান করল এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের নজর সংঘাতমুখর করে তুলল। এতে একটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট রূপ নিল। হানটিংটন শুধু এ কথাই বলল না যে সংঘাত আছে। আরো বলল সংঘাত হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে, সংঘাত কুনফুসিয়াস চায়নার সঙ্গে। তাই এখনই সামরিক শক্তিতে আমাদেরকে অপরাজেয় হতে হবে। তাদের সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে দেয়া যাবে না। তাদের (ইসলামের) মধ্যে ঐক্য ভেঙে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বাড়াতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার শক্তি বাড়াতে হবে। রাশিয়াকে সঙ্গে নিতে হবে। সুতরাং এটি শুধুমাত্র সংঘাতের একটা থিওরাইজেশন ছিল না, এটা সংঘাতের একটা ম্যাপ। এটা একটা ম্যানিফেস্টোর মতো। সেখানে এই পরিকল্পনা বা রূপরেখা মতো এই পথে অগ্রসর হতে হবে।

www.pathagar.com

আসলে হানটিংটন ভালো কথা বলেননি। চাইলে তিনি উল্টো কথা বলতে পারতেন। তিনি যদি মানবতাবাদী হতেন তাহলে বলতেন, দেখ, এ সংঘাত আছে। এর থেকে যদি আমরা উদ্ধার না পাই তাহলে মানবতা বিপদাপন্ন হবে। সে জন্য আমাদের সংস্কারের পথেই আগানো উচিত। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বয় সমঝোতা করা উচিত। ডায়ালগে আসা উচিত। কিন্তু তিনি সেটি বললেন না। সংঘাতকে আরো সংঘাতমুখী করে তুললেন। এদিক থেকে তিনি মানবতার বহুবিধ ক্ষতি করলেন। যদি হানটিংটন উল্টো কথাই বলত তাহলে মুসলমানরাও বলতে পারতো যে ইসলামও এ কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (স) মদিনাতে একটি সহ-সম্পর্কের দৃষ্টান্ত খাড়া করলেন; ইহুদী ও মুসলমানরা তাদের নিজস্ব জীবনধারা অনুসরণ করবে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক জীবনধারা চলবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যার উদাহরণ আমরা চায়নায় দেখি ওয়ান স্টেট টু সিস্টেমের মতো। একই রাষ্ট্রে চায়না এক সিস্টেম আর হংকং আরেক সিস্টেম অনুসরণ করছে। এতে ওয়ান স্টেট টু সিস্টেম ধারণা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রুট খুঁজলে আমরা দেখব ইসলামে এ সিস্টেম সব সময়ই ছিল। ইসলাম তো সকল জাতিকেই আলাদা আলাদা মিল্লাত মনে করে। তার মানে হলো ইসলাম একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সিস্টেমে বিশ্বাস করে। ইসলামে 'লা ইকরাহা ফিদদ্বীন' এর কথা বলা হয়েছে। ইসলাম বলেছে, 'লাকুম দ্বীনকুম ওয়াল ইয়াদ্বীন'। যা আজকের দিনেও সত্য। রাষ্ট্র ইসলামকে অনুসরণ করবে। যার যার ধর্ম তার তার কাছেই থাকবে। কাজেই আমি বলব হানটিংটন ভালো করেননি, মন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: বর্তমানে বিশ্ব যে পর্যায়ে এসে পৌছেছে তাতে কি মনে হতে পারে পশ্চিমাদের সাথে মুসলমানদের সংলাপের প্রয়োজন?

উত্তর: আমি বলব প্রয়োজন। দুনিয়া যত অস্ত্রবাজরাই নিয়ন্ত্রণ করুক না কেন কিছু গ্রেট ফিলোসফারই মানব ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেয়। তারা যে তত্ত্ব দেয় তাই বিশ্ব শেষ পর্যন্ত মেনে চলে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামের বাইরে কিছু গ্রেট ফিলোসফারের আবির্ভাব ঘটবে - যারা শান্তির কথা বলবে, সভ্যতার কথা বলবে, সংস্কৃতির কথা বলবে। মানব ঐক্য ও সম্মানের কথা বলবে। আমি নিজেও মনে করি ইসলাম জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কোনো বিষয় নয়। মুসলমানদের মধ্যে এরকম চিন্তা থাকলে বাদ দেয়া উচিত। অবশ্যই আমাকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া উচিত কিন্তু জোর করে নয়। জোর করে সাম্রাজ্য করা যাবে না। এটি ইসলামের লক্ষ্যও নয়। আগে বর্ডার অনির্দিষ্ট ছিল। এখন সমস্ত বর্ডার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই নির্দিষ্ট সীমানা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ তা স্বীকার করে নিয়েছে। আবার নানারকম দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহু দেশের মধ্যে চুক্তিগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। কার কী

www.pathagar.com

অধিকার, কী করা যাবে কী করা যাবে না, সামরিক চুক্তি, আকাশ কিংবা নৌপথের চুক্তি অর্থাৎ সকল ধরনের চুক্তিই তৈরি হয়েছে এবং তা আমরা সবাই মেনে নিয়েই চলছি। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতিসহ সব আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতেই তো আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সাইন করেছি। কাজেই এখন আমরা জোর করে যেমন চুক্তি ভঙ্গ করতে পারব না তেমনি কাউকে আক্রমণও করতে পারব না। আর চুক্তি ভাঙাও উচিত হবে না। ইসলাম এসব চুক্তি মেনে চলারই কথা বলে। কেননা আল্লাহতায়ালাই তো চুক্তি মানতে কুরআনে বলেছেন। সূরা মায়েদার ১ম আয়াতেই তো বলেছেন, 'আউফু বিল উকুদ'- তোমরা চুক্তি মেনে চল। সুতরাং এখন আর আমাদের অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর হামলা করার সুযোগ নেই। তবে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা মুসলমানদের মধ্যে যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। সেগুলো মুসলমানদেরকে দমন করতে হবে। অনুরূপভাবে হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরও এরকম চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ এখন তো ইউএনও (UNO) ইউএসও (USO) অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটস অর্গানাইজেশনে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে জাতিসংঘ থেকে কি মুসলিম দেশসমূহ বেরিয়ে আসতে পারে?

উত্তরঃ সেটা আরেকটি দিক। যদি সত্যিকার অর্থেই জাতিসংঘকে রিফর্ম করা না যায় তাহলে আমি আবার বলব ছোট রাষ্ট্রগুলোর উচিত ন্যামের (NAM) মাধ্যমে আলাদা জাতিসংঘ গঠন করা। তার নিজস্ব একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকা। আমি তো বুঝি না জাতিসংঘ থেকে লাভ কি? না থাকলে ক্ষতি, কিন্তু থেকে লাভ কি? আমরা আমেরিকাকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে পারব না। যদি বহিষ্কার করতে পারতাম তাহলে আমরা জাতিসংঘে থেকে যেতাম। এ বাস্তবতায় আমরা যেতে পারছি না। এরচেয়ে বিকল্প হিসেবে আমরা ন্যামকে খাড়া করতে পারি।

প্রশ্নঃ আমেরিকার সাধারণ মানুষসহ বিশ্বের জনগণ ইরাক আগ্রাসনের বিরোধিতায় রাস্তায় নেমেছে। এ বিশ্ব জনমতকে একটি সুপার পাওয়ার ধরে এটিকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি?

উত্তরঃ এটি তো আর একদিনে হয় না। একটি রাষ্ট্রের আর্মড পাওয়ার জোর করে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু বিশ্ব জনমতের যে ভূমিকা তা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে। হঠাৎ করে কার্যকরী হয় না, বিশেষ করে বড় শক্তির বিরুদ্ধে। এর প্রমাণ দেখলাম বিশ্ব জনমত একরকম হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা বিরুদ্ধ কাজ করল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশ্বজনমত আমেরিকান রাষ্ট্রশক্তির কাছে হেরে গেল। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। আসলে হেরেছে আমেরিকা। এজন্য আমেরিকা চিরদিন ধীকৃত হবে। ইতিহাসে এটি ধীকৃত হতে থাকবে যে আমেরিকা বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধে ছিল, আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ

www.pathagar.com

করেছিল, জাতিসংঘকে অস্বীকার করেছিল। ইরাকে যতই সমস্যা বাড়বে তাদের প্রতি ধিক্কারও ততই বাড়বে। আমার মনে হয় বিশ্বজনমত বাস্তবিকই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকারের পক্ষে, সকল মানুষের অধিকারের পক্ষে থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

গণতন্ত্র ও ইসলাম

প্রশ্ন: অনেকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ খোঁজার চেষ্টা করেন। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের আদৌ কোনো বিরোধ আছে কি ?

উত্তর: হ্যাঁ, এটা ঠিক। তবে বিশ্বের সব দেশে এ রকম বিরোধ নেই। পাকিস্তানে এ বিরোধ নেই। আমরা যদি একটু পেছনে যাই দেখব, পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত সংবিধানের একটি অংশ ছিল where in the principle of democracy, equality, social justice and freedom shall be observed as enunciated by Islam. এটি ৪৯ সাল থেকেই ছিল। এটা ১৯৫৬ সালে সংবিধানে সংযুক্ত হলো। এর অবজেক্টিভ রেজুলেশন যার ভিত্তিতে জনগণ আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে এসব শব্দ ছিল। এটা গেল সে সময়ের কথা। ১৯৭৩-এর সংবিধানে একই অবস্থা। এরপর ২০০২ সালে এমএমএ, আহলে সুন্নাহর চারটি বড় দল ও আহলে শিয়ার একটি বড় দল, এ ৫টি দল মিলে নির্বাচনে শিয়া-সুন্নির ঐক্যের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য লড়াই করে। সামরিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা তো বলে we shall fight for sovereignty of parliament. তারা পার্লামেন্টকে সার্বভৌম করার কথা বলে। এটাকে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো সংঘাত বা বিরোধ বলে মনে করে না। আমরাই এ ধারণা পোষণ করি যে কাউকে ক্ষমতা দিলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব চলে যাবে। অথচ এ সার্বভৌমত্ব মানে হলো ক্ষমতা। রাষ্ট্রকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়। পার্লামেন্টকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়। তার সঙ্গে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নির্ঘাত একটি সংঘাত আছে সে কথা সত্য নয়। আমি এমএমএ-এর বক্তৃতাগুলোতে প্রায়ই দেখি sovereignty of the people and sovereignty of the parliament। তারা এসব শব্দকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সংঘাত বলে মনে করে না। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলব। ইরানের সংবিধানে দেখেছি সার্বভৌমত্বকে তারা দু'ভাগে ভাগ করেছে - sovereignty of Allah and sovereignty of people. এটি তাদের সংবিধানের ৫৮ ধারায় আছে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিক নয়। আমাদের আরো ব্যাপকভাবে এ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা দরকার।

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো ৪৭-এর ১৭ আগস্ট। এর কয়েকদিন আগে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। ইন্দোনেশিয়াতেও ৫টি দফায় এক মত হতে দেখা যায়। একে পঞ্চশীলা বলা হলো। আল্লাহর উপর আস্থা (faith in one God) প্রথম। এরপর ডেমোক্রেসি, ন্যাশনালিজম, সোস্যাল জাস্টিস। সেখানেও আমরা দেখি যারা এর ড্রাফট করেছিল তাদের মধ্যে ছিল ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ নাসির, যিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন- তার নেতৃত্বে এটি পার্লামেন্টে পাস করা হয়। সেখানে 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যবহার ছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। নির্বাচিত পার্লামেন্টের জন্য সংগ্রাম করছে। আজকে সৌদী আরবের লোকেরা সংগ্রাম করছে- যতটুকু তারা করতে পারে, একটি পার্লামেন্টের জন্য যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সেখানে যেতে পারে।

থিওরিটিক্যাল এনালিসিসে আমরা দেখি মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ), ইমাম হাসান আল বান্না (রহ)-সহ ইউসুফ আল কারযাভীর মতো বড় আলেমগণ গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখেন না। তারা গণতন্ত্রকে ইসলামী বলেন। তবে পরিভাষাগতভাবে বোঝাতে আমরা এটিকে ইসলামী গণতন্ত্র বলতে পারি।

আসলে মূল বিষয় হলো যেখানে আল্লাহতায়ালার আইন দেয়া আছে সেখানে সেটা মানতে হবে। এটাকেই সার্বভৌমত্ব বলা হয়। আল্লামা ইকবালের যদিও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল, তারপরও বলেছেন এর থেকে বেটার সিস্টেম নেই। তিনি নিজেও পাঞ্জাব এসেম্ব্লির সদস্য ছিলেন। বৃটিশ আমলেই তিনি ইলেকশন করাকে বৈধ মনে করেছেন। আর সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে বৈধ মনে না করার কোনো কারণ নেই। ইকবাল একটি রূহানী গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। রূহানী গণতন্ত্রের মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র।

খিলাফত মানেও গণতন্ত্র। খিলাফত হলো প্রতিনিধিত্ব। জনগণের যারা প্রতিনিধি তারা রাষ্ট্র শাসন করবেন। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি গণ্য হবেন, ইসলাম মোতাবেক শাসন করবেন এটাই খিলাফত। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন করবেন। খিলাফতের বাংলা অনুবাদ আমি গণতন্ত্র করতে পারি। গণতন্ত্র মানে আল্লাহর শাসন লঙ্ঘন নয়। আল্লাহর শাসনের বিপরীতে আমরা জনগণের শাসন বলি না। আমরা বলি রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের শাসন। মিলিটারি ডিক্টেশনের বিপরীতে জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বলতে আল্লাহর শাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে- এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আমরা রাজার শাসন, স্বৈরশাসন কিংবা রাজতন্ত্রের শাসন চাই না। আমরা জনগণের শাসন চাই। এ শাসন জনগণের। বাস্তবে শাসন তো

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা করেন না। আল্লাহ মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষই সে খলিফার দায়িত্ব পালন করে। দুনিয়া চালাবে খলিফারা।

প্রশ্নঃ গণতন্ত্র সম্পর্কে এ ধারণা কি পশ্চিমা অপপ্রচার, না আমাদেরই ভুল বোঝাবুঝি?

উত্তরঃ পশ্চিমারা বলে আমরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নই। তারা বলে, ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। তাদের কথা এ পয়েন্টে। কিন্তু গণতন্ত্র ইসলামিক নয়- এ ধারণা আমাদের ভেতরই একদল লোকের। এরা নিজেরা বুঝতে পারে না যে এরা ইসলামের ক্ষতি করছে। গণতন্ত্রকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে দেখাতে চায় যা ইসলামের জন্য সংকট সৃষ্টি করে, বিশেষ করে এলিটদের মাঝে এটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে।

আমরা ইসলামকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলছি আমাদের দোষে। এমন যদি হতো ইসলামই গণতন্ত্র চায় না এবং এজন্য এটা অগ্রহণযোগ্য, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা এটাকে অগ্রহণযোগ্য করে রাখতে পারি না। এটা আমাদের ব্যর্থতা। এটি দুঃখের কথা। যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে খুবই কম জ্ঞান আছে তারাই আজ এর বড় প্রবক্তা হয়ে গেছেন। যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স ভালো করে পড়েছেন তারা কিন্তু এ কথা তুলছেন না। প্রশ্ন তুলছেন এমন কিছু সংখ্যক লোক যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম, যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী নন।

প্রশ্নঃ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শভিত্তিক দলগুলো ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকায় এখনো আসতে পারছে না কেন?

উত্তরঃ আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ হলো ইসলামী দলগুলোর ওভারঅল যোগ্যতার ঘাটতি। এ ব্যর্থতা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। যদি কোনো দোকানদার কিংবা কোনো কোম্পানী তার পণ্য বিক্রি করতে না পারে তার জন্যে তো মার্কেটিং-এর ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। ইসলাম একটি মহৎ আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা - এটি যদি আমরা বলি এবং মানি তাহলে এটাকে আমরা সেল করতে পারছি না কেন? তার জন্য সেলসম্যান ও সেলস উইমেন যেই হোক না কেন, সেলস পার্সনকেই আমাদের দোষারোপ করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব, স্টাডির অভাব। যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন, পড়াশুনা জানা লোক দরকার সে ধরনের লোকের অভাব।

এ যুক্তি সকল ইসলামিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। যেমন- খুৎবার মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ইসলামের যে বাণী কোটি কোটি

www.pathagar.com

লোকের কাছে পৌছায় তার মান এত নিম্ন যে মানুষের মনে ইসলামের মান সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা জন্মায়। তারা ভাবে এটি একটি খুবই সাধারণ জিনিস। ইসলামের বিশালত্ব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা হয় না। ইসলাম যে একটি ইউনিভার্সাল বিষয়, মানবতার মুক্তির বিষয় তা খুৎবা শুনে মনে হয় না। দু-এক স্থানের খুৎবা ব্যতীত এ হলো সামগ্রিক অবস্থা। অথচ বছরের ৫২ সপ্তাহে যদি পরিকল্পিতভাবে খুৎবা দেয়া হতো তাহলে তা যে কত বড় মহৎ কাজ হতো, তা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

ইসলামকে আজ একটা ভীতিকর বিষয় বানানো হয়েছে। হাত কাটা, জেনার শাস্তি পাথর মারা - এ ধরনের বিষয়গুলো খুব বেশি তুলে ধরা হয়েছে এ দেশের মানুষকে পূর্ণরূপে কনভিন্সড করার আগেই। বলা হয়, গুলিস্তানের সামনে যদি একটা লোককে ফাঁসি দেয়া হয় কিংবা পাথর দিয়ে মেরে ফেলা হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা জানা জরুরী যে শরীয়াহ আইন মানেই শুধু এসব নয়। ইকোনোমিক আইন, বিজনেস আইন - সবই শরীয়াহ আইন। গভর্নমেন্টের আইন যদি ইসলামভিত্তিক হয় তাহলে তাও শরীয়াহ আইন। ফ্যামিলি থেকে শুরু করে কালচারাল ক্ষেত্র পর্যন্ত যে আইন হবে সবই শরীয়াহ আইন। অথচ শুধু ক্রিমিনাল আইনকেই আজ আমরা শরীয়াহ আইন বানিয়ে ফেলেছি।

তেমনিভাবে, ছোট ছোট বিষয়গুলোকে বড় বেশি তুলে ধরা হয়েছে। শার্ট-প্যান্ট পরা যাবে না, টুপি পরতে হবে - মসজিদে গিয়ে টুপি না পরলে আগে শাসনই করা হতো। এই যে ছোটখাট বিষয়গুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে তা শরীয়াহর মেজাজ কিংবা এর গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারের বাইরে। এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে তিনটি শ্রেণী ভুল বুঝেছে। যুব সমাজ, নারী সমাজ এবং এলিট শ্রেণী। এটি একটি মারাত্মক অবস্থা। এরকম সমাজে ইসলাম কিভাবে অগ্রসর হবে। অন্যদিকে কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। যাদের মধ্যে পৌছাচ্ছে তাদের মধ্যে আবার এ তিন শ্রেণী বাদ পড়ে যাচ্ছে। যদিও যুবকদের মধ্য থেকেই ইসলামী আন্দোলনের লোক বেশি সংখ্যায় আসছে কিন্তু মেজরিটি বাদ পড়া ইসলামের জয়ের জন্য সমস্যা। তবুও আমি বলব, এদেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোক ইসলামকে মেনে চলে। যে দলটি বর্তমানে ক্ষমতায় আছে তারাও নিজের ভোট বাদ দিয়ে বাকি ভোট ইসলামিস্টদের কাছ থেকে পেয়েছে। জেনারেল সাহেবের দলের যে ১০/১২ ভাগ ভোট, তারও আবার ৮/১০ ভাগ ইসলামিক ভোট। এমনকি প্রধান বিরোধী দলের ভোটেরও একটি অংশ ইসলামিস্টদের ভোট। এসব হিসাব বলে দেয় এদেশের এক বিরাট অংশই ইসলামের পক্ষে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের পথে বাধা কোথায়? এ বাধাগুলো কিভাবে দূর করা যায়?

উত্তর: এদের মধ্যে ঐক্য যে হচ্ছে না তাতেই বোঝা যায় কোনো না কোনো কিছু এতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও আমি মনে করি ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার দরকার। আমি ঐক্য বলছি না, বলছি সংযোগ বা বোঝাপড়া থাকা ভালো। একে অন্যকে বোঝা, ঝগড়াঝাটি না হওয়া উচিত। তা ইতিহাসের অনেক পর্যায়েই হয়নি। বর্তমান সরকারে ইসলামি দলগুলোর একটা ঐক্য যদিও আছে তবে তা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে। কিন্তু মধ্যে বিরাট সময় গেছে যখন এরকম ঐক্য ছিল না।

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে সবই সেনসেটিভ কথা হয়। ইসলামী দলগুলো ধর্মীয় ছোটখাট বিষয়ে মতবিরোধ করে। যেমন কেউ একজন ইসলামের ইতিহাসের উপর একটা বই লিখে তাতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে কোনো এক খলিফার অমুক আচরণ ইসলামের সংকট সৃষ্টি করেছে। এতে তিনি হিস্টোরিক্যাল এনালাসিস করলেন। কিন্তু এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে লেখকের বিরোধিতা শুরু হলো। বলা হলো তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন, তিনি নবীর সঙ্গীদের নিন্দা করেছেন ইত্যাদি। কিংবা কোনো আলেম হয়ত ফুকাহদের কোনো একটি মতের সমর্থন দিয়ে বললেন যে, সেহরী একটু দেরি করে করা যায়। তখন এটিই ইস্যু হয়ে গেল আরেকদলের বিরোধিতা করার জন্য। আসলে এতে বিরোধিতাকারীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় ফুটে ওঠে।

যারা ইসলামের জন্য কাজ করেন, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের মধ্যে সংকীর্ণতা খুব বেশি। এ সংকীর্ণতার কারণে তারা ছোটকে বড় মনে করে। যদি শুধু বড়গুলোই তারা দেখতেন তাহলে কোনো মতবিরোধ হতো না। যেমন ইমাম হাসান আল বান্না বলেছেন- আমরা ঐক্যের দিকগুলোকে ভিত্তি করে একত্রে মিলে কাজ করবো আর অনৈক্যের যে ছোটখাট দিক আছে তাতে একে অন্যকে ক্ষমা করে দেব - এ মূলনীতি তারা এখনো এখানে গ্রহণ করতে পারেননি। তারা প্রতিটি ছোট ছোট বিষয়কে নিয়েই অনৈক্যের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। ফলে ঐক্য হয়নি। এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার পেতে হবে। এ কারণেই যত সমস্যার সৃষ্টি। আর এটি তাদের শিক্ষার সাথে জড়িত। সে শিক্ষার যদি সংস্কার না হয়, পরিবর্তন না হয় তাহলে তাদের এ মানসিকতা দূর হবে না। আর মানসিকতার পরিবর্তন না হলে প্রতিবন্ধকতা থেকে যাবে।

আবার আরেক দল লোক আছেন যাদেরকে পীর বলা হয়। তাদের একটি অংশ যে কোনো কারণেই হোক পলিটিক্যাল ইসলামকে ভালো চোখে দেখেননি। তবে

www.pathagar.com

নিজেদের প্রয়োজনে তারা নিজেরা কোনো কোনো সময় পলিটিক্সে জড়িয়েছেন। ইসলামের মূল দলগুলো তাদের সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। কেউ যদি পীরদের কাছে যায় তাহলে পীর খুব খুশি হন। আর যারা যান না তাদের উপর তারা বেজার হয়ে যান।

এমনিভাবে আমাদের তাবলীগ জামাত আছে। তারা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। তারাও আবার এদেরকে না বুঝে ভুল বোঝে। তারা এটি বুঝতে পারেন না যে ইসলামের কাজের বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে। কতগুলো হায়ার দিক আছে। কতগুলো সাধারণ দিক আছে। তারা সাধারণ দিক নিয়ে ব্যস্ত- ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু যারা হায়ার দিক নিয়ে এগুচ্ছেন, জাতির মূল সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছেন, আইন ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন, শিক্ষা ও কালচারকে ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন সেগুলোকে তারা দেখছেন না। প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে তারা উল্টো ইসলামের মূলধারার বিরোধিতা করছেন কিংবা ভুল বুঝছেন।

তবে ঐক্য না হবার পিছনে আমি কোনো মৌলিক কারণ খুঁজে পাই না। কেন তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না? পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে (২০০১ সাল থেকে)। একবার ঐক্য হলে তাতে ফাটল দেখা দেবে বলে আমি মনে করি না। কেননা একবার একত্র হবার পর নতুন করে ফতোয়া দেয়া তো মুশকিল।

প্রশ্ন: অনেকেই আগামী কয়েকটি নির্বাচন চারদলীয় জোটের মাধ্যমে করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এটি কোনো সাময়িক বিষয় নয়। কেবলমাত্র একটি নির্বাচন হলো। তিন-চারটি নির্বাচন মানে পনের-বিশ বছরের ব্যাপার। এখন এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাজনীতির অবস্থা কি হয় বলা যায় না। এমনকি এটিও বলা মুশকিল যে আগামী দিনগুলোতে চারদলীয় জোটের কী অবস্থা হবে। এ জোট আগামীতে থাকবে কি থাকবে না, একত্রে নির্বাচন করতে পারবে কিনা, নতুন কোনো দল আসে কিনা সব সময়ের ব্যাপার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ রকম চারদলীয় জোটের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর। এটি গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু পনের-বিশ বছরের যে সময়কাল, সেখানে সব ফ্যাক্টর তো আর এক থাকবে না। যেমন ক্ষমতার বাইরে অন্য কারুর শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় গণতন্ত্র সুসংহত করার মূল পদ্ধতি এটি নয়। গণতন্ত্র সুসংহত করার মূল পদ্ধতি হবে we must play by the democratic rule - এটি যেন সব দলই বোঝে। এটি তারা না বুঝলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। পার্টিতে গণতন্ত্র থাকবে, পার্টির মধ্যে নিয়মিত নির্বাচন হবে, পেশীশক্তি ব্যবহার হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব। এগুলো

www.pathagar.com

না মানলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। এটিও একটি কঠিন ব্যাপার। জোটের দলগুলো যদি ডেমোক্রেটিক রুলসের ব্যাপারে সিনসিয়ারিটি দেখাতে না পারেন তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। ভোটে ফেল করলে আমরা নীরবে চলে যাব এবং যারা জিতবে তারা খুব সহজেই ক্ষমতা নেবে - জটিলতা সৃষ্টি বাদেই, এটি আমরা কেন করতে ব্যর্থ হবো? ভারতে আমরা এটি কমবেশি দেখছি। কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হবার কোনো কারণ দেখি না।

আমি আবার বলব, চারদলীয় জোটের একত্রে নির্বাচন করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভেরি ফ্রাঙ্কলি, অনেকে মনে করেন এর সাথে গণতন্ত্র সংহত হবার সম্পর্ক আছে। তবে এটি জাতীয়তাবাদের সংহতির জন্য ভালো। বর্তমান প্রেক্ষিতে ইসলামের জন্য এটি সাহায্যকারী। কোনো জোটের সঙ্গেই গণতন্ত্রের ডাইরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই। এর সাথে কে ক্ষমতায় যেতে পারবে কেবল তারই সম্পর্ক আছে।

প্রশ্নঃ আপনি প্রসঙ্গত তাবলীগ জামাতের কথা বলেছেন। অনেকেই ধারণা করে তাদের কাজের প্রক্রিয়াটি ভালো। অথচ বাস্তবে জাতীয় ইস্যুগুলোতে তারা সক্রিয় নয়। তাহলে তাবলীগ জামাতের সংকট বা সমস্যা কোথায়?

উত্তরঃ এটিও একটি সেনসেটিভ ইস্যু। এদেশে অনেক লোক তাবলীগ জামাতকে মনে প্রাণে ভালো জানে, যদিও তারা তাবলীগ জামাতে অংশ নেয় না। সে হিসেবে এখানে সত্য কথা বলাও একটি কঠিন ব্যাপার। তাবলীগ জামাতের উদ্দেশ্যকে আমি ভালো জানি। তাদের উদ্দেশ্যে কোনো ত্রুটি আছে বলে আমি জানি না। কারোর মনের খবরই আল্লাহ ছাড়া কেউ ভালো জানে না। তবে তাদের আমল তাদের উদ্দেশ্যকে খারাপ বলে না।

দ্বিতীয়ত, তাদের কাজের ধরণ একটি পদ্ধতি মাত্র। সকল পদ্ধতিই বৈধ যাতে শরীয়ত বিরোধী কিছু নেই। তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সেটিও বৈধ। তবে তারা যদি দাবি করে বসে তাদের পদ্ধতিই একমাত্র বৈধ পদ্ধতি - এ দাবি সঙ্গত হবে না।

তৃতীয়ত, কথা হলো তাদের পদ্ধতি কতটুকু যুগোপযোগী? আমাদের কাজের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে পরিবর্তন করা। কিন্তু তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন তাতে আজকের যুগে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এটি নিয়ে অনেক সময় ধরে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু আমি বলব সমাজ পরিবর্তনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। আমরা দেখি, ফ্রান্স, রাশিয়ার বিপ্লব কিংবা ইউরোপ, আমেরিকার সমাজ পরিবর্তন কিন্তু এ ধরনের পদ্ধতি দ্বারা হয়নি। ইরানের পরিবর্তন এভাবে হয়নি। সুতরাং এ পদ্ধতি দ্বারা আমার মতে খুব বড় কিছু হবে না। এর মধ্য দিয়ে কিছু লোক নামাজ শিখতে ও কিছু লোক রোযা রাখতে পারে। অনেকের ধারণা তাদের দ্বারা কিছু লোক

www.pathagar.com

কুরআন শিখে ফেলবে। কিন্তু কুরআন শেখার একটি ট্রাডিশনাল পদ্ধতি আমাদের সমাজে আগে থেকেই ছিল। ছিল বলেই আগেও প্রতিটি ছেলেমেয়ে কমবেশি কুরআন পড়া শিখতে পারত। কাজেই এটি এমন নয় যে তাবলীগ জামাত আসার পরেই এগুলো হয়েছে।

সে সাথে তাদের ত্রুটিগুলোর মধ্যে দেখি তারা অন্যের ভালো কাজ পছন্দ করতে পারে না। এটি আরেক সমস্যা। আমরা তাদের ভালোটার প্রশংসা করি, ফাইন। কিন্তু তারা অন্যদের ভালো জিনিসের প্রশংসা করতে পারছে না। অন্যরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন, কাজ করছেন, নির্বাচন করছেন, তার মাধ্যমে আইনও পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছে, শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করছে, ব্যাংক করছে, বীমা করছে, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করছে। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করছে, পত্রিকা বের করছে, টিভি চ্যানেল করে অশ্লীলতাকে রুখবার চেষ্টা করছে। তাবলীগ জামাতে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই।

আমি বলব তাবলীগ জামাতের কাজ এ পর্যায়েই থাকবে এবং আমি এর কোনো ব্যাপক বিস্তারও আশা করি না। তাবলীগ জামাতের যতটুকু রাইজ করার করে গেছে। বছরে তারা একবার একটি মাঠে একত্রিত হয়। আবার ছড়িয়ে পড়ে। আবার একত্রিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় এদের আর কোনো উত্থান হবে না। এ পর্যন্ত তারা সমাজের কোনো দিক থেকেই তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন শিক্ষার দিক থেকে, কালচারের দিক থেকে এরা কোনো অবদান রাখেনি। তারা পার্লামেন্টে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। মিডিয়াতেও নয়। এমনকি সমাজ সেবাতেও নয়। তারা বলতে পারবে না আমরা ৫০টি এনজিও করেছি এবং তার মাধ্যমে সমাজ সেবা করছি। তারা অনেক মাদ্রাসা, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, ব্যাংক, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারবে না। সুতরাং এটি তাবলীগ জামাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। তারা সিনসিয়ার লোক, ভালো লোক কিন্তু তারা ব্যর্থ।

প্রশ্নঃ তাদের পড়াশুনার সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়।

উত্তরঃ আমি সত্যিকারভাবে জানি না তাদের পলিসি কী? এটি আরোপিত কথা কিনা তাও জানি না। হতে পারে তারা ফাজায়েলের দু'তিনটি বই ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। আমি তাদের এমন কোনো নীতি নির্ধারণী বক্তব্য বা স্টেটম্যান্ট পাইনি যাতে তারা কুরআন পড়তে নিরুৎসাহিত করে। তবে তারা এগুলোতে উৎসাহিত করে না এ রকম একটি ধারণা জনগণের মধ্যে আছে। কারণ তাদেরকে পড়তে কম দেখা যায়। যদি সত্যিই তারা ঐ ধরনের কয়েকটি বই ছাড়া এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করে থাকেন তাহলে আমি মনে করি সেটি তাদের নিজেদের জন্য যেমন বড় ক্ষতি, জাতিরও ক্ষতি। তাদের

www.pathagar.com

উচিত তাদের কর্মীদেরকে জানার জন্য উৎসাহিত করা। বিশেষ করে কুরআন মজিদ পুরোপুরি অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ জানা উচিত। সে সাথে ইসলামের যেসব আলেম সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ নেই সেসব আলেমদের লেখা বই তাদের পড়া দরকার। তারা যদি মনে করেন শামসুল হক সাহেব, নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের বই পড়া যায় তাহলে তাদের সেগুলো পড়া উচিত। তবে সব ধরনের বই পড়তে হবে। ইসলামের শুরুর যুগে ইমাম গাজ্জালী তো মুশরিক ও নাস্তিকদের বই পড়েছেন। তারা তো ওই সব বই পড়েই মুশরিক বা নাস্তিকদের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ আসলে তাদের ইসলামের মৌলিক বইগুলো পড়া প্রয়োজন।

উত্তরঃ অবশ্যই। রাসূলের যে জীবনী তা তাদের পড়া উচিত। তাই বলা যায় তাদের বিরুদ্ধে পড়াশুনা না করার অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তা মোটেই ভালো নয়।

প্রশ্নঃ তাবলীগ জামাতকে কি ইসলামী আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত নয়?

উত্তরঃ তাদের সিস্টেম এমনই যে তারা তা বদলাতে পারছে না। এটি অনেকেরই দোষ যে একটি সিস্টেমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রয়োজনেও তা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। সে দলই ভালো যে নিজেকে রিভিউ করতে পারে এবং প্রয়োজনে চেষ্টা করতে পারে। দোষ অন্যদেরও আছে। অনেকেই তাদের কাঠামোর বাইরে যেতে চেষ্টা করেন না। এটি মোটেই ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। এটি কেন আসেনি এবং কিভাবে তাদের আরো সক্রিয় করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ সেটি তো আমারও প্রশ্ন। আর এটিই বর্তমান বাস্তবতা। আমাদের দেশে মহিলাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব ২০/২৫ বছর আগেও এতটা ছিল না। যেমন ভোটের ব্যাপারে সেই ১৯৩৫ সাল থেকেই পুরুষকে সার্বিকভাবে পরিবারের নারীর ভোটের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে। আমাদের দেশে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে রাজনৈতিকভাবে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার আগমনের সময় থেকে। তার আগে গুরুত্ব ছিল, তবে তা কম। এটি একটি প্রেক্ষিত। আবার, হয়ত বা ইসলামী আন্দোলন যতটা পুরুষকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে ততটা নারীকে দেয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে পুরুষকে দাওয়াত দিলেই নারী তার কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে যাবে। এটি একটি ধারণা। কিন্তু সরাসরি দাওয়াত আর ইনডাইরেক্ট দাওয়াত কখনোই এক নয়।

www.pathagar.com

১৯৮০ সালে নারী বর্ষ ঘোষণা করা হলো। ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ নারী সম্মেলন হলো। সেখানে নারী ইস্যু আবার আলোচিত হলো। পরিবেশের মতো জেন্ডার ইস্যু বিশ্বব্যাপী একটি এজেন্ডাতে পরিণত হলো। ফলে ইসলামী মুভমেন্টও বাধ্য হলো একে গুরুত্বের সাথে নিতে। এটি যে তাদের পজেটিভ আন্দোলন ছিল তা নয়। এটি একটি রিএকটিভ অবস্থান ছিল অর্থাৎ একটি ঘটনা ঘটছে, 'আই মাস্ট রেসপন্স নাউ' - সে হিসেবে নারীদেরকে এপ্রোচ করা শুরু হলো। সেটি দেরি হলো এবং একটি বাধ্যগত অবস্থার মধ্যে দিয়ে হলো। এ গুরুত্ব আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমরা যদি নারী জাগরণ থেকে দূরে থাকি তাহলে বিশ্বব্যাপী আমরা একপেশে হয়ে যাব। এ কারণে আমরা নারী ইস্যু গ্রহণ করলাম। কিন্তু এটিকে এভাবে হিসেব করা ঠিক হয়নি। তারা মানুষ, তারা মানবতার অর্ধেক। তাদের ইস্যু মানুষের ইস্যু, আমাদের ইস্যু। এ হিসেবে নারীর ইস্যু মেরিটের উপর গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভালো-মন্দ, দুঃখ-আনন্দ সব বিষয়েই নারী-পুরুষ উভয়েই জড়িত। ইসলামের নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি থিওরিটিক্যালি যতটা বলা হয়েছে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সে সমতা দেখাতে পারিনি। তারপরও নারীরাও এগিয়ে আসছে। ইসলামিক মুভমেন্টে আরকান বা রুকনদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ এখন নারী। তাদেরকে শূরাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সবখানে তারা পলিসি লেভেলে চলে আসছে। বর্তমানে ছাত্রীদের মধ্যে কাজ হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে নারীদের মধ্যে ভালো কাজ হচ্ছে।

প্রশ্ন: বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, নারী আন্দোলন এখনও পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারী যদি পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং তারা যদি নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে এর গতি আরো বাড়বে এবং এজন্য দরকার জয়নব আল গাজ্জালীর (মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী নারী নেত্রী) মতো নেতৃত্ব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর: জনাব কারযাভীর কথার সাথে আমি একমত। আজকে বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ হচ্ছে। কিছু স্মল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ আছে যারা হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল। তারা দেশ-বিদেশে পড়াশোনা করছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করছে। এর থেকে অনেকেই এগিয়ে আসবে। এরা আমার জানা মতে দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দলটির সমর্থক। সব মিলিয়ে একটি আধুনিক এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ ইসলামিক একটি নেতৃত্ব সামনে আসবে।

নারীদের কাজ নারীদের দ্বারা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। পুরুষের চেয়ে নিঃসন্দেহে নারী ইস্যু নারীরাই বেশি ভালো বুঝবে। সেখানে নারী ইস্যুতে পুরুষের

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ থাকা ঠিক নয়। গাইডেন্স নিতে পারে মাত্র। গাইডেন্স তো আমরাও নারীদের কাছ থেকে নিতে পারি। রাসূল (সা) হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় যখন কোনো দিক পাচ্ছিলেন না তখন হযরত উম্মে সালমার সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তার পরামর্শ মতোই তিনি কাজ করেছিলেন। তাহলে এটা তো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ। সূরা শুরাতে বলা হয়েছে 'তোমরা পরামর্শ মতো কাজ কর'। তার মানে পুরুষ-নারীও প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ করবে। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের খুবই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে হযরত উম্মে সালমার (রা) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, যখন সাহাবীরা রাসূলকে (সা) অপমানজনক চুক্তি সই করার জন্য অভিযোগ করেন এবং কোরবানী করতে রাজি হচ্ছিলেন না।

মুসলমানরা বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীকে নেতা হিসেবে মেনেছে। যখন হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের বদলার কথা উঠল তখন বিরাট একটি অংশ হযরত আয়েশার পক্ষ নিয়েছিল। আর আমি এর কোনো যুক্তি বুঝি না যে, কেন জাতি প্রয়োজনে নারীর দিকে টার্ন করবে না।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে অসংখ্য নারী সংগঠন আছে। অনেকেই নারী অধিকারের নামে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। নারীর অধিকারকে সামগ্রিকভাবে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

উত্তর: আমি সহানুভূতির সাথেই দেখি। নারীদের লিবারেট করার দরকার ছিল, কিন্তু ইসলামী মহল এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছিল না। নারী শিক্ষার জন্য লড়াই প্রথম দিকে ইসলামিস্টরা করেনি। সে লড়াই তাদেরই করতে হয়েছে যারা ততটা ইসলামিস্ট বলে পরিচিত নন। স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাকে দারুণ বিরোধিতায় পড়তে হয়েছিল। বেগম রোকেয়া কত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন শুধুমাত্র মেয়েদের সামান্য একটুখানি লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে। সত্যি কথা হচ্ছে আমাদের দেশের কনজারভেটিভ একটি অংশ কোনো ক্ষেত্রেই মেয়েদের এগিয়ে নেবার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। মেয়েরা শত শত বছর ধরে সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছিল না। আমার জানা মতে এজন্য কোনো সামাজিক আন্দোলন বেশিরভাগ আলিম করেননি।

সুতরাং এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী নারীর মুক্তির যে আন্দোলন হয়েছে সেটা পজেটিভ। তবে যাদের হাতে হয়েছে তারা যেহেতু ইসলামকে অত ভালো জানত না, সেজন্য এটি বিভিন্ন সময় রং ডাইমেনশনে গিয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আমাদের নেতৃত্ব না দেয়াতে অন্যরা এটাকে মিস গাইড করেছে। তবু আমি মনে করি, সার্বিকভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন আশাব্যঞ্জক। আমরাও তো আজ নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে

www.pathagar.com

জড়িত। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এ মুক্ত নারীকে বা আধামুক্ত নারীকে পূর্ণ মুক্ত করা এবং সে সাথে ইসলামাইজ করা।

প্রশ্নঃ ছাত্রজীবনে অনেক মেয়েই আন্দোলনে নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকার পরও বৈবাহিক অবস্থার শুরুর সাথে সাথে তাদের আর সে অবস্থায় দেখা যায় না। এ দিকটি আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তরঃ এটাকে আমি শুধু দুঃখজনক বলব। আমি বলব, আল্লাহতায়ালা যাকে যে মেধা ও যোগ্যতা দিয়েছেন তাকে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া দরকার। স্বামীরা যদি এটাতে বাধা দেয় তাহলে তারা মুনকার কাজ করল। আল্লাহ বলেছেন, 'ইন্নামাত তায়াতু ফি মারুফ'- আনুগত্য শুধু ভালো কাজের। সঠিক মেধাকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে স্বামীরা বাধা দেবে তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল নারীদের যে আনুগত্যের শপথ করিয়েছিলেন তার একটি অংশ ছিল, সূরা মুমতাহিনাতে বলা হয়েছে 'লা ইয়াছিনাকা ফি মারুফীন' - তারা তোমাকে অমান্য করবে না মারুফ কাজে। তার মানে শুধু মারুফ কাজে অমান্য করা যায় না। মুনকারে অমান্য করা যায়। সেখানে আমার মেধাকে বিকাশ করতে দেবে না, আমাকে লিখতে দেবে না, আমাকে প্রকাশ করতে দেবে না- এটি কখনো কি মারুফ হতে পারে? এটি তো মুনকার। একটা নারীর লেখার ক্ষমতা আছে তাকে লিখতে দেবে না, বক্তৃতার ক্ষমতা আছে বক্তৃতা দিতে দেবে না, সাংগঠনিক যোগ্যতা আছে, সমাজসেবার যোগ্যতা আছে তাকে তা করতে দেবে না, আমি এগুলোকে বলব মুনকার। নারীরা তা মানতে বাধ্য নয় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ সে ক্ষেত্রে তো সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে?

উত্তরঃ প্রাথমিকভাবে সকল বড় বিপ্লবের শুরুতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটিকে Teething trouble বলে। এগুলো হবে, কিছু লোক ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু পিছানো ঠিক হবে না। সমস্যা না হলে ভালো। কিন্তু সেটা হলেও আমাদের মানতে হবে যে বড় অর্জনের জন্য ছোট অসুবিধাকে মেনে নিতে হবে।

প্রশ্নঃ ইসলামিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল গঠনের অবকাশ আছে কিনা?

উত্তরঃ ইসলামের শুরুতে কতগুলো গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। তাকে আধুনিক পরিভাষায় দল বলা যায়। প্রথম দিকে সবাই একই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আলী (রা) সমর্থকদের একটা গ্রুপ হয়। এরপর এক পর্যায় খারিজীদের উদ্ভব হয়। তাদের কেউ ব্যান্ড করার কথা বলেনি। খারেজীরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরমপন্থি ছিল। তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত। তবে তাদের মূলত একটি পার্টি হিসেবে আবির্ভাব হয়। তাদের সম্পর্কে

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বলেছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভায়োলেন্স না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবো না। এরপর বনি উমাইয়ার শাসন কায়েম হলো। তখন আব্বাসী আন্দোলনের মাধ্যমে আব্বাসীরা একদিকে তার বিরুদ্ধে রিভল্ট করল। তারা একটি দল আকারে আবির্ভূত হয়ে বলল খিলাফত আমাদের। আমরা খিলাফত পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান প্রশ্নের এটি একটি দিক।

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইসলাম ঠিকই ঐক্যের কথা বলেছে। কিন্তু ঐক্য মানে এ নয় যে সকল মুসলমানকে একটি পরিবার হয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন পরিবার হতে পারবে না। এর মানে এও নয় যে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারবে না। আমরা বাস্তবে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রকে হিকমাহ বা পারস্পরিক ঐকমত্য বা সম্মতির ভিত্তিতে মেনে নিয়েছি। এমনকি আমরা জানি ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। একদিকে ছিল আব্বাসীয় খিলাফত। অন্যদিকে উমাইয়ার কিছু লোক পালিয়ে গিয়ে স্পেনে খিলাফত কায়েম করল। কায়রোতে ফাতেমী খিলাফত ছিল। এ চিত্র বাস্তবে ছিল। আজকে আমাদের একটি ওআইসি আছে। বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ এর সদস্য। তারাও রাষ্ট্রের ধারণাকে মেনে নিয়েছে। এটি হলো এই প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় কথা। অর্থাৎ ঐক্য মানে এ নয় যে, সব এক পরিবার হয়ে যেতে হবে, এক রাষ্ট্র হয়ে যেতে হবে।

তেমনি আমরা বলতে পারি না যে, যে সমস্ত মাজহাব রয়েছে তাদের সবগুলোকে এক হয়ে যেতে হবে বা আইনের ক্ষেত্রে একটি মতের অনুসারী হতে হবে। আমরা দেখেছি যে, আইনের ক্ষেত্রে অনেক মত থাকলেও এর মধ্যে ৪টি মত হলো প্রধান। এর বাইরেও মাজহাব আছে, এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং টিকে গেছে। এখানেও আমরা দেখি ঐক্যের মানে এ নয় যে একটি মাজহাবই হতে হবে। আরো বলা যায়, ঐক্য মানে এ নয় যে, কখনো দুই, তিন বা চার দল হবে না। আমরা দেখি পাকিস্তান বা ইরানের সংবিধান আলেমদের দ্বারা অনুমোদিত। আবার বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনগণের প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। প্রত্যেকের দল গঠনের অধিকার আছে। আজকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে পারে। তার বড় প্রমাণ পাকিস্তানের এমএমএ। তারা বলেনি যে আমাদের এক হয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে আজ বিভিন্ন দল একত্রে মিলিত হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করছে। কাজেই বলা যায়, ইসলামে যে একটিই দল হতে হবে সে ধারণাটি কল্পিত ও আরোপিত। ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে পণ্য এবং পদ্ধতির ব্যাপারে যা কিছু হারাম নয় তাই হালাল। সুতরাং এ পদ্ধতি আল্লাহতায়ালা হারাম করেননি। আল্লাহতায়ালা কখনো বলেননি, তোমাদের একটিই দল করতে হবে। তবে উম্মাহ এক। উম্মাহর মধ্যে অসংখ্য সংগঠন আছে, মতামত আছে।

www.pathagar.com

সার্বিক বিবেচনায় অসংখ্য দল হওয়ার মধ্যে আমি কোনো নীতিগত বাধা বা আপত্তি তাত্ত্বিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না। ঐক্যের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। সেখানে কুরআন ও হাদিসের কথা বলা হয়েছে। এটিই ঐক্য। ইসলাম অবশ্যই ঐক্য চায়। আর ঐক্য মানে এ নয় যে সবাইকে এক দল হয়ে যেতে হবে, এক মত হয়ে যেতে হবে। আগেও বলেছি, এ ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন মাজহাব হয়েছে এবং একে অপরকে মেনেও নিয়েছে। তারা গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফলে (result) পৌছানোকে প্রাণের লক্ষণ বলে মনে করছেন। এটি জীবনের লক্ষণ। এটি আমাদের সুষ্ঠু চেতনার লক্ষণ। এটি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের লক্ষণ।

প্রশ্ন : ইসলাম বহু দলে বিশ্বাস করে?

উত্তরঃ অবশ্যই। এর পক্ষে আমি আরো বলতে পারি। ইসলামের বর্তমানে যে শ্রেষ্ঠ দলগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। জামায়াতে ইসলামী কখনোই তার মেনিফেস্টোতে বলেনি এক দল হতে হবে। তাদের গঠনতন্ত্রের কোথাও দেখি না যে তারা একদল করতে চায়। তেমনি অন্যান্য ইসলামী দলগুলোও এক দল করার কথা বলেনি। এটি অন্যান্য দেশের ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানবাধিকারের ব্যাপারে যত বই আছে এবং যারাই মানবাধিকারের উপর বই লিখেছেন তারাই বলছেন ইসলামে দল গঠনের অধিকার আছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা আছে। মত প্রকাশের কথাই তো দল। রশীদ ঘানুষী একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, যাকে এ যুগের ইকবাল বলা হয়, তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রকে অবশ্যই মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। হতে পারে আনাচে-কানাচে থেকে কিছু লোক অনেক রকম কথা বলে। কিন্তু যারা চিন্তাবিদ নয় তাদের কথা বাস্তবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয়।

প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ বিরোধী দল গঠন করা কি সম্ভব?

উত্তরঃ বিষয়টির গভীরে যেয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা যদি বলি পারবে না তাহলে অমুসলিমরা অন্য কোনো অমুসলিম দেশে ইসলামী দল গঠন করতে দেবে না। আবার ইসলামের কোথাও সুস্পষ্ট করে বলা নেই যে অমুসলিমরা দল গঠন করতে পারবে না। যে ইসলাম একটি রাষ্ট্রে তাদের রাজনীতি, সমাজ, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সব ব্যাপারে ইহুদীদের স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল সেটি দল গঠন থেকে অনেক বড়। সেখানে আধুনিক ব্যবস্থায় আমি কোনো আপত্তিই দেখি না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে বলা থাকবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না। সেখানে অমুসলিমরা যদি মাইনরিটি হয় তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

www.pathagar.com

তারা তাদের অধিকার চাইবে। তাদের উপর কোনো অন্যায় করা হলে তারা তার বিচার চাইবে। তারাও একটি এলাকায় বাস করে বলে সে এলাকার উন্নয়ন দাবি করবে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির দাবি করবে। তারা ফরেন পলিসি নিয়ে কথা বলবে। এগুলো বলার অধিকার তাদের আছে। এ রাষ্ট্র তাদেরও। অমুসলিম মানেই ইসলাম বিরোধী এবং ইসলাম বিরোধী কাজ করা তাদের দায়িত্ব এটি ধরে নিলেও তারা সম্পূর্ণভাবে একটি শাসনতন্ত্রকে মেনেই কাজ করবে।

কাজেই আমরা যদি আমাদের মনকে বড় করতে পারি, আমরা যদি ইসলামের মৌলিক বিষয় বুঝতে পারি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর জোর না দেই তাহলে আধুনিককালে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে দল গঠনে আমি কোনো আপত্তি দেখি না। এটিকে সমস্যাও বলে মনে করি না। আর যারা এর বিপরীত কথা বলেন তাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রও মুসলিমদেরকে সে অধিকার নাও দিতে পারে। আপনি যা করবেন, আপনার উপরও তা আসবে।

প্রশ্ন: ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: আমি অনেকবার বলেছি ইহুদীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি অল মোস্ট রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র - এতটাই স্বাধীন। এটাও হতে পারে অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে হতে পারে। যে কোনো বিকল্পই গ্রহণযোগ্য। আধুনিক পদ্ধতির মত হচ্ছে একটি সংবিধান হবে। তাতে বলে দেয়া হবে কার কি অধিকার। এদিকে ওআইসি তার মানবাধিকার ঘোষণায় সকল নাগরিকের অধিকারের কথা বলে দিয়েছে। সেটা সকলেই ভোগ করবে। এখন প্রশ্ন হলো তারা পলিটিক্যাল কোন কোন পোস্টে যেতে পারবে? এটি খুবই ছোট বিতর্ক। ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে দেখি একজন অমুসলিমও সে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। পাকিস্তানের ইসলামিক সংবিধান হওয়ার পরও আমরা দেখেছি পাকিস্তানের স্পীকার ছিলেন নন মুসলিম। প্রেসিডেন্ট দেশের বাইরে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্পীকারই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজকের রাষ্ট্র প্রধান খলিফার পদের সমতুল্য কিনা? আমি মনে করি, তা নয়। কেননা খলিফা অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বিচার ক্ষমতা, মিলিটারি ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করতেন। সেখানে আজকের যুগের ব্যবস্থা অনেক ভিন্ন। এটি সে যুগের খলিফার সমতুল্য নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজ করতে হবে সংবিধানের মধ্যেই। কেউ অসাংবিধানিক কাজ করলে তার অধীনের লোকজনই তো তাকে মানবে না। রাষ্ট্র যেহেতু সংবিধানের উপরই ভিত্তি করে থাকে, পার্লামেন্টে যে আইন পাস হবে তা মুসলিম-অমুসলিম যেই

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হোন না কেন তাকেই তাতে সই করতে হবে। আবার কেবিনেটের ভূমিকাও অনেক। আগে সংবিধান লিখিত ছিল না। সব কিছু অস্পষ্ট ছিল, স্বচ্ছ ছিল না। বর্তমানকালে সংবিধানে সবই বলা থাকে। কার কি কাজ তা সবাই জানে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যখন আমরা সংবিধান তৈরি করি তখন সব কিছুই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে থেকে কেউ সহজে অন্যায় করতে পারে না। সে যুগে খলিফাদের ক্ষমতা অনেকটা ব্যাপক ছিল। কিন্তু আজকের যুগে প্রসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আইন ও সংবিধান দ্বারা লিখিত হওয়ার কারণে সীমাবদ্ধ। এ রকম চেকস এন্ড ব্যালান্সের মধ্যে আমি মনে করি একজন অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হলে তিনি দেশের কিছুই ক্ষতি করতে পারবেন না। অবশ্য মুসলিম দেশে অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

কাজেই আমি মনে করি, যারা অতি থিওরিটিক্যাল তারা ইসলামের ক্ষতি করবে। তারা ইসলামের মূল স্পিরিটকে হারাবে। তারা ছোটখাট বিষয়কে ফাইন টুইনিং করতে গিয়ে আসল বিষয়কে হারিয়ে ফেলবে। এটি হিকমার খেলাপ। এটি পরিস্থিতির মূল্যায়নের ব্যর্থতা হবে। ইসলাম আমাদের সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে।

শিক্ষা

প্রশ্নঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারা আছে- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। আবার মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও দুটি ধারা - আলিয়া ও কওমী। এগুলোর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে?

উত্তরঃ আমি নিজে আলেম এবং চিন্তাবিদদের সামনে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমি মনে করি সেটি করতে পারলে অনেক কাজ হতো। একদিকে বলেছি সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা, এটি ইসলামী নামকরণে নয়, টাইপে হবে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। অর্থাৎ এখানে সকল বিষয়ই পড়ানো হবে। সে সাথে ইসলাম বিষয়ক বিষয়ও থাকবে। আমি এ প্লানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এটি অনেক সুপরিকল্পিত। জাতি সিদ্ধান্ত নিলে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব। এখানে সোশিওলজি, হিস্ট্রি, ইকোনোমিকস, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, পালি, সংস্কৃত সব সাবজেক্টই থাকবে। সায়েন্সও থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান ও সেসব প্রত্যেক সাবজেক্টের ভেতর দু-একটি ইসলামিক পেপার ঢুকে যাবে। কিছু বিষয় থাকবে যেগুলো সবাইকে পড়তে হবে। এর মধ্যে একটি লিমিটেড পর্যায়ে এরাবিক লেংগুয়েজ পড়ানো হবে। অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত কিছু ইসলামের বিষয় থাকবে আর সাবজেক্টের

www.pathagar.com

মধ্যে কিছু। যেখানে সম্ভব নয় যেমন ফিজিক্সে, ইসলামিক ফিজিক্স বলে কিছু থাকবে না। কেমিস্ট্রিতে ইসলামিক কেমিস্ট্রি থাকবে না। ইকোনোমিকসে ইসলামিক ব্যাংকিং একটি পেপার থাকবে, ইসলামিক ফাইন্যান্স একটি পেপার থাকবে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে মুসলিম কন্ট্রিবিউশনের উপর একটি পেপার থাকবে। ইসলামিক পলিটিক্যাল থট থাকবে। এভাবেই ৪০/৫০টি কোর্সের মধ্য ইসলামিক কোর্সগুলো থাকবে। এই আদলে যদি আমরা জেনারেল ইউনিভার্সিটি গড়ে তুলি তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেবলমাত্র অমুসলিমদের ব্যাপারে সমস্যা থাকতে পারে। এজন্য অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যথার্থ অপশন দিতে হবে যাতে করে তাদের মনে কোনো কষ্ট না থাকে। আর পড়লে তারা জেনেই পড়বে, আমরা যেমন পড়ি। আমাদের আমেরিকা গেলে তাদের হিস্ট্রি পড়তে হয়। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ পড়তে হয়। জার্মানীতে গেলে জার্মান ল্যাংগুয়েজ পড়তে হয়। এটি করতে পারলে ইসলাম, মুসলমান সম্পর্কে তাদের মনের সন্দেহ দূর হবে। এটুকু সামান্য সমন্বয় করতে হবে, যে সমন্বয় ইতোমধ্যেই ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করেছে।

অন্যদিকে কওমী ও আলিয়া মাদরাসা স্ট্রিমের পরিবর্তনের কথাও আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বলেছি। আমি বলেছি মাদরাসায় কামেলে চারটি ডিগ্রি বর্তমানে দেয়া হয়। এর সাথে আরো তিন-চারটি ডিগ্রি দেয়া হোক। ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আলেম পর্যন্ত ১২ বছরে কোর্স একই থাকবে । ফাজিলে, কামেলে গিয়ে সম্পূর্ণ সাবজেক্ট ওয়াইজ হবে। অর্থনীতি, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কিংবা বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের মতো বিষয়ে কামেল হবে। আর একদিকে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, আদব বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কামেল তো পূর্বের মতো থাকছেই। এ রকম যদি আমরা করতে পারি তাহলে কামেল মাদরাসা সম্পূর্ণ আধুনিক লাইনে চলে আসবে। একদিকে আলেমও তৈরি হবে অন্যদিকে ইসলামের শক্ত ব্যাকগ্রাউন্ডসহ শিক্ষিত আধুনিক মানুষ তৈরি হবে। এরা অর্থনীতি এবং প্রশাসনের জন্য খুবই কার্যকর হবে। কওমী মাদরাসা ক্ষেত্রেও প্রথম ১২ বছর ঠিক রেখে ওইভাবে সমন্বয় করতে হবে। তারা এখন দাওরায় হাদিস দিচ্ছে। তার সাথে দাওরায় অর্থনীতি দিতে হবে। বেশি না করে আপাতত দুটোই করুক। না হলে দাওরায় পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন চালু করুক। এ রকম করতে পারলে সেখানে আধুনিক শিক্ষার একটি পর্যায় আসবে। তারপর একটি পর্যায়ে পূর্ণ সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ পরিকল্পনাটিই আমি আলেমদের সামনে পেশ করেছি এবং যতটুকু জানতে পেরেছি তারা এটি পছন্দ করেছেন। এটি জেনারেল লাইনের শিক্ষিতরাও বুঝতে পারলে আরো ব্যাপকভাবে আমরা লাভবান হবো। এতে বহুমুখী উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সমন্বয়ের দিকে এগুতে পারি। সব ভেঙে চুরে একটি

www.pathagar.com

করতে চেষ্টা করার চেয়ে এটি ভালো। একটি পর্যায়ে পৌছাতে পারলে তখন লোকেরা হয়ত বা কিছু দাবি করতে পারেন। তখন ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ হবে। আমাদের এখন ভাববার দরকার নেই যে ৩০/৩৫ বছর পর কি হবে?

প্রশ্ন: আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কি যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে?

উত্তর: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন দরকার, এটি অস্বীকার করা যাবে না। যে সমস্ত শিক্ষা কমিশন হয় এবং তারা রিপোর্ট ও সুপারিশে যা বলে ঠিকই বলে। শুধু আইডিওলজিক্যাল প্রশ্নে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। কুরআন হাদিস বা ইসলাম পড়ানো হবে কি হবে না এরকম। বিষয়টি আমি বেশি লম্বা না করে বলব, আমাদের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টগুলোতে যে বিষয় জোর দেয়া হয়েছে তা হলো- বিজ্ঞান শিক্ষা ও জেনারেল শিক্ষা। সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। আমি এর বেশি আর বলতে চাই না এজন্য যে, আমি সব বিষয়ে এক্সপার্ট নই এবং সব বিষয় এক্সপার্ট হওয়া আমি জরুরীও মনে করি না। এজন্য সুপারিশমালাগুলোর ভালো দিকগুলোকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এ প্রশ্নের যে উদ্দেশ্য তা পূরণ হতে পারে।

প্রশ্ন: আপনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের অপরাপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উম্মাহর চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারছে?

উত্তর: বাংলাদেশের অনেক মাদরাসা নামের জামেয়া বাদ দিলে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা প্রায় ৫০টি। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় তা মাত্র ৮ কি ১০টি। ফলে এর দ্বারা উম্মাহর যে চাহিদা তা তারা পূরণ করতে পারবে না। তবে এর একটি মডেল বিল্ড আপ হচ্ছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের বিরাট উপকার হবে। যেমন আমি নিজের কথাই বলি, ইসলামী ইউনিভার্সিটি চিটাগং-এ আমরা বলতে গেলে তেমন কিছুই করতে পারিনি। তারপরও যা কিছু হয়েছে তাই নিচ্ছে অন্যরা। মানারাত, তারা কোর্স নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছ থেকে কোর্স নিচ্ছে। এর থেকে এর ডিমান্ড বোঝা যায়। যদি আমরা মালয়েশিয়ার মতো একটি সাকসেসফুল মডেল দাঁড় করাতে পারি তাহলে এর খুবই চাহিদা আছে। তাদের মডেলকে শত শত ইউনিভার্সিটি স্টাডি করছে। তার থেকে কোয়ার্টার, হাফ বা ফুল নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের এখানে যারা এটি নিয়েছেন তারা ড. আবদুলহামিদ আবুসুলাইমান বা তাদের মতো জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমকক্ষ না হওয়ায় এটিকে সেভাবে আত্মস্থ করতে পারছেন না। সে ক্ষেত্রে একশ'র জায়গায় হয়ত বা ৬০ কি ৭০ করছেন। এদের থেকে আবার অন্যরা নিচ্ছেন। তবুও এর গুরুত্ব বিরাট।

www.pathagar.com

কাজেই আমি এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, এটি উম্মাহর চাহিদা পূরণ করতে পারছে। একটি মডেল তৈরি হচ্ছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা যে গতিতে চলছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এটি বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এটি একটি আশার বিষয়।

প্রশ্নঃ কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিশেষ বিষয়ের উপরই জোর দিয়ে থাকে?

উত্তরঃ বিষয়টি হলো একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একশ' সাবজেক্ট খোলা সম্ভব নয়। এটি এখন পর্যন্ত নয় - যা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে সরকারি টাকায়। সেখানে ৪০/৫০ কোটি টাকা যাই লাগুক সবটাই সরকার দিয়ে থাকে। ছাত্রদের বেতনে এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। সেখানে ছাত্রদের বেতনেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চলতে হয়। ফলে স্বভাবতই তাদেরকে এমন সব সাবজেক্ট খুলতে হয় যেসব সাবজেক্ট পড়ার জন্য ছাত্ররা লাখ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি। সেসব সাবজেক্ট পড়ার জন্য ছাত্রও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ যদি আরবী খোলা হয় তাহলে ৫ লাখ টাকা খরচ করে আরবী পড়ার জন্য ছাত্র পাওয়া যাবে না। বাংলার জন্যেও পাওয়া যাবে না। সুতরাং তারা শুরুতেই এমন সব সাবজেক্ট খুলছে যেগুলো মার্কেটেবল। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কখনই পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিকল্প হতে পারে না। তারপরও তারা যেসব বিষয় খুলছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয়ারই চেষ্টা করছে। যেমন কম্পিউটার সায়েন্সে সরকারি ইউনিভার্সিটিতে যা পড়ানো হয় এখানেও তাই হচ্ছে।

প্রশ্নঃ হুজুগপ্রিয় এ দেশে গার্মেন্টেস ও কোচিংয়ের মতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার এক মহা উৎসব শুরু হয়েছে। দু'একটি বাদে বেশিরভাগ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে বড় ধরনের কোচিং সেন্টার বললেই যথার্থ বলা হয়। অনেকে এটিকে আলু-পটলের ব্যবসার মতোই একটি ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন।

উত্তরঃ ঠিকই আছে। যারা বলছেন তারা এ অর্থে বলছেন যে, এ ইউনিভার্সিটিগুলোর মান সঠিক কিনা? এ প্রশ্ন আমারও রয়েছে। সরকারের যারা লাইসেন্স বা অনুমতি দিচ্ছেন, মান ঠিক আছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তাদেরই। এটি না দেখলে ভুল করবেন। এত অনুমতি দিচ্ছেন কেন যদি তারা মান দেখতে না পারেন? এটি যেমন ঠিক আবার বেশিরভাগ লোকের মত হচ্ছে এত সংখ্যক এক সাথে অনুমতি দেয়া ঠিক হয়নি। আস্তে আস্তে দিলে ভালো হতো।

এখানে কর্মাশিয়াল প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা এসেছে। তবে লাভের জন্যেই যে করছে তা বলব না। বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিরই এখন ট্রাস্ট হয়েছে। এতে একটি পয়সাও

www.pathagar.com

ব্যক্তির পকেটে যায় না। এর হিসাবেও গণ্ডগোল করা সম্ভব নয়। বাস্তবে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে সহজেই সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এখানে ডাইরেক্ট পেমেন্ট হয়। পে-অর্ডার, ড্রাফটের মাধ্যমে পেমেন্ট হয়। এগুলো গোপন করাও সম্ভব নয়। কিছু ইউনিভার্সিটির মান পুওর - এ কথা ঠিক। এজন্য আমি বলব তারাই দায়ী। আর সরকার যদি সুপারভাইজ না করে তাহলে মানুষ লাই পেয়ে যাবে, কেয়ারলেস হয়ে যাবে। তাই হয়েছে। কিন্তু ওভারঅল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মুভমেন্ট দরকার ছিল। এর ফলে বিদেশে যাবার প্রবণতা কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে। এসব ছেলেমেয়েদেরকে তো বিদেশে পাঠানো হতো। এখানে লেখাপড়া হয় না কিংবা অন্যান্য নানা অজুহাতে ইউরোপ-আমেরিকায় মানুষ তাদের ছেলেমেয়েকে পাঠাতো। এখন এখানে ৫ লাখ টাকা লাগলেও বাবা মা খরচ করছেন। আগে ছেলেদের বিদেশে যাবার অনুরাগ ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে যাওয়া, উছিলা ছিল পড়াশোনার, এখন সেটি কমছে। বর্তমানে ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা যাবার হিড়িক কমে গেছে। তারাও নিতে চাচ্ছে না। এটি আমাদের জন্যেই ভালো হয়েছে।

প্রশ্নঃ কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটি ঘাটতি আছে। প্রতিযোগিতামূলক চাকরির ক্ষেত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ধারেকাছেও আসতে পারছে না অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি। আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির তো কোনো খবরই নেই। এ পার্থক্যটা কেন?

উত্তরঃ চল্লিশ বছর আগেও, আমরা যে বছর সিভিল সার্ভিসে যাই প্রায় শতকরা ৯০ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই সে সময় সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাও আজকের মতো এত সাবজেক্ট ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হাতে গোনা কয়েকটি সাবজেক্ট ছিল। দেশের সব ভালো ছাত্রই প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে। না পেলে অন্যস্থানে যায়। কাজেই ভালো ছাত্রের সংখ্যা বেশি হওয়ায় যে কোনো প্রতিযোগিতায় এরাই বেশি টিকে থাকে। আসলে তারা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানে ঢাকা শহর নয়, ৬৪টি জেলার ছেলেমেয়ে, যারা কম্পিটিশনে টিকে এখানে এসেছে। বেশি ভালো ছেলেমেয়েগুলো যদি এখানে চলে আসে তাহলে কি করে অন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় সমান হয়? কোয়ালিটি সব প্রতিষ্ঠানের প্রায় একই। কিন্তু ফার্স্ট বয়রা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় আর সেকেন্ড বয়রা যদি অন্যখানে ভর্তি হয় তাহলে তো তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পারবে না। তাই আমার মন বলে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। একটা কথা সবাই স্বীকার করবে গ্রামের কলেজগুলোর টিচারের মান ঐ পর্যায়ের নয়, যে পর্যায়ের মান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের আছে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ স্কুল লেভেলে যদি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে না আসতে পারে তাহলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ছাত্র পাওয়া যাবে না। তখন এ সমস্ত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা কি হবে। তাহলে কি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই স্কুল লেভেলে স্ট্রাস্ট করে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসা উচিত নয়?

উত্তরঃ এটি ঠিক যে প্রাইভেট সেক্টরের স্কুল লেভেলে আগে এগিয়ে আসা উচিত। স্কুল লেভেলে আমরা যেমন মানারাত করেছি সে রকম প্রাইভেট সেক্টরে যদি আরো ১০০ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাহলে ভালো হবে। তবে ব্যবসা গড়ে উঠেছে স্কুল এডুকেশনে। এটি আনফরচুনেট যে কিন্ডারগার্টেনগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। আর তাদের মানের ব্যাপারে আমার অত ইনফরমেশন জানা নেই। সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানের তো সমস্যা আছেই। তবে প্রত্যেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি একটি করে ভালো ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে তার ফল ভালো হবে।

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে কোচিং সেন্টারের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেন?

উত্তরঃ আসলে এটি একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় কোচিং সেন্টার সিস্টেম নেই। এমনকি ইস্ট পাকিস্তানেও কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বেরিয়েছে, কোনো কোচিং সেন্টার ছিল বলে মনে পড়ে না। কোচিং সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে দেশে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে তা কিন্তু নয়। বাস্তবে জ্ঞানের কোনো বিকাশ হয়নি। আমি যতটুকু জানি, তারা একটি ফরমেট ফলো করে। এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি কিংবা ভর্তি পরীক্ষার উপর তারা একটি স্টাডি করে, কি কি প্রশ্ন হতে পারে এবং তারা তা গিলিয়ে দেয়। এটিকে তারা মডেল টেস্ট বলে। আট-দশটা মডেল টেস্টের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে গিলানোর চেষ্টা করা হয়। এতে তাদের নলেজ কিছুই বাড়ে না বরং নলেজ কমে। কারণ তারা সব বাদ দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট পড়াশুনা করে। এভাবে নেরো ডাউন (narrow down) করে নিয়ে আসে তারা।

এটি আমাদের জন্যে ক্ষতিই হচ্ছে। এটা সরকার চাচ্ছে তুলে দিতে। কিন্তু তারা একটা লবি হয়ে গেছে। তারা এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। এতে যদি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা মামলাও করে এখানে তারা লাখ লাখ টাকা মামলার পেছনে ব্যয় করতে দ্বিধা করবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোচিং সেন্টার উঠে যাওয়া উচিত। এর জন্য সরকারকে নতুন আইন যদি করতে হয় সে আইন করা উচিত। এতে একটা প্রশ্ন কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে উঠতে পারে যে কিছু লোকের রুজি নষ্ট হবে। বলবে কোর্স করলে ছেলেদের ভর্তি সুবিধা হয়। তবে এটা কিন্তু সত্যি নয়। ধরলাম ৫০ হাজার ছেলে কোচিং নিল। কিন্তু আলটিমেটলি ২০০০ সিটের জন্য

www.pathagar.com

তো ২০০০ ছাত্রেরই ভর্তির সুযোগ হবে। অর্থাৎ কোচিং করা ৫০ হাজারের মধ্যে মাত্র ২০০০ ছাত্রই সুযোগ পাবে। আবার কোচিং সিস্টেম না থাকলেও ৫০ হাজারের মধ্যে ঐ দু'হাজারই ভর্তির সুযোগ পেতো। বরং নন কোচিং অবস্থায় রিয়েল ট্যালেন্ট ছাত্ররাই চান্স পেত। তাই কোচিং সেন্টার থাকার কোনো দরকার নেই। এটি তুলে দিতে হবে, যদি একবারে না পারা যায় তাহলে দুই-তিন বছরে তুলে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় হতে হবে। আমি জানি সরকারের বিরোধিতা হবে। এসব সমস্যা আছে। কিন্তু তার মধ্যেও যদি কোনো সরকার দৃঢ় হয় তাহলে তা জাতির জন্যই ভালো হবে।

প্রশ্নঃ গাইড বই আরেকটি ফ্যাক্টর, স্কুল লেভেলে পাঠ্যবই গাইড ছাড়া বিক্রয় না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। গাইডের মানও যাচ্ছে তাই অবস্থা।

উত্তরঃ আমি জানি না শিক্ষাবিদদের মত কি? আগে হাতে গোনা দু'একটা নোটবুক ছিল। কিন্তু আমরা তো সে নোটবুক পড়িনি। তাও সবাই কিনতো না। গাইড বই সিস্টেম সারা দুনিয়ার কোথাও নেই। তবে যদি সরকারের অনুমতি নিয়ে গাইড বই উপকারী লেভেলে তৈরি করা যায় তাহলে তাতে আপত্তির কিছু দেখি না। তা অবশ্যই টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু কোচিং সেন্টার এর থেকে অনেক বেশি খারাপ। এতে গার্জিয়ানদের অর্থ খরচ হয়। আমাদের ইকোনোমি দুর্বল। আমাদের আয় কম। এতে বাবা-মার উপর প্রেসার পড়ে। আজকাল তো বাবা-মায়ের উপর প্রেসার সাংঘাতিক। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়। গাইড বইও যদি কেনে হাজার টাকার বেশি লাগে, আর কোচিং সেন্টারগুলোতে হাজার টাকা তো মাসেই লাগে। মৌলিক সমস্যা না হলেও কোচিং সেন্টারের মতো গাইড বইও একটি সমস্যা।

প্রশ্নঃ শিক্ষাখাতের বর্তমান ব্যয়কে কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করেন?

উত্তরঃ আসলে বর্তমানে আমাদের যে বাজেটের আকার তাতে শিক্ষাখাতে সবটুকু বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। তবে এখানেও টার্গেটভিত্তিক এক একটি করে কাজ শেষ করা সম্ভব। তার জন্যে আগে আমাদের ঠিক করতে হবে কোন কাজ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশে এখন সরকারি খাতে আছে। এতে সব খরচ সরকারের উপর চলে আসে। যে কোনো কারণেই হোক এরশাদ সাহেবের সময় থেকে সরকারিভাবে টিচারদের বেতন দেয়া শুরু হয়। তখন এটি ভালো মনে হলেও আসলে তা ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ। এরপর বেতনের ক্ষেত্রে আরো অনেক দাবি দাওয়া উঠতে শুরু করে। অথচ বৃটিশ আমল আর পাকিস্তান আমলের মতো শুধুমাত্র জিলা স্কুল ছাড়া সকল স্কুল প্রাইভেট সেক্টরে থাকা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

মিডিয়া

প্রশ্নঃ মিডিয়া নিয়ে আপনার ভাবনা কি?

উত্তরঃ মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো সংগঠন, যে কোনো আদর্শ (ideology) বা যে কোনো দেশ যদি নিজেকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তাকে মিডিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দুনিয়াতে বড় শক্তিগুলো মিডিয়ার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন আমেরিকা, বৃটেনের বিশ্ব মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় টিভি চ্যানেল BBC, NBC, ABC, CNN সবই বৃটেন ও আমেরিকায়। আবার জার্মান, ফ্রান্সেরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল রয়েছে। আমি আলজেরিয়াতে ফ্রান্স চ্যানেলের ব্যাপক প্রভাব দেখেছি। কেননা তারা আরবীর পরেই ফ্রান্স জানে।

বিশ্বে নানা ধরনের শক্তির মাধ্যম আছে। এর মধ্যে অর্থ একটি। মিলিটারি পাওয়ার একটি। আর বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তির মাধ্যম। তবে এটি ঠিক আমেরিকার মিডিয়ার উপর একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বেশি। এরা দু'দিকের স্বার্থেই কাজ করে থাকে। যখন আমেরিকান হিসেবে দেখি এরা আমেরিকান পারপাস সার্ভ করে এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে গোষ্ঠীর পারপাস সার্ভ করে। মিডিয়ার প্রধান মাধ্যম হলো বর্তমানে টিভি চ্যানেল এবং বড় বড় সংবাদ এজেন্সিগুলো। যেমন রয়টার এপি, এএফপি প্রভৃতি। সে সঙ্গে শক্তিশালী সংবাদপত্র যেমন নিউইয়র্ক টাইমস, ফিনান্সিয়াল টাইমস, ইকোনোমিস্ট, টাইম, নিইজ উইক ইত্যাদি। এরকম গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা প্রায় সব তাদেরই নিয়ন্ত্রণে যারা শক্তিশালী। অথবা আমরা উল্টো করেও বলতে পারি পাওয়ারফুলদের দ্বারাই মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

তাই আমরাও যদি চাই বাংলাদেশের দুনিয়াতে নাম হোক তাহলে তারও মিডিয়াতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ইসলামের জন্য মিডিয়াতে শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন। যে কোন কারণেই হোক মিডিয়াকে তারা উপেক্ষা করেছে। হয়ত তারাও চিন্তা করেছে তাদের ভালো পত্রিকা দরকার। কিন্তু চ্যানেল করার চিন্তা তাদের মাথায় এসেছে গত কয়েক বছর ধরে। কারণ টিভি চ্যানেল সারা বিশ্বে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ই জনপ্রিয় হয়েছে। তখন CNN নাম করে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ২০-৩০ বছর ধরে থাকলেও তখনই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এদিক দিয়ে ইসলামিক মুভমেন্টের অবস্থান ততটা মজবুত নয়। সংবাদপত্র থাকলেও আর্থিক লিমিটেশনের জন্য তারা তাতে প্রভাব রাখতে পারেনি। এখন কেউ যদি মনে করে আরবদের অর্থ ইসলামের অর্থ, আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। আরব লোকগুলো যদি তাদের অর্থকে ইসলামের জন্য অনুভব না করে, না বোঝে এবং তারা যদি মিডিয়ার গুরুত্ব না বোঝে তাহলে শুধু অর্থ থাকলেই

www.pathagar.com

হবে না। যার হাতে অর্থ আছে সে মুসলিম হলেই হবে না। তাকে অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে। তাকে বিশ্বরাজনীতি বুঝতে হবে। এ রাজনীতির ভারসাম্য, তার সমীকরণ, ভবিষ্যৎকে বুঝতে হবে। এটি না বুঝলে অর্থ থাকলেও সে অর্থ কাজে লাগবে না।

ইসলামী শক্তিগুলোর যদিও মিডিয়ার প্রতি চিন্তা ছিল কিন্তু তারা সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এসব ব্যাপারে যেসব এলাকা সবচেয়ে দুর্বল তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। পাকিস্তানে ইসলামী শক্তির এবং অনৈসলামী শক্তির মিডিয়া কন্ট্রোল ব্যালান্সড। আমার ধারণা আরব বিশ্বেও মোর অর লেস ব্যালান্সড। এটি অবশ্য সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে। মুসলমানরা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে নতুন। অবশ্য আল জাজিরা চলে এসেছে। ইসলামী শক্তি হিসেবে না আসলেও এটি মুসলিম চিন্তার বাইরে নয়। আরব বিশ্বে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পাওয়ারফুল মিডিয়া হওয়াতে ওয়েস্টার্ন চ্যানেলের আধিপত্য বর্তমানে সেখানে ততটা নেই। আমার মনে হয় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার টিভি চ্যানেলগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ইংরেজি না হওয়ার কারণে সেখানে ইংলিশ টিভি চ্যানেলের তেমন কোনো আকর্ষণ নেই। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি প্রব্লেম এরিয়া যেখানে ইসলামী শক্তির নিজস্ব কোনো টিভি চ্যানেল নেই। সত্যিকার শক্তিশালী ইসলামী টিভি চ্যানেল সাউথ এশিয়াতে নেই।

এটি একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা আরব দেশগুলোতে তেমন নেই। তারা ইংলিশ স্পিকিং পিপল নয়। তাদের নিজস্ব চ্যানেল আছে। ইংলিশ টিভি এরিয়ার মুসলিমদের নিজস্ব তেমন কিছুই নেই। এসব জিনিস ওভার অল আমাদের বিবেচনা করতে হবে। অন্ততপক্ষে পাঁচ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কাভারেজসহ একটি টিভি চ্যানেল করতে হবে। আল জাজিরা বর্তমানে যে অবস্থানে আছে তারা চাইলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী হতে পারে।

প্রশ্ন: আমরা পাশ্চাত্য আগ্রাসনের কথা বলে থাকি। অথচ তারা কিন্তু যোগ্যতা এবং সামর্থ্য নিয়েই তো এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তো তার মোকাবিলার চেষ্টাই করি না। আমাদের দুর্বলতাকে কি পাশ্চাত্যের দোষ বলে চালানো যায়?

উত্তর: পাশ্চাত্যকে দোষ তো দেয়া যায়ই। কেননা যে কোনো শক্তিকেই যদি অপব্যবহার করা হয় তাহলে তা নৈতিকতা হারায়। কোনো কিছুর উপর যদি নিয়ন্ত্রণ থাকেই তাহলে তার নৈতিক ব্যবহার করতে হয়। সারা বিশ্ব আসলে চলছে একটি নৈতিক বিধানের উপরে। এখানে মানুষ একে অপরকে কেয়ার করবে, খেয়াল করবে। কেউ কাউকে ধ্বংস করবে না। সুতরাং আজকে আমেরিকা বা ইহুদীদের কাছে যে মিডিয়া পাওয়ার আছে তা যদি তারা অপব্যবহার করে তাহলে সেটি একটি অপরাধ। তা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের অর্থ আছে। অর্থের যদি আমরা অপব্যবহার করি

www.pathagar.com

তাহলে তো তা নৈতিক অপরাধ হবে। আইন, নৈতিকতা, বিবেক বলবে এটি অপরাধ। কাজেই যে কোনো শক্তিরই অপব্যবহার করা হলে তাকে ভালো বলা যায় না।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের স্বার্থে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

উত্তরঃ এজন্য মিডিয়াকে সঠিক গুরুত্ব দেয়ার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার ধারণা এ বিষয়টি নিয়ে সবাই ভাবছে। কিন্তু এটি কি করে করা যায়, কিভাবে করা যায় তা আমার পক্ষেও বলা মুশকিল। কারণ এজন্য একটি গ্রুপ লাগবে যারা অর্থ-বিত্ত নিয়ে এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশে মিডিয়া কেন দরকার? ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলগুলো মোকাবিলা করার জন্য মিডিয়ার অতটা দরকার নেই। সে শক্তি এ মুহূর্তে আমাদের নেই। এখানে এই বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার দরকার যে আমাদের মিডিয়াতে গভীরভাবে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, স্থানীয়ভাবে অনৈসলামিক পরিবেশ আছে তা বন্ধ করা। স্থানীয়ভাবে ইসলামের বিপরীত ধারার দিকে সমাজকে, কালচারকে, জাতিকে বিপরীতগামী করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে তা রোধ করা। স্থানীয় চ্যানেলগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে ওই পর্যায়েরই কয়েকটি টিভি চ্যানেল লাগবে। আমি জানি বেশ কিছু ব্যক্তি এ বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। তাদেরকেই এর উদ্যোগ নিতে হবে।

এর মাধ্যমেই স্যাটেলাইট চ্যানেলের জবাব সম্ভব মতো দিতে হবে। সে জবাবটা কার্যকরী হবে কেবল বাংলাদেশেই, বাংলা ভাষাতেই। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান কিংবা মিডল ইস্ট থেকেই এগিয়ে আসতে হবে। নয়ত ইউরোপ থেকে আসতে হবে। ইউরোপেই মুসলিমদের বড় টিভি চ্যানেল করতে হবে। সেখানে স্বাধীনতার সুযোগ আছে। সে সুযোগকেই কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং আমাদের দেশে টিভি চ্যানেলগুলোর উদ্দেশ্য আমার মতে এ পর্যায়ে আপাতত থাকবে যে কেবল স্থানীয় পর্যায়ে অনৈসলামিক গতিধারাকে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্নঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান কোন পর্যায়ে?

উত্তরঃ আমার মতে কোনো পর্যায়ে নেই। আমাদের কর্মীদের মধ্যে লক্ষাধিক গ্রাজুয়েট আছে। এদের কেউ আবার মাস্টার্স, কেউ কামিল পাস। কিন্তু খুব কমই আউটস্ট্যান্ডিং। যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই তাহলে এখানে আমি মাওলানা

www.pathagar.com

মওদূদী পাই না। আমিন আহসান ইসলাহী পাই না। সাইয়্যেদ কুতুব পাই না। আল্লামা ইকবালের মতো লোক পাই না। ড. কারযাভী, মুহাম্মদ আল গাজ্জালী, জয়নাব আল গাজ্জালীর মতো ব্যক্তিত্ব পাই না। সে পর্যায়ের লোক তো এখানে তৈরিই হয়নি। ইন্টেলেকচুয়াল পর্যায়ে আমরা যে কোনো বড় কিছু অর্জন করিনি এটি তার একটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে আমাদের তেমন কোনো মৌলিক কাজ নেই। যেমন যাকাতের ফিকাহ বইয়ের মতো একটি কাজ আমরা করতে পারিনি। মুহাম্মদ গাজ্জালীর লেখা ইসলামের আকীদার পর্যায়ের কোনো বই এখানে লেখা হয়নি। ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা অথবা ড. আবদুলহামিদ আবুসুলাইমানের বই 'ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' (Towards an Islamic Theory of International Relations), দি ক্রাইসিস অব দি মুসলিম মাইন্ড কিংবা ড. ওমর চাপড়ার অর্থনীতির উপর যে তিনটি বই আছে সে রকম পর্যায়ের বই আমরা কি এখানে প্রকাশ করতে পেরেছি? দশটি বই পড়লে একটি বই লেখা যায়। অথচ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে উপস্থাপন করার মতো আমাদের এমন কী কাজ আছে? আমাদের এখানে ভালো ভালো বইয়ের কিছু অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু লেখকদের ভালো মৌলিক লেখা কোথায়? লেখার মূল্যায়নে আমি তা দেখতে পাই না। ড. কারযাভীর মতো সিরিজ অব বুকস আমরা পাচ্ছি না। অথবা ইকবালের রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়ান ইন ইসলাম - এই একটি বইয়ের কথা বললেও এর সমান কোনো বই আমাদের এখানে লেখা হয়নি।

আকরাম খাঁর উপর আমার রেসপেক্ট আছে। তিনি পুরানো মতগুলোকেই আধুনিক চিন্তার সাথে মিলিয়ে 'তরজমানুল কুরআন' বের করেছিলেন। এটি একটি বড় কাজ। নজরুল ইসলাম ইসলামী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কাজ করে গেছেন। হামদ, নাত বা রাসূল প্রশস্তির ক্ষেত্রে তার এটিকে অসাধারণ বলতেই হবে। এটি একদম অরিজিনাল কাজ, মৌলিক কাজ। ফররুখ আহমদ তার কাব্যে মৌলিকত্ব নিয়ে এসেছেন। এটি আমি একজন এনালিস্ট হিসেবেই বলছি। আমার দায়িত্ব এনালাসিস করা। আমার দায়িত্ব স্বীকৃতি দেওয়া যার স্বীকৃতি প্রাপ্য। সব মিলে বলা যায় ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে আমাদের এখানে এখনও যথার্থ কাজ হয়নি।

সমাধান কী? সমাধান দু'টি। এক, বাইরে থেকে যত গুরুত্বপূর্ণ বই আছে অনুবাদ করে নিতে হবে। মৌলিক কাজ এ মুহূর্তে জরুরী হলেও বর্তমানে তার ঘাটতি আছে। দুই, আমাদের ইয়াং যে ব্যাচ আছে তাদের ১ হাজার ছেলেকে এখনই পড়াশোনায় যুক্ত করে দেয়া যে তোমরা পড়তেই থাকো। ২ লাখ কর্মী থেকে ১ হাজার আলাদা করে ফেললেই হয়। তাহলে তার মধ্যে থেকে অন্তত ১০ জন স্কলার বেরিয়ে আসবে। এটি হবে হয়ত ২০-২৫ বছর পর। তখন তারা সত্যিকার মৌলিক কাজ করতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ এ জন্য কি কাঠামোগত কোনো পরিকল্পনা আপনার আছে?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে হঠাৎ করে আমি কোনো সাজেশন দিচ্ছি না। তবে আল্লামা কারযাভীর সাজেশন আছে লিডারশিপ ট্রেনিং করা। এটি চিন্তা করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হিসাম আল তালিবের ট্রেনিং গাইডে যে সাজেশন আছে তা দেখা যেতে পারে। আমি শুধু ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়ে একটি কথা বলতে পারি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে ৭ দিন, ১০ দিন ট্রেনিং দেয়া হয় সে ট্রেনিং থাকবে। কিন্তু একদল লোককে ছয় মাসব্যাপী ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্তত ৩০ জন করে ৩/৪ টি ব্যাচে একটি একাডেমীতে ইসলামী সাহিত্যের কোর্সের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থাকতে হবে। ১৫ দিনের ট্রেনিংয়ে কোনো ট্রেনিং হয় না। বর্তমানে সেখানে কয়েকটি হাদিস ও দরসে কুরআন এবং কয়েকটি অতি পরিচিত বিষয়ে আলোচনা থাকে যা ৩০/৪০ বছর ধরেই চলছে। সে ট্রেনিং দ্বারা হবে না। এখানে উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বইকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে কম্পিটেন্ট টিচার দ্বারা। টিচারের অভাব মেনেই এর মধ্যে এ কাজ করতে হবে। এটি যদি ইসলামী আন্দোলন করতে পারে তাহলে প্রতি বছর প্রায় একশ লোক এবং ১০ বছরে ১ হাজার লোক তৈরি সম্ভব। এ কাজটি নিয়ে তারা ভাবতে পারে।

প্রশ্নঃ ইসলামী আন্দোলনে বাংলাদেশে শ্রমিকরা সেভাবে সাড়া দিচ্ছে না কেন যেভাবে এক সময় তাদের ভেতর বাম আন্দোলনে সাড়া পড়েছিল?

উত্তরঃ এটি ঠিকই। আর এ ব্যাপারে আমার যে খুব একটা সঠিক উত্তর আছে তাও বলব না। তবে আমি দেখি বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হচ্ছে। তার একটি কারণ সম্ভবত এ যে শ্রমিকদের জীবনের মান সারা দুনিয়াতেই বেড়েছে। ইউরোপসহ সাবেক সোস্যালিস্ট দেশগুলোতে বেড়েছে। উপমহাদেশের দেশগুলোতেও বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিজমের পতনের পরে তাদেরকে দেখার মতো আর তেমন কেউ নেই। শ্রমিকরা এতিম হয়ে গেছে। আগে বামপন্থীরা তাদের গার্জিয়ান ছিল। কিন্তু এ জায়গাটি ইসলামিস্টরা নিজেদের দখলে নিতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদের কি অসুবিধা আমি জানি না। তবে এটি ঠিক একটি সময় পর্যন্ত ইসলামী মুভমেন্ট নিজেই নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ ছিল। যেখানে নিজেদের টিকে থাকার প্রশ্নই ছিল বড় সেখানে অন্যকে তারা আর কিভাবে সাহায্য করবে? বেশিরভাগই সরকারের, সাম্রাজ্যবাদের, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। আর বাংলাদেশে পলিটিক্যাল ঝড় সব সময় ছিল। শ্রমিকের গার্জিয়ান হওয়ার একটি যোগ্যতা ইসলামিক মুভমেন্টের ছিল কিন্তু আমাদের দেশে তারা পারল না। অন্য কোনো দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা অবশ্য আমার ভালো জানা নেই। বস্তুত বিশ্বব্যাপী ইসলামী মুভমেন্টে শ্রমিক আন্দোলন কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি করছে, কি করতে পেরেছে,

www.pathagar.com

কি করতে পারেনি, এটিও একটি স্টাডির বিষয় বলে আমি মনে করি।

আমাদের মতো দেশে আরেকটি সমস্যা হলো শ্রমিক আন্দোলন নানাভাবে নিজেকে বিতর্কিত করে তোলে। নিজেরা হরতালের সুযোগকে অনেক সময় খুব খারাপভাবে ব্যবহার করে। ইউনিয়নকে খারাপভাবে ব্যবহার করে। ইউনিয়নের সুযোগে বদলীতে, নিয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকাকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা আছে। শ্রমিক ইউনিয়ন এক ধরনের স্বার্থবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তাদের নেতাদের মানসিকতা হচ্ছে খালি ঘোরাঘুরি করবো, কাজ করবো না। ব্যাকিং-এর ক্ষেত্রে এমনও হলো যে, কে লোন পাবে আর কে পাবে না- তাতেও তারা হস্তক্ষেপ করতে লাগল! ফলে এর কুফল হিসেবে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের দেশে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায়। আস্তে আস্তে জনগণ বুঝতে পারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ খুব ভালো নয়। তারাও হলো এক ধরনের স্বার্থপর। এদিকে সৎ নেতৃত্বের ভেতর দুর্বলতা অনেক। সব মিলিয়েই শ্রমিক আন্দোলনের একটি পতন (ডিকলাইন) হয়। এটি সামনে কি রূপ নেবে জানি না। এটি আমার পক্ষে বলাও মুশকিল। তবে সামনে এটি একটি নতুন ফর্মে আসবে। বর্তমান ফর্ম আর টিকবে না। যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিশ্বব্যাপী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, জীবনের মান ক্রমশই উন্নত হয়ে আসছে, সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের পুরনো কথা, পুরনো শ্লোগান টিকবে বলে মনে হয় না।

মুসলিম বিশ্ব

প্রশ্নঃ মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশ ও জাতির স্বার্থ যত না দেখেন তার চেয়ে বেশি দেখেন পশ্চিমাদের স্বার্থ। এ অবস্থায় মুসলিম দেশসমূহে জনগণের মতামত কিভাবে প্রতিফলিত হতে পারে?

উত্তরঃ আমি বরং বলব তারা যতটুকু জনগণের স্বার্থ দেখে তার চেয়ে বেশি দেখে নিজের স্বার্থ। মুসলিম দেশগুলোতে ডিক্টেটরে ভরা এবং ডিক্টেটররা আসলে দুর্বল। আজকের যুগে পলিটিক্যাল অবস্থান নির্ভর করে জনগণের গ্রহণযোগ্যতার উপর। আগের যুগে রাজারা পলিটিক্যালি গ্রহণীয় হতো। শুধু দেখা হতো সেই ব্যক্তি রাজার আসল সন্তান কিনা। আমাদের বেশিরভাগ মুসলিম সরকারের জনসমর্থন নেই। তারা নিজের স্বার্থ খুব বেশি করে দেখে। এর মধ্য দিয়ে দেশের যতটুকু উন্নয়ন হয় হলো। এটি দেখতে গিয়ে তারা আমেরিকা আর পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা ভাবে আমেরিকা তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে টিকিয়ে রাখবে। এইখানে আমেরিকার সাথে তাদের একটি জোট তৈরি হয়। আবার সব সময় আমেরিকার চাপও থাকে। আমেরিকার চাপকে এরা ভয় পায়।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ ওআইসিকে মুসলিম দেশগুলোর জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে কিভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়?

উত্তরঃ কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক ছাড়া ওআইসি বিভিন্ন লেভেলে ভালো কাজ করছে। তারা শরীয়াহর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইডিবি'র মাধ্যমে ভালো কাজ করছে। কিন্তু পলিটিক্যাল লেভেলে তারা কিছুই করতে পারছে না। কারণ অধিকাংশ সরকার চায় না ওআইসির মাধ্যমে বড় কিছু হোক। তারা চায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সব হোক। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর উচিত ওআইসিকে শক্তিশালী করা। ওআইসিকে তাদের প্রথম অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘকে দ্বিতীয়তে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ওআইসিতেও সিকিউরিটি কাউন্সিল করা দরকার। ওআইসির সদস্যদের মধ্যে যদি কিছু হয় তাহলে তা সিকিউরিটি কাউন্সিলই দেখবে। খুব বড় সমস্যা দেখা দিলে জাতিসংঘ বিষয়টি দেখবে। আসলে ওআইসির কোনো দোষই নেই। দোষ মুসলিম সরকারগুলোর। আর আমরা নিজেরা না বুঝে অনেক সময় ওআইসিকে দোষারোপ করি। আসলে এগুলো হলো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

প্রশ্নঃ মুসলিম বিশ্বে একক মুদ্রা প্রবর্তনের কথা উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কী?

উত্তরঃ এটি ঠিক এ চিন্তা মুসলিমদের ভেতর আছে। মালয়েশিয়ার এ চিন্তা আছে। কিছু পেপারসও তৈরি হয়েছে। আইডিবির, ওআইসির এ ধরনের চিন্তা আছে। বলা যায় এ চিন্তার একটা শেপ দাঁড়াচ্ছে। মুদ্রার জন্য প্রয়োজন একটি ইকোনোমিক ইউনিয়ন। মুসলিম ওয়ার্ল্ডকে একটি ইকোনোমিক ইউনিয়নের মধ্যে এনে এই একক মুদ্রা সিস্টেম প্রবর্তন করলে ভালো হয়। না হলে এই করাটা খুব একটা মিনিংফুল হবে না। আগে ওসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন গোটা উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপের অর্ধেক, সেন্ট্রাল এশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যে একক মুদ্রা ছিল। এক ব্যবস্থায় একটি অভিন্ন বাজারে একক মুদ্রা কার্যকর সম্ভব। কাজেই একক মুদ্রা হিসেবে দিনার প্রবর্তনের জাস্টিফিকেশন হবে যদি একটি অভিন্ন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

প্রশ্নঃ বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন আমেরিকাকে মোকাবিলা করে কিভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে?

উত্তরঃ ইসলামী আন্দোলনের কাজ আমেরিকাকে মোকাবিলা করা নয়। বিশ্বব্যাপী এর দুটি বড় কাজ আছে। একটি হচ্ছে এর ভেতরে যা ত্রুটি আছে তা কাটিয়ে ওঠা। আরেকটি হলো বাহিরে যদি শত্রু থেকে থাকে তাদেরকে মোকাবিলা করা, অথবা বাইরের বিশ্বে ইসলামকে পৌছানো। এ অভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে উঠতে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে

www.pathagar.com

অবশ্যই সজাগ হতে হবে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো কি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তা দেখতে হবে। তার শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হবে। শিক্ষা আর অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে সফল হলে সায়েন্স, টেকনোলজি, ডিফেন্স উন্নত হবে। এর সাথে সাথে ইসলামের আলোকে মানুষ গড়ে তোলার জন্যও শিক্ষা দরকার। শিক্ষা শক্তিশালী হবে না শক্তিশালী অর্থনীতি ছাড়া। প্রত্যেকটি জিনিস প্রত্যেকটির সাথে জড়িত। এটিই হচ্ছে ইন্টারনাল কাজ এবং সত্যিকার অর্থে জনগণকে একজন ভালো মুসলিম বা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে ভালো মানুষ তৈরির দিকে তাদের নজর নেই। ভালো মানুষ আর ভালো মুসলমান আলাদা কিছু নয়। ভালো মুসলমান মানেই ভালো মানুষ। ভালো মানুষ মানেই, যদি সে ঈমান আনে, সে ভালো মুসলিম। শুধু ঈমান আনার কারণেই ভালো মানুষ মুসলিম হয়ে যায়। আর এক্সটারনালি আমাদের দুটি কাজ। শত্রু থাকলে তার মোকাবিলা করা আর ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়া। এ জন্য যত মাধ্যম আছে সব মাধ্যমের ব্যবহার করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। যেমন আমেরিকার কাজকর্মে সবাই সচেতন হয়েছে। ইরাকের ঘটনায় আমেরিকা মুসলমানদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ ইদানীং পশ্চিমা শাসক ও মিডিয়া সন্ত্রাস ও জিহাদকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ এটিকে পার্থক্য করার মধ্যে ছোটখাট সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সন্ত্রাস ও জিহাদ এক নয়। জিহাদের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামিক সোসাইটিকে রক্ষা করা, অন্যকে আক্রমণ করা নয়। দ্বিতীয়ত, মুসলিম বিশ্বে কোথাও যদি অত্যাচার থাকে তাহলে তা দূর করা। আন্তর্জাতিক বিশ্বে থাকলে তাও দূর করা। তবে আমাদের বুঝতে হবে আজকের যুগে আমরা তো আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনে কোনো সমস্যা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এটি আজকের যুগে জাতিসংঘ কিংবা জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমেই করতে হবে। ইসলামের অবজেকটিভ এটিই যে আমি অত্যাচার দূর করবো, সেটি যেখানেই হোক। আর এটিও আল্লাহর হুকুম যে আমাদের চুক্তি মেনে চলতে হবে।

আমরা মূল জিহাদ ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে আসি। জিহাদের একটি ফর্ম হচ্ছে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ। এটাকে তো আর সন্ত্রাস বলা যাবে না। সমাজ সংস্কারের জন্য জিহাদ সন্ত্রাস নয়। কিন্তু সন্ত্রাস যে কাজকর্মের দ্বারা হয় তা সমাজের ভেতরে করার কোনো অধিকারই আমাদের নেই। আর সেখানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একটি রাষ্ট্রের ভেতর কেউ সন্ত্রাস করবে তার সুযোগই তো নেই। জিহাদ ঘোষণা করতে পারে কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র বা মুসলিম পলিটিক্যাল অথরিটি। কোনো ব্যক্তি জিহাদ

www.pathagar.com

ঘোষণা করতে পারে না। কেউ যদি করেও তা শরীয়াহর দৃষ্টিতে জিহাদ হয় না।

বর্তমান সন্ত্রাসের রূপ হলো কোথাও বোমা ফেলে দেয়া। তাতে অনেক নিরীহ লোক, নারী-শিশু মারা যায়। কোথাও বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হয়। এসব কখনো জিহাদের অংশ নয়, অংশ হতে পারে না। যে ইসলাম বলে যুদ্ধের সময় গাছ কাটবে না, কোনো উপাসনালয় নষ্ট করবে না, কোনো বৃদ্ধ লোককে মারবে না, কোনো নারীকে স্পর্শ করবে না, কাউকে হত্যা করবে না, মন্দিরের যে পুরোহিত তার কোনো ক্ষতি করবে না, ফসল কাটবে না-সে ইসলাম কি করে বোমা মেরে নির্বিচারে লোকদের মেরে ফেলা সমর্থন করতে পারে? টুইন টাওয়ারের ঘটনা যারাই করেছে তারা ভালো লোক নয়, সন্ত্রাসী। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের আলেমরাও একমত হয়েছেন। বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলন এ সন্ত্রাসের নিন্দা করেছেন।

প্রশ্নঃ মুসলিম দেশে ইসলামী দলগুলো এখনো ক্ষমতা অর্জনকারীর ভূমিকায় আসতে পারেনি কেন?

উত্তরঃ কথাটি ঠিক। এর একটি কারণ হলো মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এখনো ডিক্টেটরশিপ চালু আছে। সেখানে পলিটিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া যাচ্ছে না। মিশর, তিউনিসিয়া, মরোক্কোসহ অনেক দেশেই এটি হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে মেইন স্ট্রিম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় অন্য নামে চেষ্টা করছে। মরক্কো, বাহারাইন, জর্ডান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তারা আগানোর চেষ্টা করছে। এ দিকে আমেরিকা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে চেষ্টা করছে যেন মুসলিম পলিটিক্যাল ফোর্স মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে না থাকে। আরেক সমস্যা হলো তারাই আবার সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বিভিন্নভাবে মূল দলগুলোর কাজকর্মে বাধা দেয়। অবাক ব্যাপার ইখওয়ানুল মুসলেমীন ৬০ বছর ধরে ব্যান্ড হয়ে আছে। এখনো তাদের লোকদের গ্রেফতার করা হয় শুধুমাত্র একত্রে বসার জন্য।

কারণগুলোর মধ্যে আরেকটি হলো আমাদের নিজস্ব অযোগ্যতা। আবার মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি না থাকায় এবং ডিক্টেটরশিপ বা সেমিডিক্টেটরশিপ থাকার কারণে ইসলামী দলগুলো প্রকাশ্য ভূমিকায় আসতে পারছে না। তৃতীয়ত, ওয়েস্টও এ ধরনের ব্যবস্থা চায় না। কয়েকদিন আগেই তারা বলেছে ইরাকে তারা ইরানের মতো কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুমোদন করবে না। অথচ ইরাকের জনগণ যদি এ ব্যবস্থা চায় তাহলে আমেরিকা তা বলার কে? তারা চায় সেখানে আমেরিকার মতো সরকার করা যাবে কিন্তু ইরানের মতো করা যাবে না।

তবে আমি মনে করি ইসলাম ইনশাআল্লাহ আগাবে। কিন্তু এজন্য শর্ত হচ্ছে সবখানে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র স্থায়ী হলে জনগণই জয়লাভ করবে। আর জনগণ

www.pathagar.com

ইসলাম চায়। এজন্য দরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইসলামের সহজ, সঠিক এবং উদার ব্যাখ্যা। আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি জ্ঞানী হয়, আমরা যদি ভালো লিটারেচার - একাডেমিক এবং কনভিন্সিং লিটারেচার তৈরি করতে পারি তাহলে আমি বুঝি না দুনিয়ায় কেন ইসলাম বিজয়ী হবে না। সেটি ১০, ২০ কিংবা ৫০ বছর যাই লাগুক। তবে আমি বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ, ইসলাম জয়ী হবে। আমি এও বিশ্বাস করি আমেরিকায় খুব শক্তিশালীভাবেই ইসলাম এগিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পারস্পরিক যোগাযোগ কিভাবে হতে পারে?

উত্তরঃ আন্তর্জাতিক লেভেলে এদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার একজন কর্মীর সাথে খার্তুমের কিংবা লন্ডনেরএকজন কর্মীর যোগাযোগ হয় না। এটি সাধারণত নেতৃবৃন্দের মধ্যেই হয়। এটি ইউরোপের মাধ্যমেই বেশি হয়ে থাকে। ইউরোপের কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আছে। সেখানে এরকম যোগাযোগ গোপনভাবে নয়, প্রকাশ্যে ও সরাসরিই হয়ে থাকে। এখানে গোপন কোনো ব্যাপার নেই। সেটি লন্ডন, জেনেভা, ব্রাসেলসের মাধ্যমে হয়। তবে, এ যোগাযোগ যা হচ্ছে তা আরো বেশি হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কিভাবে তাদের কৌশল নির্ধারণ করবে?

উত্তরঃ এ জন্য আমি একটি লম্বা আলোচনায় যেতে পারি। ইতিহাস হচ্ছে রোমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রথমে মুসলমানরা শুরু করেনি। বরং তারাই সচেতন হয় যে এই জাগরণী মুসলিম শক্তির উত্থান এখনই বন্ধ করার দরকার। সে কারণে রোমানদের সঙ্গে তাবুকে, মুতায় যুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ওমর (রা)-এর সময় ইরাক এবং সিরিয়া রোমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। মুসলিম জিহাদকে একজন ঐতিহাসিক বিচার করেছেন এভাবে, তখন আন্তর্জাতিক আইন পুরোপুরি ডেভেলপ করেনি। এরকম অবস্থায় কিছু রাজা বা সম্রাট যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, হয় আমি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবো না হয় আমি ধ্বংস হব। এরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানরাও ছিল। রোমানরা এরকম পরিস্থিতিতে অগ্রসর হলে মুসলমানরা তা প্রতিহত করে। ঐ সময় ঐ নীতি বাস্তবসম্মত ছিল। যদিও অন্য রাষ্ট্রগুলো তার নৈতিক ভিত্তিগুলো মেনে চলত না। কিন্তু ইসলাম সেসব মেনে চলে। তারা নারী, শিশু হত া করত না; ফসল নষ্ট করত না। যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করত। গাছ কেটে ফেলত না ইত্যাদি। এদিক থেকে মুসলমানরা একটি হিউম্যান ল' ফলো করত। এটিও দেখতে হতো যে, সে সময়কার পরিস্থিতিতে আমি যদি দখল না করি তাহলে আমাকেই অন্যরা দখল করে ফেলবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মুসলিম দেশ

www.pathagar.com

অন্য দেশ দখল করত। ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা উমাইয়া আব্বাসীয় যুগে পরিষ্কারভাবে অন্যের পদানত হবার ভয় ছিল। সো, ডু অর ডাই। আমি মনে করি এ পরিস্থিতিতে তারা যা করেছিল তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে তা দরকার ছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো তারা সব সময় নৈতিক নীতিমালাকে অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকের যুগে জিহাদের ফর্ম কেমন হবে। আজকের যুগে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখন চাইলেই আমরা অন্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে পারি না আর সেটা করা উচিতও নয়। এখন আন্তর্জাতিক আইন আছে। যদিও এটাকেও আমান্য করা হচ্ছে। আমেরিকা কিভাবে অমান্য করছে তাও আমরা দেখছি। কিন্তু আমাদের এসব আইন নীতিগতভাবে মানতে হবে। আইনের এমন পরিষ্কার বিকাশের পরে আমরা কি করে অন্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে পারি? আজকে যদি সাউথ আফ্রিকা নামিবিয়া আক্রমণ করে তাহলে আমরা কি বলব? বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন মানতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবর্তন খেয়াল করতে হবে। কিন্তু এ আইন আমরা ভাঙতে পারি না। কেননা সাক্ষাৎকারের এ পর্যায়ে এর পক্ষে আমরা সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতের কথা উল্লেখ করেছি, 'তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো রক্ষা কর'। এ আন্তর্জাতিক আইনের চুক্তিতে ৫৭টি মুসলিম দেশও স্বাক্ষর করেছে। কাজেই আমরা এটি ভঙ্গ করতে পারি না। সুতরাং এখন জিহাদের নামে কোনো আক্রমণ বৈধ হবে না।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার 'প্রাইওরিটিস অব দ্যা ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দ্যা কামিং ফেইজ' এ জিহাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেছেন, এ বিতর্ক আক্রমণাত্মক নাকি রক্ষণাত্মক তা অপ্রয়োজনীয়। তিনি কারা কোন পক্ষে তাদের নামও বলেছেন। তারা ইসলামের অনেক বড় বড় স্কলার। আমার মনে হয় ইউসুফ আল কারযাভী বিরোধীদের দলের, যদিও তিনি তা বলেননি। তিনি এ বিতর্ককে অপ্রয়োজনীয় বলছেন। আমরা এটিকে বৈধ বলে মনে করতাম যদি কোনো দেশে না গিয়ে বা রাষ্ট্রীয় কন্ট্রোল স্থাপন না করে ইসলামের বাণী পৌছানোর আর কোনো উপায় না থাকত। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তথ্য প্রবাহ অবাধ হয়েছে। যে কোনো মিডিয়ায়, প্রিন্টিং হোক আর ইলেকট্রনিক হোক, ইসলামের বাণী পৌছাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা সঠিক নয়। আজ বিশ্ব সভ্যতা, মানবতা এবং ইসলামের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে এ ধরনের সংঘাত থেকে মানবতাকে দূরে রাখা। আজকে আমার শক্তি থাকলে আক্রমণ করলাম কাল যদি আমার শক্তি না থাকে? বর্তমানেও তো আমাদের শক্তি নেই।

কাজেই জিহাদ সম্পর্কে আমি মনে করি, যে কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় সে কাজ অস্ত্রের মাধ্যমে করা ইসলামের শিক্ষা নয়। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র রাসূলুল্লাহ (সা)

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণভাবেই করেছেন। হুদায়বিয়া চুক্তির ফলও হলো অস্ত্র ছাড়াই মক্কা বিজয়। আর আমার কাছে ইসলামের স্বার্থ ও মানবতার স্বার্থ যেহেতু এক, সে কারণে কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক পলিসির পক্ষে আমি নই।

সংস্কৃতি

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তরঃ সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয়ও বহন করে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারকেই আমরা সংস্কৃতি হিসেবে বুঝে থাকি। বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ট্রেন্ড রয়েছে। একটি হচ্ছে আবহমানকাল ধরে চলে আসা সংস্কৃতি। এখানে মুসলমানরা যখন আসে এ আবহমান সংস্কৃতিই দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে হিন্দুরা আবহমান সংস্কৃতিকেই মোটামুটি ধরে রাখে। আরেকটিতে মুসলমানরা তাদের মতো করে আবহমান সংস্কৃতিকে বহন করলো। কারণ মুসলমানগণ প্রধানত এ এলাকারই মানুষ ছিল। সেখানে মুসলমানরা আবহমান সংস্কৃতির যেটুকু ধরে রাখার ধরে রাখল আর ইসলামের আলোকে, তাওহীদের আলোকে যেটুকু ছেড়ে দেবার ছেড়ে দিল। তাহলে আমরা সংস্কৃতিতে দুটি ধারা পেলাম। একটি আবহমান সংস্কৃতি যা মূলত হিন্দুদের মধ্যে থেকে যায় এবং অন্যটি আবহমান উপাদানের সাথে কিছু যোগ-বিয়োগ করে পরিণত হওয়া মুসলিম সংস্কৃতি। এখানে এ কথাও বলা দরকার মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ইসলামের ভেতর রিফর্মের একটি আন্দোলন আছে - তামুরুনা বিল মারুফ, নেহি আনিল মুনকার-এর মাধ্যমে। মুসলিম সংস্কৃতিকে ক্রমাগতভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে ইসলামের নিকটবর্তী করা বা খাঁটি করার ভেতরগত একটি আন্দোলন সব সময় আছে অর্থাৎ মুসলিম সংস্কৃতি আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে রিফাইন্ড হয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছে। তৃতীয় দিক হচ্ছে বিগত দেড়শ, দুইশ বছর ধরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর প্রভাব আমাদের বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ভাষায় পড়েছে। ফলে আমাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সংঘাত রয়েছে। এ সংঘাত আদর্শিক - এ সংঘাত ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির। আবার ইসলামী সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্বকে সংঘাতে পরিণত করার দরকার নেই। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে তার নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। কিন্তু যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আমাদের রয়েছে তার ভেতর রাজনীতি বড় আকারে প্রবেশ করছে। যেমন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি না দাঁড়িয়ে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির শ্লোগান তোলেন তারা আসলে ওটারও তেমন সমর্থক নন। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য তারা

www.pathagar.com

এটিকে ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনে পশ্চিমা মূল্যবোধকে দাঁড় করান। এর মাধ্যমে সরাসরি না করে তারা ঘুরিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে থাকেন। এ সংঘাত আমাদের দেশে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনোভাবেই তাদের ভালো কাজ নয়। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মুসলিম তাদের সংস্কৃতিকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবে বা বিচার করবে এটি খুবই স্বাভাবিক কথা। এতে তাদের কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। তারাও তো নামে মুসলিম। আদতে যদি ইসলামের সংস্কৃতি খারাপ কিছু হতো তাহলে এক কথা, কিন্তু তা তো সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে সত্য, শ্লীল। এর আসল সত্য হচ্ছে এটি তাওহীদের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এক আল্লাহর দুনিয়ায় তাঁর সঙ্গে শিরককে না মেশানোয় বিশ্বাস করে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্লীলতা। অশ্লীলতাকে পরিহার করা। এটি তো মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। আবার এই সংস্কৃতি নাস্তিকতাকে বাতিল করে দেয়। এটিও সঠিক যে নাস্তিকতা কোনো ভালো মানুষ তৈরি করে না। নাস্তিকতা হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকা। মানুষ দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। বেশিরভাগ মানুষ 'যা ইচ্ছা করি' মনোভাব পোষণ করে না। সুতরাং যে সমস্ত ইন্টেলেকচুয়ালরা ইসলামের মূল সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তারা সঠিক পথে আছে বলে আমি মনে করি না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিক কৌশলের প্রশ্নে আমি বলব সংস্কৃতি অত্যন্ত গভীর একটি ব্যাপার। সংস্কৃতিকে অন্য এক জায়গায় বলেছি, এটি আইনের চেয়ে গভীর। একটি সংস্কৃতিকে, এমনকি তার কিছু অংশকেও বদলে ফেলা যুগ যুগের ব্যাপার। এটি আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। সংস্কৃতি একটি সেনসেটিভ বিষয়। সেজন্য সংস্কৃতি নিয়ে কথাবার্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই সাবধানে করতে হয়। যেমন আমরা ১৯৫২ তে দেখেছি ভাষার ব্যাপারটি কত সেনসিটিভ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পেছনে ছিল এ সেনসিটিভিটিকে বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। তারা একটা ভুলের কারণে ক্ষমতা হারাল। তারা লোক হিসেবে কোনো অংশে খারাপ ও অযোগ্য লোক ছিল না। তাদের ভিতর দেশপ্রেমও ছিল। অথচ যে কোনো কারণে তারা ভাষা ও সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতা বুঝতে ব্যর্থ হলো।

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। এবারের বাজেটে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য মদের উপর থেকে ট্যাক্স কমানো হলো। তাতে একদিনের মধ্যে জাতি এমনভাবে বিস্ফোরিত হলো যে সরকার দু'দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন এবং দ্রুত এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সেনসিটিভিটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্ম যদি সংস্কৃতির অংশ হয় বা সংস্কৃতি যদি ধর্মের অংশ হয়, যেভাবেই আমরা দেখি না কেন, সংস্কৃতির কিছু স্পর্শকাতর বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্পৃক্ত। সেগুলো সবাইকে সাবধানে বুঝতে হবে। সংস্কৃতির

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পরিবর্তন দরকার মনে হলে তা খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। খুব দ্রুত তা করা যাবে না। যেটিতে সরকার সহজে জড়াবে না সেটিতে বুদ্ধিজীবীরা মতামত সৃষ্টি করবে। যখন দেখা যাবে বেশিরভাগ মানুষ সে মতামতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখনই তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি অনেকটা পলিথিন ব্যাগ তোলার মতো। কিংবা সবাই যেমন তিন স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন রাজপথে রাখা সম্ভব নয় বলে একমত হয়েছে বিষয়টি অনেকটা সেরকম। তেমনিভাবে সাংস্কৃতিক বিষয়কে আমাদের খুব সাবধানে হ্যান্ডল করতে হবে। এর স্পর্শকাতরতাকে সব সাংস্কৃতিক কর্মী, ডেমোক্রেটকে বুঝতে হবে যে, এসব বিষয়ে জোর করে দ্রুত কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে তো বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতির নামে একটি বিতর্ক আছে।

উত্তর: এটি ভাষাগত বিতর্ক। ইংরেজিতে ভাষাগত বিতর্ককে সেমানটিক বলে। কোনটা শুদ্ধ, কোনটা অশুদ্ধ এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে। যেমন, আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশি না বাঙালি? এ নিয়ে টেকনিক্যালি বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু এ বিতর্ক যারা করছেন উভয়ের কাছেই আমরা দেখি রাজনীতিই প্রধান। যদি আমি দেশভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলি তাহলে আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশি হওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। কিন্তু এটি নিয়ে লড়াই করতে আমি পছন্দ করি না। এ বিতর্কের অর্থ হচ্ছে মূল কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে পড়া। তেমনি বাংলাদেশি সংস্কৃতি আর বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি বা বাংলাদেশি যাই বলা হোক না কেন তাদের মূল সংস্কৃতির উপাদান তো হচ্ছে একটাই। এটিতে তো কোনো পার্থক্য হচ্ছে না। বাঙালী সংস্কৃতি মানে মুসলিম প্রভাব মুক্ত, পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত প্রাচীন বাঙালী সংস্কৃতি - এ রকম ব্যাখ্যা যদি কেউ দেয় তাহলেই কেবলমাত্র সে অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি আর বাংলাদেশি সংস্কৃতি আলাদা হয়ে যাবে। আবার বাঙালি সংস্কৃতি বলতে যদি সব বাংলাভাষীর সংস্কৃতি, সে যে দেশের বাসিন্দাই হোক এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতি মানে যদি হয় বাংলাদেশি এলাকার লোকদের সংস্কৃতি তাহলেও পার্থক্য হবে। তবে তারা যদি বাংলাদেশি ও বাঙালীসংস্কৃতি বলতে বাংলাদেশের ভেতরের সংস্কৃতিকে বুঝায় তাহলে এর ভেতর প্রকৃতপক্ষেই আমি কোনো পার্থক্য দেখি না। এটি শুধু সেমানটিকসের ঝগড়া। ভাষাগত ঝগড়া। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি একে বাংলাদেশি সংস্কৃতি বলাই ভালো এ অর্থে যে এটি এ এলাকার লোকদের সংস্কৃতি। যেমন আমরা আমেরিকার সংস্কৃতির কথা বলে আমেরিকার লোকদের সংস্কৃতিকে বুঝে থাকি।

আমি মনে করি যারা সচেতন সমাজকর্মী, সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবী, সচেতন মুসলিম তাদেরকে এসব অহেতুক বিতর্ক থেকে জাতিকে উদ্ধার করা উচিত। আমরা নিজেরাও

www.pathagar.com

এসব বিতর্কে যেন অহেতুক না জড়িয়ে পড়ি। যদি আমাদের সংস্কৃতিতে কোনো আপত্তিকর কিছু থাকে তাহলে তা আস্তে আস্তে সংস্কার করতে হবে। সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়ালে কোনো কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্নঃ কিন্তু এ বিতর্কে আমরা কেন বারবার জড়িয়ে পড়ছি?

উত্তরঃ আমার মনে হয় কিছু লোক এটি করছে এজন্য যে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করলে তাদের সুবিধা হয়। অথবা যারা বোকা, যারা মনে করে এসব বিতর্ক করাই জাতির স্বার্থ - তারাও এটি করতে পারে। এটি বোকাদেরও কাজ হতে পারে অথবা ধূর্তদের কাজ হতে পারে যারা জাতিকে ভাগ করে রাখতে চায়। যেহেতু এ রকম বিতর্ক চলছে, আমার মনে হয় এর পেছনে কোনো না কোনো ধরনের শয়তানী বুদ্ধি কাজ করছে। বাংলাদেশকে কারা ভাগ করে রাখতে চায় সেটাও আমাদের এখানে ভাবতে হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কিছু লোকও ভাবতে পারে আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে রাখাই ভালো। যতভাবে আমাদেরকে সমস্যায় রাখা যায় - সেটাও হতে পারে। যেমন অতীতে গ্রাম দেশে কেউ যদি অন্যের ক্ষতি করতে চাইত তাহলে তারা সে পরিবারের মধ্যে নানারকম ঝগড়া লাগিয়ে দিত। নয়ত মামলায় জড়াতো।

প্রশ্নঃ সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতার প্রশ্নে ধর্মের অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তরঃ মুসলিম বিশ্বসহ বিশ্বের সবাইকে জানতে হবে ধর্ম খুবই সেনসেটিভ বিষয়। এজন্য অহেতুক ও উদ্দেশ্যমূলক ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাটা সঠিক নয়। এর সাম্প্রতিক উদাহরণে আমি আগেই মদের কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সংস্কৃতিও একই রকম সেনসেটিভ। কাজেই যে কোনো দেশের জন্যই ভাষা, সংস্কৃতিকে সেনসেটিভভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এর বড় প্রমাণ হলো বাংলা ভাষার সেনসেটিভিটি বুঝতে না পারার কারণে আমাদের ইতিহাসই পরিবর্তন হয়ে গেল। তাই এসব যদি পরিবর্তনের কথা ভাবা হয় তাহলে তাতে খুবই চিন্তার অবকাশ থাকে এবং এজন্য অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন। ইসলামপন্থিদের জন্য ভালো হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব এগুলোর সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করা, পরিবর্তন করতে হলে সেটি পরিকল্পিতভাবে, জনগণের পূর্ণ মেন্ডেট নিয়ে করা। সংস্কৃতির স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে মেন্ডেট না নিয়ে কিছু করা যাবে না।

প্রশ্নঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত করতে দেখা যায়। আমরা একে কিভাবে মোকাবিলা করতে পারি?

উত্তরঃ আমাদের সবচেয়ে গভীর জিনিস কোনটি? বিশ্বাস। মানুষ যদি গভীরভাবে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে তাহলে সে সেভাবেই কাজ করবে। কারণ মানুষের কাজ

www.pathagar.com

নির্গত হয় তার বিশ্বাস থেকে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ হয়। এজন্য আমাদের মূল কাজ হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। এটিকে আরো সংক্ষেপ করে বলব, তাওহীদের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। ইসলামের মূল পিলার হচ্ছে তাওহীদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর গোটা কুরআন এর ব্যাখ্যা। এজন্য আমাদের খুব সুন্দরভাবে মানব জাতিকে তাওহীদ বোঝাতে হবে। গভীরভাবে তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বোঝাতে হবে। আমরা যদি আমাদের ৯০ ভাগ মুসলমানের মনে তাওহীদের উপলব্ধি পুরোপুরি বোঝাতে পারি তাহলে ইসলাম বিরোধী সকল উপাদান আমাদের কালচার তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর কালচার থেকে চলে যাবে।

আর আগ্রাসন শব্দটিকে ঠিকই ধরা হয়েছে। এক গ্রুপ পাশ্চাত্য থেকে সংস্কৃতি আমদানীকে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য সঠিক ভাবতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রেবেশ আমাদের জন্য আগ্রাসন। আমরা মুসলিম এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে এর বিপরীত কোনো জিনিস আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমরা ইসলাম, তাওহীদ বিরোধী ও শিরক মনোভাবসম্পন্ন কোনো জিনিসকে আমাদের কালচারে আসতে দিতে পারি না। এটিকে যদি আগ্রাসন নাও বলি তবুও এর মোকাবিলার দায়িত্ব আমাদের। এটি মোকাবিলা বা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা নেয়া উচিত। জনগণকে এ ব্যাপারে কাজ করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চেতনা বৃদ্ধি না করে এটি কখনো করা সম্ভব নয়। মানুষ যদি অসচেতন হয় তাহলে একটি বন্ধ ঘরের সব দরজা-জানালা খুলে দিলে বাতাস যেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে আমাদের সংস্কৃতিতেও তেমনি নানা জাতীয় উপাদান ঢুকে পড়বে। কিন্তু আমাদের ঘর যদি বাতাসে ভরা থাকে তাহলে সেটি হবে না। অথবা যদি এভাবে বলি - আমরা যদি ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী হই, ইসলামের সত্য, ইসলামের সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন হই বা সচেতনতা বাড়াই তাহলে আমি মনে করি পাশ্চাত্য কালচার আমাদের কিছু করতে পারবে না।

ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিষয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক উপাদান খুব মজবুত। এর মধ্যে এমন সব উপাদান ও নীতিমালা রয়েছে যা মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, বড় করতে পারে। এটি এমন একটি জিনিস, যে কোনো ছোটখাট আক্রমণাত্মক বা অপসাংস্কৃতিক বিষয়কে বাহ্যিকভাবে বড় বলে মনে হলেও তা আসলে এর কিছুই করতে পারবে না। ইসলামের পতনের যুগেই তো পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের জোয়ার এসেছে। তাই আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ ইসলামকে নিমূল করতে ক্রুসেডাররা পারেনি। এতো বড় ইনভেশন দুনিয়াতে কখনো হয়নি যা চেঙ্গিস খান করেছিল। সেই চেঙ্গিস খান ইসলামের কিছুই করতে পারেনি। উল্টো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এমনকি প্যালেস্টাইন দখল করেও তা তারা

www.pathagar.com

হাতে রাখতে পারেনি। দেড়শ বছরের ইম্পেরিলিজমের আক্রমণের নির্মমতাও ইসলামকে শেষ করতে পারেনি।

তাই আমি মুসলিম বিশ্বকে বলতে চাই ইসলাম ইজ সো স্ট্রং, সো গ্রেট - একে কেউ কিছু করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে চান তা হলো আমরা যেন আমাদের কাজ করে যাই। তাই আমরা যদি তাওহীদের জাগরণ ঘটাতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ, ইসলামী কালচারের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়। এভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলেই কেবল ইসলাম বিরোধী কালচার তো আসতেই পারবে না, কুসংস্কারও থাকবে না।

প্রশ্নঃ আমাদের সাংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে কি তাওহীদকে গ্রহণ করতে হবে?

উত্তরঃ আমার তাই মনে হয়। তাওহীদ ইসলামের সব কিছুরই মূল। আমাদের লেখক, কবিরা যদি তাওহীদ বোঝে তাহলে তাদের ইসলাম সম্পর্কে আর কিছু বলতে হবে না। তাদের লেখা অটোমেটিক ইসলামিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ এদেশের মানুষের সাংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা কেন?

উত্তরঃ এর কারণ বিভিন্ন। মিডিয়ায় যারা কাজ করছেন তারা আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তারা যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়েছেন সে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে বড় করে দেখানো হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতাকে দেখানো হয়নি। তারা ইসলামকে সাধারণ একটি ধর্মই জেনে এসেছে। তাই শুধু নয়, তারা একটি নেগেটিভ আইডিয়া নিয়েই এগিয়েছে। এটা একটা বড় কারণ, যে কারণে ইসলামকে তারা পজেটিভভাবে নিতে পারতেন, তা নিতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিগত ৫০ বছরের রাজনীতিতে সেকুলারিজমের অনুসরণ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ইসলামিক রিপাবলিক ছিল। কিন্তু সে আলোকে আইন, শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়নি। তার ফলে যেসব লোক তৈরি হয়েছে তারা ইসলামী মনা হয়ে গড়ে ওঠেনি।

মিডিয়ার বেশিরভাগ লোকই যদি ইসলামিক মাইন্ডের হয় তাহলে মিডিয়ার বিষয়ও ইসলামের আলোকে হয়ে যাবে। এটা করার উপায় হচ্ছে যারা ইসলামী মুভমেন্ট করেন, যারা ইসলাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাদের দায়িত্বই হচ্ছে বেশি বেশি লোক তৈরি করা। এটা সকল ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়া এর কোনো সত্যিকার সমাধান নেই। যারা এখন আছেন তাদের ভেতর পরিবর্তন করা কঠিন। বর্তমান অবস্থায় ১০/১৫ ভাগ পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এটি চেষ্টার মাধ্যমে করা সম্ভব। তবে এ সমস্ত বয়স্ক লোককে ইসলামিক করা সহজ কথা নয়। তারা বিশ্বাসে হয়ত মুসলিম থাকবে, অনেকে নামাজও

www.pathagar.com

পড়বে কিন্তু যাকে আমরা ইসলামাইজেশন বলি - ইসলামকে আত্মস্থ করা, সেটা তাদের জন্য খুব কঠিন ব্যাপার। সেটা এ বয়সে আর সম্ভব হয় না। এসব গভীর বিষয় ইসলামিক মুভমেন্টকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে নতুন লোক তৈরি করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করলেই হবে না। অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মী, শিক্ষক, খেলাধুলার লোক তৈরি করতে হবে। ভালো ছবি বানাতে ফিল্মের জন্য লোক তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই আমাদের লোক তৈরি করতে হবে। আর লোক তৈরি না করে আমাদের মুক্তি নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আমাদের দেশে সেকুলারিজম পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে শুরু হয়ে আশির দশক পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কিন্তু এরপর থেকে সে সংখ্যা কমে আসে। বর্তমানে ইসলামের কাজের অবস্থা ভালো। কাজেই আমরা যদি সেভাবে কাজ করতে পারি বাকিটুকুও করা সম্ভব।

প্রশ্ন: চলচ্চিত্র একটি প্রভাবশালী মিডিয়া। চলচ্চিত্র বিনোদনের একটি বড় মাধ্যমও। কিন্তু এটা আজ অশ্লীলতায় পূর্ণ। এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

উত্তর: এর থেকে উত্তরণ খুব কঠিন। তবে আমার মনে হয় আমাদের একটা অলটারনেটিভ দিতে হবে। আমি মনে করি ইসলামিস্টদের চলচ্চিত্র বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং একে বৈধ ও প্রয়োজনীয় মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বোপরি বিনোদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। হিজাব কোনো সমস্যা নয়। ইরানীরা যেভাবে ছবি তৈরি করছে সেভাবে ছবি তৈরি করা সম্ভব। কো-একটিংএ সমস্যা নেই। কারণ এ কো-একটিং একা একা হচ্ছে না। যদিও ছবিতে আমরা দেখছি একটি ছেলে একটি মেয়ে কথা বলছে, আসলে তারা স্যুটিং এর সময় বহু মানুষের সামনে কথা বলছে। কারণ সেখানে ক্যামেরাম্যান, প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক রয়েছেন, দর্শক রয়েছেন। ইসলাম যেটাকে খুলুয়া বলে, অর্থাৎ নিভৃতিতে একা থাকা - সেখানে স্যুটিং এর কাজ একা কিংবা গাইরে মাহরেমের মধ্যে হচ্ছে না। আবার গান অশ্লীল না হলে তাও থাকবে। অশ্লীলতা যুক্ত না হলে বাদ্যও কোনো সমস্যা নয়। এমত আমার নয়। ইরানীরা এটা অনুসরণ করছে। ড. কারযাভীও এমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - ফিল্ম, অভিনয়, গান, বাদ্য সমস্যা নয় যদি তা অশ্লীল না হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞাকে অশ্লীলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরতে হবে।

অলটারনেটিভ দেয়ার জন্য আরো অনেক কাজ আছে। আমাদের অবশ্যই টিভি চ্যানেল লাগবে যেখানে আমরা এসব ছবি দেখাবো। যদি ইসলামী সরকার হয় তাহলে তারা বাজে চ্যানেল বন্ধ করে দেবে। এসব ক্ষেত্রে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আসলে সমস্যা আমাদের মনে। আমরা ইসলামের অবজেক্টিভ ঠিক বুঝতে পারছি না। ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সব মিডিয়া, মিনসকে ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তুমি তোমার সর্বাত্মক সত্তা দিয়ে এবং সমস্ত মাল দিয়ে জিহাদ কর।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আপনি তাহলে কি এ সেক্টরে ইসলামিস্টদের বিনিয়োগ করতে বলবেন?

উত্তরঃ অবশ্যই, অবশ্যই। তাদেরকে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক সময় কোনো কিছুকে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতিকে তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেয়া উচিত না মাঝে মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত?

উত্তরঃ নিয়ন্ত্রণ খুব কম হবে। সাধারণভাবে ভাষা, সংস্কৃতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়া উচিত। এটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। যদি একটা সুস্থ সমাজ হয় এবং সব কিছু সুস্থ থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু যদি দেখা যায় একটি অসুস্থ জিনিস বের হচ্ছে তাহলে সেখানে জাতির পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত যাতে ফ্রিডমের নামে সব কিছু না ঢুকে পড়ে। সব কিছু আজেবাজে না হয়ে যায়। সেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকাকেই আমি সঙ্গত মনে করি। মানুষ যেন যা তা করতে না পারে। নোংরামি, নগ্নতা, কুশ্রী জিনিস দেখাতে না পারে।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি সুন্দর হওয়ার কথা। সংস্কৃতির অন্য অর্থ হচ্ছে সুন্দরের চর্চা, সৌন্দর্যের চর্চা। সেখানে অসুন্দরকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। তার জন্য একটি সীমারেখা অবশ্যই টানতে হবে। আইনের মাধ্যমে সে সীমারেখা বদলাতে জাতিকে কাজ করতে হবে। সংস্কৃতির অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার জাতির থাকতে হবে। শুধু সংস্কৃতি কেন, কোনো কিছুই একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। ব্যবসাকে লাগামহীন না করে তারও উপর কতগুলো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে - কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না। আমাদের কোনোভাবে অশ্লীলতা, অসুন্দর, জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষ ছড়ানো উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে আঘাত করা উচিত নয়। খেলাধুলার মতো এখানেও জাতির জন্য একটি রেফারি বা আম্পায়ার কমিটি থাকতে হবে, যারা এটা দেখাশুনা করবেন। এ কমিটি বাড়াবাড়ি না করে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে কাজ করবেন।

অর্থনীতি

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ত্রুটিগুলো কি কি? কিভাবে সেসব ত্রুটি কাটিয়ে উঠা যায়?

উত্তরঃ বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কু-ঋণ। সেটি আদায় হচ্ছিল না। এর পরিমাণ ৩০%-৪০% এ পৌছে গিয়েছিল। ১৯৯১-৯২ সালে সরকারের একটি সংস্কার প্রোগ্রাম করা হয়। আমি শুরু থেকে প্রায় ৫ বছর এর নেতৃত্ব দেই। এ প্রোগ্রামের ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। ব্যাংকের মূলধনের ভিত্তি কি হবে তা ঠিক করা হয়। ঋণ শ্রেণীকরণের ভিত্তি পরিবর্তন করে তা আরো শক্ত করা হয়। যার ফলে আগে যেখানে দেরিতে কু-ঋণ ধরা পড়ত, সেখানে

www.pathagar.com

আরো দ্রুত কু-ঋণ সনাক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এর সাথে আরো বেশ কিছু কাজ করা হলো। সে ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে যার ফল এখন আমরা পাচ্ছি। আমার মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম আগের তুলনায় অনেক ভালো।

উন্নতির শেষ নেই। দুর্নীতি আছে সেটাও অস্বীকার করা যাবে না। সিবিএ আছে। তাদের একটি অপপ্রভাবও আছে। অফিসারদের মধ্যে দুর্নীতি আছে। রাজনৈতিক প্রভাব আছে। এসব সত্ত্বেও ব্যাংকগুলো কতগুলো শর্ত পূরণ না করলে ঋণ দিচ্ছে না। এটাকে Lending Risk Analysis (LRA) বা Credit Risk Analysis. (CRA) বলা হয়। এতে প্রত্যেকটি ঋণ প্রস্তাবকে খুব গভীরভাবে কতগুলো মূলনীতির আলোকে পরীক্ষা করা হয়। এতে তদবিরকারকদের LRA বা CRA রিপোর্ট অনুযায়ী ঋণ দেয়া সম্ভব নয় বলে জানানো সহজ হয় বলে প্রভাবটা কমে আসছে।

সরকারি ব্যাংকের অবস্থা খারাপ। এসবের লোকসানী শাখা বন্ধ করে দেবার কথা বলা হচ্ছে। জনবল কমানোর কথা বলা হচ্ছে। বিদেশীরা এসব শর্ত দিচ্ছে এবং সরকার এগুলো মেনে নিয়েছে। তারপরও সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থা একদিকে খারাপ আবার অন্যদিকে তারা জাতীয় পারপাস সার্ভ করছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে বাধ্য করেছে ঋণ দিতে, যা প্রাইভেট সেক্টর দিত না। যেমন টেক্সটাইল শিল্পকে বাঁচাতে সরকার ঋণ দিতে বলে। জুট মিলে ঋণ দিতে বলে। সরকার অন্য ব্যাংকগুলোকে হুকুম দিতে পারে না। কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারে। শিল্প না বাঁচালে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকার সরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে টাকা চায়। সেখানে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন শিল্প-কারখানা বাঁচাতে গিয়ে ঋণ দিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দূর্বলতার মূল কারণ হচ্ছে সরকারি ডাইরেকশন। দুর্নীতি তো আছেই।

তবে সরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এত সমস্যাগ্রস্ত নয় যতটা বাইরে বলা হয়। যদি সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকত তাহলে এতটা সমস্যাও হতো না। এখন এটা বলা কঠিন যে, এসব প্রাইভেটাইজ করা হবে কিনা? করতে পারে। কিন্তু তার একটি পলিটিক্যাল মূল্য আছে। তা দিতে সরকার রাজি নয়। সাধারণ ধারণার অভাবে গোটা জাতি চাইবে না সবগুলো ব্যাংকই প্রাইভেট ব্যাংকে পরিণত হোক। আসলে পলিটিক্যাল প্রাইস কোনো সরকার দিতে পারে না। এটা দেয়ার মতো কোনো পার্টি নেই। বর্তমানে যে ৩০/৪০ হাজার লোক সরকারি ব্যাংকগুলোতে আছে প্রাইভেট হলে তাদেরকে নতুন কর্তৃপক্ষ তখন নাও রাখতে পারে। সেটাও একটা জটিল প্রক্রিয়া। সেখানে অবসরের প্রশ্নে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা এ লোকগুলোকে ছেড়ে দেয়া। সেটি তো একেবারেই সরকারের জন্য ডিফিকাল্ট সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশে তাতে বিরাট প্রশ্ন দেখা দেবে। আমরা দেখেছি আমেরিকার

www.pathagar.com

এয়ারলাইন্সগুলো হাজার হাজার লোক ছাঁটাই করেছে কিন্তু কেউ প্রটেস্ট করেনি। এ সিস্টেম তারা গড়ে তুলেছে। সত্যিই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার ইচ্ছাকেই ওরা মেনে নিয়েছে। তাদের সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমি বলব, সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং এর অবস্থা ভালো। এখানে যোগ্য ম্যানপাওয়ার আছে। দেশে কু-ঋণের সমস্যা ক্রমেই কমছে। পলিটিক্যাল প্রভাব, দুর্নীতি, সিবিএ সমস্যা হঠাৎ করেই বন্ধ হবে না। আজ থেকে ৪০ বছর আগে যখন উন্নয়নের শুরু হয় তখন এদেশে উন্নত কোনো প্রাইভেট সেক্টর ছিল না। শিল্প সম্পর্কে জানা কোনো শিল্পপতি ছিল না। সে সময় সরকার পাওয়ার, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ শুরু করে। কিন্তু এখন সরকারি সেক্টরের তেমন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। এখন এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুগারমিল এসব শিল্প সরকারের কাছে রাখার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রশ্নঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের দেশের বেসরকারীকরণ শিল্পনীতি হওয়া উচিত?

উত্তরঃ বর্তমান সময়ের ডিমান্ড তাই। এসব বিষয় সময়ের সাথে সম্পর্কিত। একটা সময় ছিল যখন সরকারীকরণের দরকার ছিল। এখন আবার বেসরকারীকরণ দরকার। আবার একটা সময় এমন আসতে পারে যে সরকারকে কিছু ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ে নিতে হতে পারে, যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশ্নঃ মুদ্রাস্ফীতিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তরঃ মুদ্রাস্ফীতিকে তো কোনো ভালো জিনিস বলা যায় না। মূল্য স্থির থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এটি যদি থাকে তাহলে নানা ধরনের সামাজিক সংঘাত থেকে বাঁচা যায়। যেমন- সরকারি, বেসরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারী, যাদের আয় সীমিত - যদি মূল্য বেড়ে যায় তাহলে এ লোকজন সাথে সাথে এফেক্টেড হয়। পণ্যের দাম বেড়ে যায়। রিক্সাওয়ালা তার শ্রমের দাম বাড়াতে পারে। যদিও বাস মালিকরা সংঘাতের মধ্যে পড়ার ভয়ে অনেক সময় ভাড়া বাড়াতে পারে না। কিন্তু এমন হতে পারে, মূল্য বাড়ার ফলে উল্টো কতগুলো পণ্যের ডিমান্ড কমে যাবে। কারণ দাম বাড়ালেও ক্রয় ক্ষমতা না বাড়ায় মানুষ প্রয়োজন কমিয়ে দেয়। যেমন, তরকারি কম হলেও চলে। কাজেই সেখানে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী সমস্যায় পড়ে। সুতরাং মূল কথা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি কোনো ভালো জিনিস নয়।

ইকোনোমিক্সের থিওরিতে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনসের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ সালে আমেরিকার মহামন্দার সময় তিনি এর থেকে উত্তরণের একটিই রাস্তা

www.pathagar.com

বের করলেন যে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য সরকারকে টাকা খরচ করতে হবে। ডিমান্ডকে চাঙ্গা করলে প্রোডাকশন চাঙ্গা হবে। ডিমান্ড চাঙ্গা করার জন্য লোকদের হাতে টাকা পৌছাতে হবে। আর টাকা পৌছানোর জন্য সরকারকে বললেন নানা ধরনের কাজ করার জন্য।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ইসলাম প্রাইস লেভেল স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করতে বলে। সূরা মুতাফ্ফিফীনে আছে, তোমরা মাপে কম দিও না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় টাকা প্রসঙ্গ এসে যায়। টাকার চারটি কাজের মধ্যে একটি হলো এর একটি ক্রয় ক্ষমতা আছে। ১৫০ টাকায় যেখানে দুই সের গরুর গোস্ত কেনা যেত সেখানে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেড় সের কেনা সম্ভব হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মাপে কম দেয়া হয়। কিন্তু এটা ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ নয়। আমরা ইচ্ছা করে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবো না। আমরা মাপে কমবেশি দেব না। মূল্যস্থিতি বজায় রাখব। কিন্তু সমাজের সার্বিক চাহিদা যদি কিছু অর্থের দাবি করে, যেটি কেইনস বলেছেন, তাহলে সেটিও করতে হবে। সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করার ইসলামের যে লক্ষ্য, বাসনা বা জনকল্যাণ তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুদ্রাস্ফীতির মূল কথা হবে অপ্রয়োজনে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো যাবে না। কাজেই মূল্যস্তর স্থির রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে। এরপরও মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি আমাদের মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব ফেলবে। আমাদের লক্ষ্য হবে যারা মূল্য বাড়াতে পারে না তাদেরকে সাহায্য করা। এজন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রতি বছর রিভিউ করা উচিত। যে পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হবে তা বাড়িয়ে দেয়া উচিত। এটি করা সম্ভব। এটি করতে বারবার পে স্কেল করতে হয় না। ইসলামী রাষ্ট্রে এগুলো করা জরুরী হবে। তবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদের প্রজ্ঞা আর বড় হৃদয়ের উপর। আমি আশা করি তারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী লোকই হবেন।

প্রশ্নঃ আমাদের এনুউয়াল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি) সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তরঃ আমাদের উন্নয়ন প্রোগ্রাম দুটি মাধ্যমে হয়। একটি সরকারি ব্যয়ে, আরেকটি প্রাইভেট মাধ্যমে। সরকারি ব্যয় যদি ২০ হাজার কোটি টাকা হয় সেখানে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয় দাঁড়ায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। এখন আমাদের সে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নেই। সেটি থ্রি ইয়ার্স প্ল্যান হয়েছে। উন্নয়নের জন্য আমাদের জিডিপি গ্রোথ বর্তমান অবস্থা থেকে কমপক্ষে ৭%-এ যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে ১০ বছরে আমাদের ইনকাম দ্বিগুণ এবং ১৫/২০ বছরে প্রায় চারগুণ হওয়া সম্ভব। বর্তমানে এটা ৫% আছে। দ্বিতীয়ত, এটা আমাদের নিজস্ব রিসোর্সের মাধ্যমে করার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য ট্যাক্সেশন বাড়াতে হবে এবং তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। আমাদের জাতিকে মানতে হবে যে আমাদের জিডিপি এবং ট্যাক্স মাত্র ১০% যা সুইডেনে ৫০%। তারা

www.pathagar.com

গোটা জিডিপির ৫০% ট্যাক্স নিয়ে নেয়। আমাদের এ ১০% কে বাড়িয়ে অন্তত ১৫%-এ নিতে হবে। তাহলে আমরা ট্যাক্সের মাধ্যমে এ উন্নয়ন বাজেট বড় করতে পারব। অন্যদিকে আমাদের রেভিনিউ খরচ কমাতে হবে। সরকারি কর্মচারী কমানোর দিকটিও বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এডিপির আরেকটি দিক হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক ঋণ সহজ শর্তে পেলে নেয়া ভালো। এখন যেমন খুব বেশি অযৌক্তিক শর্তে দেয়, তা না নেয়া ভালো। ঋণ নিতেই হবে তার কোনো কথা নেই। সেজন্য সহজ শর্তে না পেলে না নেয়া ভালো। কারণ ঋণ দাসত্ব সৃষ্টি করে। এটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

চতুর্থত, আমাদের দেশে দারিদ্র্য যেহেতু বড় ইস্যু এজন্য এডিপিতে পরিষ্কার কর্মসূচি থাকা উচিত। এটা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না। এ জন্য টার্গেট করে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করার কথা আমি বলেছি। এতে প্রতি এডিপির মাধ্যমে অন্য সব স্বাভাবিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব। যেমন রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা ছিন্নমূল অসহায়দের পুনর্বাসন কিংবা ঢাকা শহরে রিক্সা সমস্যা। কোথায় বাজেট বাড়বে বা কমবে তা সরকার নির্ধারণ করবে। তবে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে আমাদের বাজেট বাড়ানো উচিত। কারণ আমাদের মুসলিম বিশ্বের অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করবে শিক্ষার উপরে, সায়েন্স টেকনোলজি ডেভেলপ করার উপরে। রেভিনিউ বাজেট ও ডেভেলপমেন্ট বাজেট বাড়াতে হবে। এগুলোর উন্নতির উপর নির্ভর করবে অর্থনীতির উন্নয়ন। ডিফেন্সের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন। এগুলো অত্যন্ত লিংকড বিষয়। একটির উন্নয়নের সাথে অন্যটির উন্নয়ন জড়িত।

প্রশ্নঃ ভ্যাটকে (VAT) কিভাবে আরো আধুনিক করা যায়?

উত্তরঃ আসলে ভ্যাট একটি খুবই আধুনিক ট্যাক্স সিস্টেম। প্রথমে এটা খুচরা পর্যায়ে না নিয়ে ম্যানুফেকচারিং পর্যায়ে নেয়া হলো। ৮/১০ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে খুচরা পর্যায়ে যাওয়ার কথাই ভাবা হয়েছিল। খুচরা পর্যায়ে যেতে পারলে পুরো ট্যাক্সের বেনিফিট পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম থেকে VAT এর যে সৌন্দর্য তা নষ্ট করা হয়েছে। ভ্যাট ব্যবস্থার আসল দিক সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে। তার ফলে এটা একটা সেল (বিক্রয়) ট্রাক্সের রূপ ধারণ করেছে। তাই বর্তমানে যাই থাকুক না কেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে মূল VAT সিস্টেমে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আমরা অনেক বেশি ট্যাক্স পাব।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড